সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স ঃ কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৬২
দ্বিতীয় সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬২
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর—শ্রীতড়িৎ কুমার চট্টোপাধ্যায়
চন্দ্রনাথ প্রেস
১৬৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
কলিকাতা—৬
প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা

উৎসর্গ

'সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না ॥'

: রচনাকাল :

৫ই মে, বুধবার সন্ধ্যা, ১৯৫৪

থেকে

২০শে মার্চ, রবিবার সন্ধ্যা, ১৯৫৫

কলিকাতা

: এই লেখকের অন্যান্য বই :

অন্য নগর (২য় সংস্করণ)

এই মর্তভূমি (২য় সংস্করণ)

দূরের মিছিল (২য় সংস্করণ)

মনে মনে

মুখর লণ্ডন

জন সম্রাট (যন্ত্রস্থ)

ইভনিং ইন প্যারিস („)

সমুদ্র মন্থন („)

মেক আপ

সামান্য চাকরি। দিশি ব্যাঙ্কের সাধারণ কেরাণী। হৈমন্তীর কথায় বিনা নোটিশে চাকরি ছেড়ে দিলো কৈলাস। এখন আর ওসব আজে বাজে কাজ করা ভালো দেখায় না।

হ্যাঁ হ'তো তেমন চাকরি, কোনো চিত্র-সাপ্তাহিকে আধশোয়া অবস্থায় নিজের লাস্যময়ী ছবি ঘুরিয়ে ফিবিযে দেখতে দেখতে হৈমন্তী বললো, তাহলে আমি তোমাকে ছাড়তে বলতাম না। কিন্তু আমার এখন এতো নাম, এতো লোকের সংগে আলাপ যে, তুমি ব্যাঙ্কের কেরাণীগিরি করলে আর মান থাকে না।

কৈলাস বললো, তবু একটা কিছু না করলে ব্যাপারটা আরও খারাপ হয় না? ধরো, পরে ষ্টুডিওর লোকেরা যখন তোমায় জিজ্ঞেস করবে, মিষ্টার চৌধুরী কি করছেন—তখন?

হৈমন্তী খুব জোরে হেসে উঠলো, ওরা খুব ভদ্রলোক। অমন যা তা প্রশ্ন করে না। তবে বোঝো তো, এসব কথা বেশীদিন চাপা থাকে না। আমার যতো নাম হবে, এসব কথা নিয়ে লোকে ততো আলোচনা করবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো আমার যা হয় একটা কিছু করা দরকার?

না, যা হয় একটা কিছু করলে আর চলবে না। এই তো সেদিন সকলের সামনে যে কী লজ্জায় পড়লাম!

কি হয়েছিলো বল তো?

সেই যে মহাশ্বেতা, আসল নাম তুলতুল বক্সি। ব্যারিষ্টার অম্বর বক্সির স্ত্রী। সেদিন ষ্টুডিওতে এসেছিলো—

তাই নাকি? মিষ্টার বক্সিও এসেছিলো বুঝি?

না, তিনি আসবেন কেন? অতো বড়ো ব্যারিষ্টার, কতো কাজ তাঁর, হেসে হৈমন্তী বললো, সকলে তো আর তোমার মত নয়—

বাধা দিয়ে কৈলাস তাড়াতাড়ি বললো, যাক গে, তারপর কী হলো বল?
উঃ, কী হৈ হৈ সেদিন ষ্টুডিওতে! ডিরেক্টার থেকে প্রত্যেকটি টেকনিশিয়ান ঘাবড়ে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। কি ব্যাপার? কি ব্যাপার? কে আসছে? না মিষ্টার বক্সির স্ত্রী। তিনি ছবিতে নামবেন। ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রির পক্ষে এ কি কম সৌভাগ্যের কথা! কিন্তু ওদিকে আবার আর এক কাণ্ড—
কি আবার কাণ্ড হলো?
ব্যাপার দেখে প্রডিউসার গেলেন ক্ষেপে—
কেন? কেন? এ তো সত্যি আনন্দের কথা—
আঃ, বোকার মত কথা বলো না। আনন্দের কথা হলো কিসে? ব্যারিষ্টারের সুন্দরী স্ত্রী ব'লে? হৈমন্তী ঠোঁট উল্টে বললো, আবে আগে দেখ্ ফিল্মফেস্ কিনা, সাধনা আছে কিনা, অভিনয় করবার ক্ষমতা আছে কিনা—তা না, আগে থেকে হৈ হৈ রৈ রৈ। ইণ্ডাষ্ট্রি কি দেখবে কার মা, কি বোন, কি স্ত্রী? পাবলিক না নিলে ঝাঁসীর রাণী ছবিতে নামতে এলেই বা কার কি?
হুঁ হুঁ, তা বটে, কৈলাস মাথা চুলকে জিজ্ঞেস করলো, তা শুনি প্রডিউসার ক্ষেপে গেলেন কেন?
কারণ উনি কাজ চান। স্যুটিং বন্ধ কবে ওসব হট্টগোল পছন্দ করেন না—
কৈলাস সায় দিলো, কি করে করবেন, অতো বড়ো ব্যবসা, কতো দিক ভেবে কাজ করতে হয় তাঁকে!
তাই তুলতুল বক্সি আসবার অনেক আগে তিনি গম্ভীর মুখে ক্রাইসলার হাঁকিয়ে ষ্টুডিও থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার আগে হেরম্ব বাবু আর চৈতন্য বাবুকে ডেকে বললেন, যে ছবিটা হচ্ছে সেটা আর একমাসের মধ্যে শেষ করতেই হবে, না পারলে তিনি কোম্পানী বন্ধ করে দেবেন—
ওরে বাবা, তারপর?
তারপর? তিনি তো বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর কথা শুনে আগুন জ্বলে গেল সমস্ত ষ্টুডিওতে!
সে কি? কি হলো বলো শুনি? হেঁ হেঁ, কতো মজার ব্যাপার হয় যে তোমাদের ষ্টুডিওতে!

হবে না! পাবলিক নিয়ে কারবার, শুধু ছেলেখেলা করলে তো আর চলবে না—

হ্যাঁ হ্যাঁ, তা আগুন জ্বলে গেল কি রকম?

প্রডিউসার বেরিয়ে যেতেই টেবিলে ঘুসি মেরে চৈতন্য গড়াই শ' কোট্ করে বললো—

শ' মানে, সেই ধর্মতলার গ্রামোফোনওয়ালার কথা ভাই, যে নাটক লিখে ষ্টুডিওতে ওদের পেছনে ঘুর ঘুর করছে—

হৈমন্তী খিল খিল করে হেসে কৈলাসের গায়ে ঢলে প'ড়ে বললো, তুমি কী গো! এমন কথা আর কারুর সামনে ভুলেও বলো না যেন। বার্ণাড শ'র নাম জানো না?

ও হ্যাঁ, সেই যিনি নিরামিষ খেয়ে খুব নাটক লেখেন—

হ্যাঁ, বাড়ি আয়র্ল্যাণ্ডে কিন্তু ইংল্যাণ্ডে থাকতেন—

বুঝেছি। আচ্ছা তারপর?

বার্ণাড শ'র 'মেজর বারবারা'র আণ্ডারসাফটের মত চৈতন্য বাবু বললো, ইচ্ছে করলে আমি সব ষ্টুডিও কিনে নিতে পারি। আজ চোখ রাঙিয়ে উনি আমাদের অর্ডার দিচ্ছেন! এই পনেরো বছর ধরে কারা কোম্পানী চালালো? আমাদের হাড ভাঙা পরিশ্রম, আমাদের অধ্যবসায়, না খেয়ে না দেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফ্লোরে দাঁড়িয়ে ঘামা—আজ সামান্য ব্যাপারের জন্যে উনি সব ভুলে গেলেন। টাকার বস্তা নিয়ে লোকে যখন বম্বে যাবার জন্যে সাধাসাধি করেছে আমরা তখন ওঁর মুখ চেয়ে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছি—

বাঃ, সুন্দর বলে তো আমাদের গড়াই সাহেব!

বলবে না? কত ছবি করেছে নিজে! কতো বড়ো বড়ো লেখকের ভাষা উড়িয়ে দিয়ে নিজের ডায়লগ্ বসিয়ে হিট্ পিকচার করেছে—

তারপর? তারপর?

তারপর আবার কি? ষ্টুডিও সুদ্ধ লোক ওর পক্ষ নিয়ে সায় দিয়ে বললো, ঠিক বলেছেন স্যার। হয়তো আলোচনা আরও অনেকক্ষণ চলতো কিন্তু হেরম্ব বাবু থামিয়ে দিলেন।

কেন? কেন? এক্কেবারে বড়ো অপমান করলেন—

তা করলেই বা! মধুর সম্পর্ক বলেও তো একটা কথা আছে। পনেরো বছরের সম্পর্ক কি কিছুই নয়? হেরম্ব বাবু শান্তিপ্রিয় লোক। তিনি ভেবে দেখলেম, এসব কথা প্রডিউসারের কানে উঠলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। আর যদি এই ছবি অন্য কাউকে দিয়ে করান—

তাতে হেরম্ব বাবুর কী? এ ছবি তো পরিচালনা করছে চৈতন্য গড়াই?

হ্যাঁ, কিন্তু সুপারভিশন্ হেরম্ব দত্তর।

কৈলাস অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, সুপারভিশন্ আবার কি?

এসব হচ্ছে ষ্টুডিওর কথা। তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। মানে এবার থেকে প্রিমিয়ার পিকচার্স লিমিটেডের ছবি একজন ডিরেকসান দেবে আর একজন সুপারভাইশ্ করবে—

ও বাবা, একেবারে জবর জঙ্ ব্যাপার।

হ্যাঁ, কারুর ফাঁকি দেবার উপায় নেই। তা যাকগে, শোননা ব্যাপার। হেরম্ব বাবু অনেক বুঝিয়ে তো গড়াইকে ঠাণ্ডা করলেন। বললেন, মাথা গরম করো না, বাজার খারাপ, এসব কথা প্রডিউসারের কানে গেলে মুশকিল হবে। কিন্তু চৈতন্য কি থামবার লোক! বুঝতেই তো পারো অমন নির্ভিক লোক হয় না। সে চিৎকার করে বললো, ড্যাম ইওর প্রডিউসার! হি নিডস্ এ কিক্ অ্যাট দি বটম্—

এও কি বার্ণাড শ' থেকে নাকি?

না না, এটা চৈতন্য বাবুর নিজের কথা নিশ্চয়ই। তবে ও খুব ভালো ইংরেজী জানে—প্রায় বার্ণাড শ'র মত।

হ্যাঁ খুব ফটর ফটর করেন বটে—

একটু রেগে হৈমন্তী বললো, ওসব গাঁইয়া কথাগুলো এবার ছাড়ো, ফটর ফটর আবার কি? হি স্পিক্স্ ইংলিশ্ ওয়াণ্ডারফুলি ওয়েল—বুঝেছো?

কৈলাস মাথা নেড়ে জানালো যে, সে বুঝেছে। তারপর হৈমন্তীর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, বাঃ, তোমার ইংরেজী উচ্চারণ তো চমৎকার হয়েছে দেখছি!

ষ্টার হয়েছি কি অমনি? হৈমন্তী হেসে বললো, কত সাধনা করতে হয়, একটু থেমে কৈলাসের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে সে যেন অকারণে হঠাৎ বললো,

চৈতন্য বাবুর কাছে আমার কতো ঋণ, কেমন করে শোধ করবো মাঝে মাঝে তাই ভাবি!

সে কী? হাঁ করে কৈলাস বললো, চৈতন্য বাবুর কাছ থেকে তুমি আবার ধার-টার করা আরম্ভ করেছো নাকি?

হৈমন্তী রাগলো না। স্বামীর নির্বুদ্ধিতায় ম্লান হেসে বললো, তুমি কিছু বোঝ না কেন!

তুমি সব কথা খুলে না বললে আমি কেমন ক'রে বুঝবো?

হৈমন্তী ততোক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। আবার সে স্বাভাবিক স্বরে বলতে আরম্ভ করলো, আমার সম্বন্ধে চৈতন্য বাবুর কতো বড়ো ধারণা জানো? সে বলে, আমার চোখ নাকি 'আর্মস্ অ্যাণ্ড দি ম্যান'-এর রেইনার মত, মুখ মেজর বারবারার মত, মানে এক কথায় আমার চেহারা আর গলার স্বর উইণ্ডি হিলারের মত—

সে আবার কে? সেও কি নাটক-ঠাটক লেখে নাকি?

দূর বোকা! উইণ্ডি হিলার খুব নাম করা অভিনেত্রী। বার্নাড শ'র নাকি বড়ো প্রিয় ছিলো—

তুমিও অনেকের প্রিয় হবে হৈমন্তী। তোমার মত রূপ গুণ ক'জনের থাকে। তোমার অনেক আগেই ছবিতে নামা উচিত ছিলো।

দেখ না কি করি আস্তে আস্তে। প্রথম আবির্ভাবেই তো হৈ হৈ পড়ে গেছে। কিন্তু যতো শিগগির হয় এই বাড়িটা বদলাতে হবে—

এর চেয়ে সস্তায় কি বাড়ি পাওয়া যাবে?

আঃ, সস্তায় কেন? বেশি ভাড়া দেবো আমরা। এই জঘন্য বাড়িতে এভাবে থাকলে আমার সব চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে—

কি যে বল তুমি, এ বাড়ি তো লক্ষ্মী। এখানে ছিলে বলেই তো ছবিতে নেমে অমন তাড়া তাড়া নোট পেলে—

একটু গম্ভীর হয়ে হৈমন্তী বললো, সেটা খুব একটা বেশি কিছু নয়। আমার দাম অনেক—

সেকথা আর আমি জানি না?

কাজেই আরও অনেক নোটের তাড়া যাতে পাই তার বন্দোবস্ত করতে হবে, আর এ বাড়িতে থাকলে সেটা করা কিছুতেই সম্ভব হবে না।

কেন বল তো ?

কারণ এ বাড়িটা বড়ো গরিব—গরিব।

তা আমরাও তো গরিব।

ঝাঁঝালো স্বরে হৈমন্তী বললো, গরিব আবার কিসে ? হ্যাঁ তোমার রোজগারে যতোদিন ছিলাম ততোদিন বলতে পারো গরিব ছিলাম। মাত্র একটা ছবি থেকে আমি চার হাজার চারশো টাকা পেয়েছি। এখন যাতে ওর চেয়েও বড়ো কনট্রাক্ট আরও ঘন ঘন পাই তার ব্যবস্থা করতে হবে। আর সেই জন্যে সব চেয়ে আগে এই জঘন্য বাড়িটা বদলাতে হবে।

একটা ঢোঁক গিলে কৈলাস বললো, কিন্তু কেন ? এমন সস্তায়—

তোমার কোনো বুদ্ধি নেই, দম নেবার জন্যে একটু থেমে হৈমন্তী বলতে লাগলো, এই বাড়িতে কোনো ভদ্রলোককে আনা যায় ? তুমিই বল ? এটা হলো কেরাণীর বাড়ি, অভিনেত্রীর বাড়ি নয়।

তা বটে। কিন্তু বেশি ভাড়ার বাড়ি এখন নেবো কেমন ক'রে ? সেই চার হাজার চারশো টাকা থেকে আট মাসের বাড়ি ভাড়া, গয়লার চার মাসের টাকা, আমার ছুটকো ছাটকা ধার শোধ করতে তো অনেক বেরিয়ে গেছে, আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম—

থাক থাক তোমাকে আর হিসেব দিতে হবে না, আমি জানি কি গেছে আর কি আছে, হৈমন্তী মুচকি হেসে বললো, আর তোমার চাকরির কথা দয়া করে তুলো না। ও চাকরি রাখাও যা ছাড়াও তাই। এবার আমি নিজের রোজগারে সংসারের চাকা ঘোরাবো। চার হাজার চার শো—ফুঃ! টাকা নিয়ে আমি ছিনিমিনি খেলবো। 'অপবাদ'-এর মাত্র দু'দিন স্যুটিংএ যা দেখিয়েছি—ডিরেক্টার থেকে সাউণ্ড রেকর্ডার খাটো বাবু অবধি ঘাবড়ে গেছে। যেমন গান তেমন অভিনয়! চৈতন্য বাবু বলেছে, পরের ছবি থেকে আমার হিরোইন হওয়া আটকায় কে ! আর এ সময় তুমি নিয়ে এলে চার হাজার চার শো টাকার হিসেব—ফুঃ !

কিন্তু আরও তো অনেক ধার আছে—

সব শোধ হয়ে যাবে। টাকা যখন আসতে আরম্ভ করেছে তখন আর ভাবনা নেই। টাকা আসবেই আর তা আমি আনবো আমার প্রতিভা দিয়ে, পরিশ্রম

দিয়ে, তোমার মত দশটা পাঁচটা করে গোনাগাঁথা টাকা নয়, হাজারে হাজারে লাখে লাখে চেকে ক্যাশে—

মাথায় হাত দিয়ে কৈলাস বললো, ইস্ ঠিক এই সময় ব্যাঙ্কের চাকরিটা ছাড়লাম, তোমার একটা মোটা গোছের অ্যাকাউন্ট আমাদের ব্যাঙ্কে খোলাতে পারলে আমার ম্যানেজার হওয়া মারতো কে!

চাকরি তোমাকে আমি আর কেনোদিনও করতে দেবো না—আর ওই সব দিশি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার—হুট্!

তা বটে, এখন আমাকে তো তোমার স্বামী বলে কত লোক চেনে, গদগদ স্বরে কৈলাস বললো, ভাগ্যিস তোমাকে বিয়ে করেছিলাম!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হৈমন্তী বললো, তুমি যদি সামান্য একটু লিখতে টিখতে পারতে—

আমি লিখবো? হি-হি-হি, কী যে বল!

আমি জানি তুমি কিছুই পারো না, তাই লোকজনের সামনে সব সময় লজ্জায় কাঠ হয়ে থাকি—

হাওয়া অন্য দিকে বইছে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে কৈলাস তাড়াতাড়ি বললো, আমি লিখতে পারলে কি করতে বল তো?

ভবিষ্যতে তোমার স্টেটাস্ অনেক বাড়িয়ে দিতে পারতাম।

সে আবার কি?

মানে লাখ চার পাঁচ টাকা ক'রে আমি নিজে ছবি প্রডিউস্ করবো, তুমি যদি লিখতে পারতে তাহলে তখন তোমাকে আমার সিনারিও রাইটার করে নিতে পারতাম।

না-না-না, কৈলাস খুব বেশি লজ্জা পেলো, তা কি হয়?

হবে না কেন? টাকা থাকলে সবই হয়। কিন্তু এক্ষুনি যখন আমি নিজে ছবি করতে পারছি না, আর তোমারও একটা বড়ো গোছের পরিচয় থাকা একান্ত দরকার—

তাই তো বলছিলাম চাকরিটা থাকলে—

ড্যাম ইওর চাকরি, হৈমন্তী যেন ঝলসে উঠলো, অম্বর বক্সির মত নাম করা ব্যারিষ্টার হতে পারো?

হেঁ হেঁ, তা কি পারি !

কমলাক্ষ মিত্রের মত ডেপুটি সেক্রেটারী হতে পারো ?

তা কি পারি, হেঁ হেঁ, তা কি পারি ?

শরৎ হালদারের মত অত বড়ো বিলিতি কোম্পানীর ডিরেক্টার-পার্টনার হ'তে পারো ?

হেঁ-হেঁ-হেঁ—

তবে ভবিষ্যতে আর কোনোদিন আমার কাছে চাকরির নাম করো না, বুঝলে ? ওইসব বড়ো বড়ো অফিসারের স্ত্রীদের সংগে আমাকে কাজ করতে হয়। যখন কথা ওঠে তুমি কি কর, আমি কায়দা করে কথা ঘুরিয়ে দিই। তবু তোমার নাম উঠলেই আমাকে লজ্জায় পড়তে হয়, প্রথমে কোনো উত্তর দিতে পারি না। কোথায় আমার জ্বালা ধরে বুঝতে পারো ?

কৈলাস মাথা নিচু করে বললো, পারি। কিন্তু আমি কি করবো বল ?

হঠাৎ হেসে ফেলে হৈমন্তী বললো, তুমি কি করবে ?

হ্যাঁ ?

সব নাম করা ষ্টারদের অক্ষম স্বামীরা যা করে তুমিও ঠিক তাই করবে।

কিন্তু সেটা কি ?

অর্থাৎ বিজনেস্—

কৈলাস বেশ বড়ো হাঁ করলো, বিজনেস্ ? আমি ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি। আরে তা বলে সত্যিই তুমি কি আর ক্লাইভ ষ্ট্রীটে আপিস খুলে বসবে ? লোকে যদি কথায় কথায় কোনোদিন আমাকে জিজ্ঞেস করে, মিষ্টার চৌধুরী কি সিভিলিয়ন ? আমি মুচকি হেসে ঘাড় বেঁকিয়ে মৃদুস্বরে বলবো, ওঃ নো, হি ইজ ইন বিজনেস্। ব্যাস্ চুকে গেল।

খুব ব্যস্ত হয়ে কৈলাস বললো, কিন্তু ধরা পড়লে ?

এ কি চুরি করছো নাকি যে ধরা পড়বে ? কারুর তো আর কাজ কর্ম নেই যে, তোমার পেছনে ঘুরে সময় নষ্ট করবে—

না না, মানে তোমার স্বামী বলে ওইসব ফিলিমের কাগজে যদি আমারও জীবনী ছাপা হয়, তখন তো হেঁ হেঁ সব বেরিয়ে পড়বে বাপু—

আরে দূর, আধ ময়লা ধুতি পাঞ্জাবী পরে বোকা বোকা ছোঁড়াগুলো যারা

আমার জীবনের কথা শুনতে আসে তাদের যা বলবো বেদবাক্য বলে মনে করবে। তবে হ্যাঁ, দু'এক মিনিট চুপ করে থেকে হৈমন্তী আরম্ভ করলো, তোমার পোশাকের আগাগোড়া সংস্কার করা দরকার। ধুতি টুতি আর চলবে না।—

প্যাণ্ট সার্ট তো আছে আমার—

খিল খিল ক'রে হেসে হৈমন্তী বললো, ওসবে হবে না। ও পরলে তোমাকে ঠিক ছকু খানসামার মত দেখায়। আজই তোমাকে নতুন স্যুটের অর্ডার দিতে হবে। শার্ক স্কীনের—বুঝেছো?

মানে হাঙরের চামড়ার?

হ্যাঁ, আমি তোমার সংগে গিয়ে ঠিক মত মাপ নিতে বলবো।

হাঙরের চামড়া কি গায়ে দিতে পারবো?

খুব পারবে, চৈতন্ত বাবুকে দেখ নি?

আরে উনি তো শাদা স্যুট পরেন।

ওই হলো শার্ক স্কীন্—

নাকি? তা হাঙরের চামড়া হলো কিসে? ওতো কাপড়—

বোকারাম, ওকেই বলে শার্ক স্কীন্। তুমি কি ভেবেছো হাঙর ধরে লোকে তার চামড়া ছাড়িয়ে গায় দেয় নাকি?

হ্যাঁ হ্যাঁ, হি হি হি—

তোমার কোনো বুদ্ধি নেই। তা কি কেউ কখনও গায় দিতে পারে, কৈলাসের আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে নিয়ে হৈমন্তী বলে চললো, সাদা তোমাকে ঠিক মানাবে না, হাল্কা গেরুয়া রঙের স্যুট করাবে তুমি। ব্যাস্ শার্ক স্কীনের স্যুট পরে ব্যবসাদার সেজে অম্বর বক্সির পাশে বসে পাইপ ধরালে, কে বলবে তুমি তাদের চেয়ে কম! সাদা রঙ তোমার না পরাই ভালো, কারণ তাড়াতাড়ি ময়লা হবে—

বেশ বেশ, তা আমার নতুন জামা কাপড় কবে হবে গো?

আজই। অনেক আগেই করিয়ে দেয়া উচিত ছিলো। তবে দাঁড়াও দাঁড়াও—আজ তো হবে না। আজ একবার ষ্টুডিওতে যেতে হবে—তুলতুল বক্সির শট্ আছে—

তোমার সংগে মিসেস্ বক্সির বেশ ভাব হয়েছে নাকি ?

হবে না ? একই লাইনের লোক আমরা। প্রথম দেখার দিনই তো আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেল—

ওদের সংগে আলাপ থাকাও সৌভাগ্যের। কতো বড়ো বড়ো লোকের সংগে ওদের আলাপ। কায়দা ক'রে ধরতে পারলে আমার একটা ভালো চাকরি হয়ে যায়—

আবার সেই চাকরি—

ঘাবড়ে গিয়ে কৈলাস বললো, ও হো ভুল হয়ে গেছে। আমি তো এখন বিজনেস্‌ম্যান—

হ্যাঁ, খবরদার সেকথা কখনও ভুলো না। বোকার মত কারুর সামনে বেফাঁস কিছু বলে ফেললে লজ্জায় আমাকে মাটির সংগে মিশে যেতে হবে—

মাথা খারাপ ? আর কখনও আসল কথা ভাঙি ? তা, তুলতুল বক্সির কি কনট্রাক্ট হলো নাকি ?

কেন হবে না ? চেহারা তো ভালোই। তবে পাবলিক কী ভাবে নেবে বলা শক্ত। তাদের মতামতের ওপর তো অভিনেতা-অভিনেত্রীর ভবিষ্যৎ—

তা বটে, কৈলাস উঠে দাঁড়িয়ে বললো, যাই বাজার সেরে আসি, তোমার সংগে গল্প করতে করতে অনেক বেলা হয়ে গেল।

তা হোক, কিছু যায় আসে না। মনে রেখো তোমার চলা বলার ওপর আমার মানসম্ভ্রম নির্ভর করছে। কাজেই খুব সাবধান !

তা আর বলতে ? তুমি দেখ না হাঙরের চামড়ার স্যুট তৈরী হবার পর কেমন ভোল্ ধরি !

শার্ক স্কীন্, আর কখনও হাঙরের চামড়া বলবে না।

বেশ বেশ—শার্ক স্কীন্—হয়েছে ?

হৈমন্তী হেসে বললো, হ্যাঁ। কিন্তু যতোদিন না বিজনেস্‌ম্যান সাজাচ্ছি ততোদিন তোমাকে আমার কাজ করতে হবে। আজ থেকে প্রাণপণে একটা বাড়ি খুঁজবে, এই ধরো, হৈমন্তী একটু ভেবে বললো, শ'দুয়েক টাকার মধ্যে—

চোখ গোল করে বাধা দিয়ে কৈলাস বললো, দু—শো টাকা !

অমন বোকার মত মুখ করো না। এ তোমার চাকরির টাকা নয়, হাজার

সাধের ব্যাপার। খরচ বাড়লে তবে আয় বাড়ে। কষ্ট করে গরিবের মত অনেক দিন থেকেছি, আর নয়। এবার নিজের টাকায় একটু আরাম করবো।

কিন্তু দেখো—

থাক থাক আমাকে আর কিছু বোঝাতে এসো না। তোমার চেয়ে আমি অনেক বেশি বুঝি, হৈমন্তী কয়েক মুহূর্তের জন্যে থামলো, আর, একটা কুকুর কিনতে হবে।

কুকুর! ছি ছি ছি, কুকুর কি হবে?

বেশীর ভাগ বড়ো অভিনেত্রীর অ্যালসেশন্ কুকুর থাকে, তাতে মান বাড়ে—

কিন্তু অ্যালসেশন্ তো রাক্ষসের মত খায়—

আমার পয়সায় খাবে। তাতে তোমার কি?

তা বটে, তা বটে। নাঃ এবার যাই বাজারে?

হ্যাঁ যাও, বেশি করে টাকা নিয়ে যাও, ভালো মাগুর মাছ আনবে, চৈতন্য বাবুকে খেতে বলেছি আজ—

সে তো রোজই খায়।

আহা ও রকম ক'রে বলো না। আমাদের জন্যে চৈতন্য বাবু কতো করে জানো না? আমাদের ভাবনায় ওর ঘুম হয় না। ওকে যদি রোজ ইচ্ছে মত খাওয়াতে পারতাম!

মাগুর মাছের বড়ো বেশি দাম আর দু'টো একটায় তো চৈতন্য বাবুর হয় না, তাই বলছিলাম অন্য কোনো মাছ আনলে হয় না?

না না না, চিৎকার ক'রে হৈমন্তী বললো, আমার টাকা আমি খরচ করবো, তুমি বাধা দেবার কে? কার টাকা কাকে খাওয়াচ্ছো জানো না? যাও শিগগির বাজারে—

হৈমন্তীর কথা শেষ হবার আগেই কৈলাস থলি হাতে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু কৈলাসের ওপর হৈমন্তীর খুব বেশিক্ষণ রাগ থাকে না। এমন মানুষের ওপর কারই বা রাগ থাকে। মাঝে মাঝে স্বামীর জন্যে তার দুঃখ হয়। একজন সাধারণ মানুষের মত বুদ্ধিও কৈলাসের নেই। বিয়ের পর অনেক দুঃখে দিন কেটেছে তাদের। হৈমন্তী কোনো সখ মেটাতে পারে নি, শুধু মুখ বুজে সংসারের কাজ করে গেছে। সকাল থেকে রাত অবধি শুধু কিসে দু'পয়সা খরচ কমে

তার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। তবু অভাব মেটে নি, তবু এক পয়সা বাঁচাতে পারে নি। সকলের কথা সে ভেবেছে, প্রত্যেকের মুখে ঠিক সময় ভাত তুলে দিয়েছে, কিন্তু তার কথা কেউ ভাবে নি, তার শরীরের দিকে কেউ তাকায় নি। যদি এমন করে তার জীবনে এই প্রচণ্ড পরিবর্তন না আসতো তাহলে আর কয়েক বছরের মধ্যে হয় তো সে একেবারে শেষ হয়ে যেতো। যৌবন ফুরিয়ে যেতো, চোখের কোণে কালি পড়তো, দেহ ভেঙ্গে পড়তো, ভালো ভাবে বেঁচে থাকবার কোনো রকম কল্পনা মাথায় আসবার সুযোগ পেতো না।

কে ভাবতে পেরেছিলো যে হৈমন্তীর এমন ব্যক্তিত্ব আছে। কে জানতো যে লোকে তার জীবনের খুঁটিনাটি খবর জানবার জন্যে এমনি করে ছুটোছুটি করবে, নানা ভঙ্গিতে কাগজে কাগজে ছবি বেরুবে, বাইরের পাঁচজন এসে তাকে কাজের জন্যে খুঁজবে। আর সব চেয়ে বড়ো কথা, সংসারের সমস্ত ভার সে হাসিমুখে মাথায় তুলে নিতে পেরেছে। টিপে টিপে কোনো রকমে বাজারের টাকা যোগাড় করা নয়, প্রাচুর্যের মাঝে জীবন উপভোগ করা।

শুধু প্রতিদিনের খরচ চালাবে না হৈমন্তী, সে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় ক'রে ধনীর বংশ সৃষ্টি করে যাবে ; যেন আগামী অনেক বছরের মধ্যে তার পরিবারের কাউকে অর্থ চিন্তা না করতে হয়। এ তার অলস মনের স্বপ্ন বিলাস নয়, কাজের মধ্যে দিয়ে আর খুব অল্প দিনের মধ্যে জীবন সার্থক ক'রে তুলবে হৈমন্তী। বিপুল ঐশ্বর্যের চাবি তার হাতে এসে পড়েছে, আর ভাবনা কি, এখন শুধু ঘুরিয়ে দিলেই হলো।

গভীর তৃপ্তিতে হৈমন্তীর সারা মন ভ'রে গেল। নতুন কেনা বিছানায় সে দেহভার এলিয়ে দিলো। আর বালিশে হাত পড়তেই তার অনেক কথা মনে হলো। কিছু নেই সংসারে, তাকে একে একে অনেক জিনিস কিনতে হবে। সে যে একদিন দরিদ্র ছিলো সে কথা যেন কোনোদিন বাইরের একটি লোকও বুঝতে না পারে। দারিদ্র্যের চেয়ে লজ্জা এ পৃথিবীতে আর কিছু নেই। তার মধ্যে দিয়ে হৈমন্তী কাটিয়েছে সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর। যৌবন শেষ হতে চলেছিলো তবু তার মনে বেঁচে থাকবার আশ্চর্য রঙ ধরে নি। কে জানতো জীবনে এতো মধু আছে, পৃথিবীতে এতো আনন্দ আছে, তার এতো প্রয়োজন আছে। ছায়াচিত্র শিল্পের জন্যে সে যেন নিজের প্রতি রক্তবিন্দু উৎসর্গ করতে

পারে। এই শিল্প তাকে অর্থ দিচ্ছে, যশ দিচ্ছে, বেঁচে থাকবার আনন্দ দিচ্ছে, জনসাধারণের কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত করছে তার ব্যক্তিত্ব। ঘৃণা লজ্জা দারিদ্র্য অপমান থেকে উদ্ধার ক'রে তাকে অন্য জগতে নিয়ে চলেছে। এই শিল্পের কাছে তুচ্ছ হৈমন্তীর জীবন। এই শিল্পের জন্যে সে উৎসর্গ করবে তার সমস্ত কিছু।

দিনে দিনে তার চেহারা বদলে যাবে, বাড়ির রূপ এমনি থাকবে না। আজ যেখানে রয়েছে ওই ভাঙা আয়না, কাল সেখানে আসবে মূল্যবান ড্রেসিং টেবিল। বিয়েতে পাওয়া এই সস্তা খাটের ওপর কোনো মায়া নেই তার, এটা বিক্রি করে সে নতুন নিচু খাট কিনবে। সবই নতুন হবে একে একে। নতুন বাড়ি, নতুন আলমারী, নতুন চেয়ার টেবিল। সে নিজে নতুন হয়ে উঠবে আর তার স্বামীকেও নতুন ক'রে গড়ে তোলবার প্রাণপণ চেষ্টা করবে।

মাঝে মাঝে কৈলাসকে নিয়ে শুধু তার ভাবনা হয়। তাকে যেন আর মনের মানুষ বলে মনে হয় না, সে যেন তার চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। তাকে যেন আর হৈমন্তীর পাশে কিছুতেই মানায় না। সে যদি এর মধ্যে অনেক দীপ্ত নতুন মানুষ না দেখতো, তাহলে এমন করে তুলনা করবার কথা ভাবতে পারতো না। চৈতন্য, হেরম্ব আর তাদের মত আরও অনেক মানুষ দেখেছে হৈমন্তী। তাই আজ আর কৈলাসকে তার মানুষ বলে মনে হয় না, তার ওপর নির্ভর করতে বাধে। স্বামীর ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছে হৈমন্তী, সে জানে কৈলাসের সামর্থ্য কতোখানি। কিন্তু শুধু এই কারণে একজন মানুষকে দোষ দেয়া চলে না, হৈমন্তী দেয়ও না। মহত্তর জীবনের স্বপ্ন দেখবার যার ক্ষমতা নেই, যৌবন নিঙড়ে সুধা উপভোগ করবার যার সাধ্য নেই, পৃথিবীর যে কোনো দেশে এমন লোকের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তাদের দোষ দেয় ক'জন! এ পোড়া দেশের সমাজ এমনি করেই বেশির ভাগ মানুষের ভাগ্য বেঁধে দেয়। ধরা বাঁধা গণ্ডিতে চোখে ঠুলি বেঁধে শুধু দিনের পর দিন ঘোরা।

হৈমন্তী কৈলাসকে দোষ দেয় না, কিন্তু কৃপা করে। আজকাল নতুন বন্ধু-বান্ধবের সামনে তাকে স্বামী ব'লে পরিচয় দিতে তার লজ্জা হয়। সে যাদের আশে পাশে থাকে তাদের কথা-বার্তায় চাল-চলনে যেন সে যৌবনের গর্জন আর জীবনের দ্রুত স্পন্দন শোনে। তারপর কৈলাসকে পাশে

দেখলেই অকস্মাৎ তার সব আলো যেন নিভে যায়, আর মুহূর্তের জন্যে সহসা তার সমস্ত শরীর ঘিন ঘিন করে ওঠে। হৈমন্তীর মনে হয় কৈলাসকে তার পাশে আর কিছুতেই মানায় না।

তবু কৈলাসকে একথা কোনোদিন বুঝতে দেবে না সে, তাকে ছেড়ে যাবার কল্পনাও করবে না। ছেড়ে গেলে হৈমন্তীর সমূহ ক্ষতি। স্বামী ছেড়ে বেরিয়ে আসা মেয়ের অভাব নেই চিত্র জগতে। কিন্তু এদের চোখে তারা আলাদা জাতের মানুষ। সকলে আড়ালে বাঁকা হাসে, তাদের পেছনে ঘোরে, দিনের আলোয় আর পাঁচজনের সামনে প্রেম করবার সুযোগ খোঁজে। সকলেই তাদের বেশ হাল্কা চরিত্রের লোক বলে মনে করে।

কিন্তু শুধু সেজন্যে নয়, কৈলাসকে কোনো কারণে হৈমন্তী ছাড়বে না কোনোদিন। সেসব কথা সে কিছুতেই ভাবতে পারে না; অক্ষম হলে হবে কি, কৈলাসের অনেক গুণ আছে। স্ত্রীকে সে মনেপ্রাণে ভালোবাসে, সন্দেহ করবার লোক সে নয়, স্ত্রীর যশে নিজেকে যশস্বী বলে মনে করে। সরল বিশ্বাসে মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে তার জুড়ি মেলা ভার। এমন মানুষকে এক কথায় হৈমন্তী জীবন থেকে সরিয়ে দিতে পারে না। তাছাড়া দু'টো ছোটো ছোটো ছেলে তাদের। আজকাল হৈমন্তীর সময় কম বলে কৈলাস তাদের দেখাশোনা করে। তারা বাপকে ভালোবাসে খুব।

এইসব নানাকথা ভেবে হৈমন্তী ঠিক করলো যে কৈলাসকে গড়ে পিটে নতুন করে নিতে হবে। খুব একটা পরিবর্তন অবশ্য তার হবে না, কারণ বুদ্ধি অত্যন্ত কম। তবু যেটুকু হয়। এর মধ্যেই পাঁচজন বলাবলি করতে আরম্ভ করেছে, মিস্টার চৌধুরী বড়ো ভালো মানুষ। কথা শুনে হৈমন্তী মনে মনে হাসে, ভালো মানুষ হলো ভাষান্তরে বোকা। কিন্তু সেকথা অতো স্পষ্ট করে কোন্ ভদ্রলোক আর বলতে পারে। যাহোক স্বামীকে নিয়ে সে খুব বেশি মাথা ঘামায় না। হয়তো এমন নিরীহ লোক তার স্বামী বলে মনে মনে খুশী হয়। সে জানে কৈলাস তার কোনো কাজে কখনও বাধা দেবে না, সে যা বোঝাবে, মুখ বুজে তাই বুঝবে, তাই মেনে নেবে। হৈমন্তীর বর্তমান কর্মময় জীবনে এমন একটি স্বামীরই তো প্রয়োজন ছিলো।

কিন্তু এসব কথা খুব বেশিক্ষণ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে না। নিজের

ওপর তার অগাধ বিশ্বাস এসে গেছে, চারপাশে কাঁপছে সাফল্যের সঙ্কেত। এই সময়, স্বামী গোবেচারা কি ধড়িবাজ, বুড়ো কি ছোকরা, আই সি এস কি ব্যবসাদার—সেকথা ভেবে বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করলে তার চলবে না। প্রচুর পরিশ্রম করে তাকে অর্থ উপার্জন করতে হবে, কিসে আরও বেশি কনট্রাক্ট পাওয়া যায় তার চেষ্টা করতে হবে, কেমন করে বাঁকা হাসি দিয়ে হাত টিপতে টিপতে ঝানু প্রযোজককে আয়ত্ত করা যায়, তারই ভাবনা ভাবতে হবে দিনরাত।

উপার্জন বাড়াবার জন্যেই হৈমন্তী গলির মধ্যে এই ছোটো নোংরা বাড়ি ছেড়ে অনেক বেশি ভাড়া দিয়ে নতুন বাড়িতে উঠে যেতে চায়। এ বাড়িতে থাকলে লোকে তাদের আসল অবস্থা খুব সহজে বুঝে ফেলবে। একবার গরিব বলে বুঝে ফেললে তারা কৃপা ক'রে সামান্য টাকায় নতুন কাজ দেবে, কিন্তু প্রতিভার যথার্থ মূল্য দেবে না। কারুর কৃপা কুড়িয়ে বেঁচে থাকতে চায় না হৈমন্তী। তার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। সে চায় নিজের প্রতিভা দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করতে।

তাই তাকে সংসারের আমূল সংস্কার করতে হবে। নতুন বাড়িতে কাউকে আর ভাঙা কাপে চা খেতে হবে না। কেউ জল চাইলে ঝকঝকে পাজামা আর সার্ট পরা চাকর তাকে সফারের ওপর গ্লাস রেখে বরফ দেয়া স্কোয়াশের গ্লাস এগিয়ে দেবে। কাঁটা চামচ কিনে বাড়িতে বিলিতি খাবারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ওরা তাই খেতে পছন্দ করে। একটা রেফ্রিজারেটার যতো শিগগির সম্ভব কিস্তিতে টাকা দিয়ে হলেও সে কিনে ফেলবে। জীবনে প্রথমবার ছবিতে নেমে সে যখন এতো নাম আর অর্থ করতে পেরেছে তখন তার আর ভাবনা কি। সকলে এক বাক্যে তার প্রশংসা করেছে।

তারপর গাড়ি আর বাড়ি তো আছেই। বাড়ি পরে হলেও ক্ষতি নেই, গাড়ি কিন্তু তার অবিলম্বে চাই। সব সময় ষ্টুডিওর গাড়ি চ'ড়ে যাওয়া ভালো দেখায় না, তাতে আসল অবস্থা যেন অনেক পরিমাণে প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর, একটি ছবিতে নেমে তার যা নাম হয়েছে যে, ট্রামে বাসে আর চড়া যায় না। লোকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, শিস্ দেয়, চেঁচায়, নাম ধরে ডাকে। তাই ইচ্ছে থাকলেও আজকাল যখন তখন সে বাইরে বার হতে পারে না।

কেউ মোটর নিয়ে এলে তখন বেরুতে হয়, কিংবা প্রচুর সঙ্কোচ নিয়ে চেনা শোনা বন্ধুবান্ধবের গাড়ি ধার করতে হয়।

এমন করে আর কতোদিন চালানো যায়। গাড়ি একটা তাড়াতাড়ি কিনে ফেলতে হবে। সস্তায় ছোটো গাড়ি সে কিনবে না, বেশি দাম দিয়ে বড়ো গাড়ি চড়ে বেড়াবে। তার দ্বিতীয় ছবি যতোদিন না মুক্তি পায় ততোদিন হৈমন্তীকে একটু কষ্ট করে চালাতে হবেই। তারপর বাঙলার বাজার জয় করে সে পা বাড়াবে বম্বের দিকে। সেখান থেকে মহারাণীর মত হয়ে হৈমন্তী ফিরে আসবে। অজস্র শাড়ি গয়নায় ঢেকে যাবে তার দেহ, গ্যারেজে ঝলসাবে বিরাট নতুন গাড়ি, দামী কার্পেটে হাটু ডুবে যাবে, নিজের বাড়ির প্রশস্ত ঘরের এপাশে ওপাশে ঝকমক করে উঠবে মূল্যবান ফার্নিচার আর হাতের তলায় ডানলোপিলো দিয়ে রেফ্রিজারেটারে রাখা অরেঞ্জ স্কোয়াশের গেলাসে পরিতৃপ্তির সংগে আস্তে চুমুক দিতে দিতে চারপাশে তাকিয়ে তার মনে হবে, সবকিছু তার নিজের, এসব সে পেয়েছে তার অসামান্য প্রতিভার বিনিময়ে।

হৈমন্তীর যেন নেশা ধরে গেছে। তার সারা শরীরে রোমাঞ্চ লাগে।

ফ্ল্যাশ ব্যাক

কৈলাসের গর্ব ছিলো হৈমন্তী। নিজের কথা সে খুব বেশি ভাবতো না। ভাববার কিছু ছিলো না। বোধ হয় সর্বক্ষণ সে স্ত্রীর কথাই ভাবতো। সুযোগ পেলেই পাঁচজনের কাছে হৈমন্তীর গল্প করতো। এমন স্ত্রী নাকি আর কারুর হয় না। শুধু রূপ নয়, হৈমন্তীর গুণও আছে। সে যেমন রান্না করতে পারে তেমন সুন্দর করে কথা বলতে পারে, অল্প আয়ে ভালোভাবে সংসার চালাবার কৌশল জানে, আর কোনো বিষয়ে কখনও অনুযোগ করে না। হৈমন্তী অল্পতেই সন্তুষ্ট। যা কিছু পাক না কেন, সে মনে করে যে পাওনার অতিরিক্ত পেয়েছে। সম্পদে তার মোহ নেই, কোনো কিছুতেই লোভ নেই, কৈলাস আর ছেলেদের কল্যাণ কামনা করা ছাড়া তার অন্য কোনো কামনা নেই। সকাল থেকে রাত্তির অবধি মুখ বুজে শুধু সংসারের কাজ করে। তা ছাড়া তার আর কিছু করবার নেই, সে করতে চায় না।

এতো পরিশ্রম করলেও হৈমন্তীর দেহের অপরূপ লাবণ্য কিছুতেই ম্লান হয় না। আশ্চর্য তার রূপ। ফরসা রঙ, তীক্ষ্ণ শাণিত চেহারা, চোখে সুদূরের স্বপ্ন, ঘন কালো চুলে যেন অরণ্যের গান বাজে। কণ্ঠস্বর শুনলে মনে হয় তার গলা থেকে গান যেন আপনি বেরিয়ে আসে। শিখতে হয় না, অনুশীলনের প্রয়োজন নেই। হৈমন্তীর গান শুনে প্রত্যেকে মুগ্ধ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় গান গাইবার সময় নেই হৈমন্তীর। তাকে নিজের হাতে সমস্ত কাজ করতে হয়। শুধু একটি বাচ্চা চাকর আছে। সে সাধ্য মত সাহায্য করে। কৈলাসের সংগে যখন তার বিয়ের ঠিক হয়, তখন কোনো পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি ওঠে নি। অনেক বোন হৈমন্তীর। সে বড়ো মেয়ে। কয়েক বছর হলো মা বাবা ইহলোক ছেড়ে গেছেন। তার দাদা নিজে বিয়ে করে নি। চার বোনের বিয়ে দেবার ভার তাকে বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছে। রূপ আছে, কিন্তু সেই পরিমাণে অর্থ নেই। বেশ ভালো করে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষায় হৈমন্তী পাশ

করেছিলো, ভেবেছিলো আরও অনেক দূর পড়াশুনো চালিয়ে যাবে। তার যথাসময়ে দাদাকে সাহায্য করবে অন্য বোনেদের বিয়ে দিতে। তাদের বেলায় অর্থের প্রয়োজন, কারণ তারা হৈমন্তীর মত সুন্দরী নয়। তার কলেজে পড়বার কথায় তাই কোনো আপত্তি ওঠে নি। অনুপম একদিন হাসিমুখে হৈমন্তীকে কলেজে ভর্তি করে দিয়ে এলো। আর ঠিক তার কয়েকদিন পর কৈলাসের দিক থেকে তার বিয়ের প্রস্তাব এলো। কথা শুনে হৈমন্তী প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলো, এখন বিয়ে করবার কি দরকার? শুনছি ছেলে নাকি লেখাপড়া জানে না। আমি তোমাকে সাহায্য করবার জন্তে কলেজে ভর্তি হয়েছি, এখন বিয়ে করলে কি চলে?

অনুপম হেসে বলেছিলো, বেশ তো, বিয়ের পর দরকার হলে তোর কাছ থেকে আমি টাকা ধার করবো, তখন আমাকে তোর খুব সাহায্য করা হবে। আর কৈলাসের লেখাপড়ার কথা বলছিস? যা শুনলাম তাতে মনে হলো, পড়াশুনো করতে ওর নানা অসুবিধা ছিলো। তবু দেখ নিজের চেষ্টায় চাকরি যোগাড় করেছে। এখন বয়স অল্প, পরে দেখে নিস ও ঠিক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপের চেয়ে মনের শিক্ষার অনেক বেশি দাম। কৈলাসের সংগে আমি অনেকক্ষণ কথা বলে দেখেছি, ওর সত্যি খুব বড়ো মন। ওকে বিয়ে করলে তুই সুখী হবি হৈমন্তী।

হৈমন্তীর যতোই রূপ থাক, অনুপম জানতো রূপো না থাকলে আজকাল পাত্র-পক্ষ রূপের ছটায় সহজে মুগ্ধ হবে না। হৈমন্তীর বিয়ে হয়ে গেলে অনুপমকে আরও তিনটি বোনের বিয়ে দিতে হবে। তার আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে কৈলাসের চেয়ে ভালো পাত্র তার পক্ষে আশা করা উচিত নয়। আরও একটি সুবিধা ছিলো যে, কৈলাস সংসারে একেবারে একা, হৈমন্তী তার সংসারে রাণীর মত থাকবে। কাজেই অনুপম ভেবে দেখলো, বিলম্বে লাভ নেই।

এমনি করেই সামান্য আয়োজনের মধ্যে দিয়ে হঠাৎ একদিন কৈলাসের সংগে হৈমন্তীর বিয়ে হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি, খুব একটা আগ্রহ কি উন্মাদনা নিয়ে হৈমন্তী কৈলাসকে বিয়ে করে নি। তখন তার প্রথম যৌবন। মনের ফাঁকে ফাঁকে ঝরে পড়ে দূরান্তের আলো, শরতের আকাশের দিকে তাকালে অকারণে শিহরণ লাগে, আর সংগোপনে কোনো রূপবান আগন্তুকের

জন্যে সে প্রতীক্ষা করে, যার তুলনা নেই। তার কল্পনার সে মানুষ কৈলাস নয়। কৈলাসকে হৈমন্তী চেনে না। তার কল্পনার বিশাল রাজ্যের ধারে কাছে কৈলাসকে কোনোদিন দেখা যায় নি। তাই সে প্রথমে হতাশ হয়েছিলো। তবু মুখ ফুটে দাদাকে সেকথা বলতে পারে নি, কারণ হৈমন্তীর এ কথা বোঝবার মত বুদ্ধি ছিলো যে, তার নিজের যতোই রূপ থাক, তার দাদার সংসারের দীন রূপের জন্যে এর চেয়ে ভালো পাত্র হয়তো সে কোনোদিনও পাবে না।

বিয়ের আগে এমনি একটা ভাবনা থেকে থেকে হৈমন্তীর সব আনন্দ বিস্বাদ করে দিলেও বিয়ের পর কৈলাসের সংগে দু'একদিন কথা বলে তার সব গ্লানি ধুয়ে মুছে গেল। অনুপম ঠিক বলেছিলো, কৈলাসের বড়ো মন। স্বামীর রূপ না থাক, তথাকথিত শিক্ষা না থাক, স্ত্রীর জন্যে আছে গভীর ভালোবাসা। তখন হৈমন্তীর অল্প বয়স, তার কাছে অন্য কিছুর চেয়ে প্রেমের মূল্য সব চেয়ে বেশি। স্বামীর কাছ থেকে তাই পেয়ে সে ধন্য হলো। আর কিছু আশা করে নিজেকে ছোটো করে তুললো না, আর কিছু চেয়ে এমন স্বামীর অপমান করতে চাইলো না। অপরিসীম প্রেম পেয়ে সে ধন্য হলো, আর সে এতো বিভোর হলো যে, সংসারের আর কোনো অভাব তার কাছে বড়ো হয়ে উঠলো না। সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদুরের রেখা টেনে সেও স্বামীর প্রেমের পূর্ণ মর্যাদা দিলো। কৈলাসকে গভীরভাবে ভালোবাসলো।

আর কৈলাস? সে হৈমন্তীকে বিয়ে করে অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়লো। সে তাকে রাখবে কোথায়। তাকে তো তার পাশে একেবারেই মানায় না। এ যেন রাজকন্যার পাশে রাখাল। একে কেমন করে তুষ্ট করবে সে? কেমন করে সাজাবে? কেমন করে সমস্ত পৃথিবীর লোককে ডেকে বলবে, তোমরা এসে দেখে যাও আমি কী রত্ন ধরে এনেছি! সারা দিন রাত তার মন ভরে রইলো হৈমন্তীর ভাবনায়, আর অবচেতন মনে কেমন যেন ভয় দেখা দিলো। কি কথা বলবে, কি সে চায়, কোথায় নিয়ে যাবে, কেমন করে আনন্দ দেবে তাকে!

হৈমন্তী, এ বাড়িতে তোমার খুব কষ্ট হবে?

কিসের কষ্ট?

থাকবার। আলো নেই, হাওয়া নেই—

তুমি তো এখানে অনেক দিন আছো, তুমি থাকতে পারলে আর আমার কষ্ট হবে কেন ? এর চেয়ে খুব বেশি ভালো বাড়িতে আমি তো কোনো দিনও ছিলাম না।

আমার আগে এখানে থাকতে কোনো কষ্ট হতো না, কিন্তু তুমি আসবার পর বড়ো কষ্ট হয়—

স্বামীর মনের কথা বুঝতে পেরে হৈমন্তী হাল্কা হাসি হেসে বললো, মন দিয়ে কাজ কর, তুমি যখন ম্যানেজার হবে তখন আমরা তোমার মনের মত বাড়ি খুঁজে সেখানে উঠে যাবো।

কথা শুনে কৈলাস হাঁ করে হৈমন্তীর মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকতো। আর কিছু বলতে পারতো না। ভেবে পেতো না কেমন করে তাকে তার মনের আসল কথা বোঝানো যায়। কেমন করে তাকে স্পষ্ট বলা যায় যে তুমি রূপে গুণে বিদ্যায় বুদ্ধিতে আমার চেয়ে অনেক বড়ো। তোমাকে আমি শুধু ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু দিতে পারি না।

বলবার দরকার হলো না, হৈমন্তী যথাসময় সব কথা আপনি বুঝে নিলো। আর লজ্জায় সে যেন এতোটুকু হয়ে গেল। এমন মানুষকে সে কেমন করে বোঝাবে, তুমি পুরুষ, তুমি আমাকে যা দিয়েছো তাই বা ক'জন দেয়। আমি অতি সাধারণ মেয়ে। এমন রূপ তো ঘরে ঘরে থাকে। কিন্তু তারা কি আমার মত এমন রাণীর ঐশ্বর্য পায় ! আমাকে বাড়িয়ে তুলে তুমি দয়া করে আর লজ্জা দিও না, আমার অপরাধ বাড়িও না।

শুধু কৈলাস নয়, তার বন্ধুরাও এমন কথা ভাবতো। কৈলাসের সংগে কি করে হৈমন্তীর বিয়ে হলো. মেয়ে তো কলেজে পড়তো, সে বাধা দিলো না কেন ? সে কৈলাসের মধ্যে কি দেখতে পেলো ? ইচ্ছে করলে হৈমন্তীর মত মেয়ে কৈলাসের চেয়ে অনেক ভালো ছেলে খুব সহজে পেতে পারতো।

কিন্তু এসব কথার দিন দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল বিয়ের উত্তেজনা, মিলিয়ে গেল বাসর রাতের ফুলের সৌরভ। সংসারের খরস্রোতে পড়ে আর কোনো কথা কারুর মনে রইলো না। শুধু অন্ন চিন্তায় কাটতে লাগল দিনের পর দিন।

পরপর দু'টো ছেলে হলো হৈমন্তীর। সংসারের খরচ আরও বাড়লো, কিন্তু

সেই পরিমাণে কৈলাসের আয় বাড়লো না। ভালো বাড়িতে আর যাওয়া হলো না, তারা আরও কম ভাড়ার বাড়িতে উঠে এসে খরচ কমাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো।

কিন্তু আশ্চর্য হৈমন্তী। অভিযোগ নেই, অনুযোগ নেই, মুখে বিরক্তির চিহ্নমাত্র নেই। যা নেই তা নিয়ে সে দুঃখ করে না, কি পেতে পারতো সেকথা ভেবে আজকের আনন্দ নষ্ট করে না, যা আছে তা দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলে সংসার। সব দিকে তার চোখ আছে, তাকে ফাঁকি দিয়ে তার জন্যে সামান্য বেশি খরচ করবার অধিকার নেই কৈলাসের।

আর আজও কৈলাস ঠিক তেমনি করেই সপ্রশংস দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে, আর ভাবে, কিছুতেই এ সংসারে এমন করে হৈমন্তীর মত মেয়ে শুকিয়ে মরতে পারে না। তার যথেষ্ট বুদ্ধি আছে, অনেক আগেই কৈলাসের তাকে কলেজে ভর্তি করে দেওয়া উচিত ছিলো। অন্তত একটা কিছু সে করুক, সাধারণ মেয়ের মত শুধু সংসারের কাজ করে যাবার জন্যে হৈমন্তীর জন্ম হয় নি। কেমন করে হৈমন্তীকে পৃথিবীর কাছে পরিচিত করে দেয়া যায় সে ভাবনায় কৈলাসের রাত্তিরে মাঝে মাঝে ঘুম হতো না। কিন্তু তার সামর্থ্য কতোখানি! কাকে সে চেনে আর কি সে করতে পারে! তাই মনের মাঝে তীব্র অস্বস্তি নিয়ে কৈলাসের দিন কাটতে লাগলো।

শুধু মাঝে মাঝে সে স্ত্রীকে বলতো, আজকাল তুমি আর গান গাও না কেন হৈমন্তী?

গাই তো, হেসে হৈমন্তী উত্তর দিতো, তুমি শুনতে পাও না, কারণ তখন তুমি ঘুমিয়ে থাকো।

সে কি, কখন তুমি গান গাও?

বাবলু খোকন যখন রাত্তিরে উঠে কাঁদে তখন তাদের আবার ঘুম পাড়াবার জন্যে আমি গান গাই—

না না, ঘুমপাড়ানি গান নয়, হৈমন্তীর রসিকতা বুঝতে না পেরে কৈলাস বলতো, আমি তোমার আসল গানের কথা বলছিলাম।

হৈমন্তী বলতো, আমার ভাবনা অতো বেশি না ভেবে দয়া করে তুমি তোমার নিজের ভাবনা ভাবো। কি চেহারা হচ্ছে দিন দিন তোমার, একটু থেমে

উদাস চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে হৈমন্তী জের টানতো, যদি কোনোরকমে আর পঞ্চাশ টাকা আয় বাড়ানো যেতো!

বাড়াতেই হবে, দেখি আসছে মাসে আমার বড়ো বাবু হবার কথা আছে; যদি ম্যাট্রিকটা পাশ করতে পারতাম!

একটা কথা বলবো? কৈলাসের কাছে সরে এসে তাকে আদর করে হৈমন্তী বলতো, বল তুমি আপত্তি করবে না?

তোমার কোন্ কথায় কবে আমি আপত্তি করেছি হৈমন্তী!

আমি ভাবছিলাম—

থামলে কেন, বল?

মানে, আজকাল তো অনেক মেয়েই চাকরি করে—

কি চাকরি?

ম্যাট্রিক পাশ মেয়েরা তো নানা আপিসে কাজ করছে, আমি বলছিলাম তেমন একটা চাকরির চেষ্টা আমিও যদি করি—

কথা শুনে কৈলাসের চোখ বড়ো হয়ে যেতো, তুমি আপিসে গিয়ে চাকরি করবে হৈমন্তী!

কেন নয়? তোমাকে তাহলে এতো ভাবনা করতে হবে না। অন্তত শ' খানেক টাকা মাইনের একটা চাকরি যদি আমি পাই, তাহলে সংসারের কতো সুবিধা হবে ভেবে দেখেছো?

কৈলাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতো, না হৈমন্তী তা কিছুতেই হয় না, তোমাকে আমি কিছুতেই চাকরি করতে দেবো না। তুমি সোনার প্রতিমা, ছোটো কাজ করতে তুমি এ পৃথিবীতে আসো নি।

কিন্তু তোমার কষ্ট আমি যে আর দেখতে পারি না গো। সকাল থেকে রাত্তির অবধি অমানুষিক পরিশ্রম করছো। অথচ দু'বেলা পেট ভরা খাওয়া তোমার জুটছে না, এ কি আমার কম দুঃখ!

দেখি কি হয়, এবার উন্নতির চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু কখন চেষ্টা করবে কৈলাস। বাবলু খোকন বড়ো হবার সংগে সংগে সে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলো। সারাদিন্ তাকে টাকার ভাবনা ভাবতে হয়। সকালবেলা আপিস বসবার ঘন্টা দেড়েক আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে

পুরানো বন্ধুবান্ধবকে হানা দিয়ে টাকা ধার চাইতে হয়। কোথাও পায়, কোথাও পায় না। আবার সাড়ে ছ'টা সাতটার পর আপিস থেকে বেরিয়ে তাকে ঘুরে ঘুরে টাকা ধার করবার চেষ্টা করতে হয়। বাড়ি ফিরতে রাত হয়। অবসাদে শরীর ভেঙে পড়ে। শীতবস্ত্রের অভাবে ঠকঠক করে কাঁপে, ছাতা নেই বলে বর্ষায় ভিজে ভিজে বাড়ি ফেরে। আর অতো পরিশ্রম করেও ভাবে, কাল টাকা কেমন করে যোগাড় হবে। বাড়িতে একটিও পয়সা নেই।

হৈমন্তী কিন্তু নির্বিকার। হাসিমুখে কৈলাসের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতো, অতো ভাবছো কেন, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও, কাল সকালে আমি সব বন্দোবস্ত করে দেবো।

কেমন করে করবে, আমার কাছে যে খুচরো পয়সা একটাও নেই?

ওই মুদির দোকান থেকে আলু ডিম মসলা পেঁয়াজ ধারে আনবো, তুমি জানো না আমি অমন মাঝে মাঝে আনি।

কিন্তু ধার শোধ করবে কেমন করে?

সে-ভাবনা মাস শেষ হ'লে আমি ভাববো, চাকরি তো করতে দিলে না, তাহলে আমার এতো ভাবনা হতো না—

কৈলাস হৈমন্তীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলতো, তুমি যে কাজের যোগ্য সে কাজ যদি কখনও পাও তাহলে করো।

সে কাজ কি?

অনেকক্ষণ ভেবে কৈলাস উত্তর দিতো, তা তো ঠিক জানি না, তবে খুব একটা বড়ো কাজ, যা করতে কেরাণীদের মত পরিশ্রম করতে হয় না, কিন্তু খুব নাম হয়, কাগজে ছবি বার হয়, দেশসুদ্ধ লোক চিনতে পারে।

হৈমন্তী খুব জোরে হেসে উঠতো, কি যে বল!

তোমার সংগে যদি একজন বড়ো চাকুরের বিয়ে হতো তাহলে দেখতে এতো-দিনে আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যেতো, আমাকে বিয়ে করে শুধু আধপেটা খাওয়া জুটছে—

রাগ করে হৈমন্তী কৈলাসের মুখ চেপে ধরে বাধা দিয়ে বলতো, অমন করে যা-তা বলো না। কিছু হবার হ'লে মানুষ যে অবস্থায় থাক না কেন, শেষ অবধি

তার সব ঠিক হয়। কিন্তু দয়া করে তুমি সত্যি আমাকে অতো বড়ো করে দেখো না, আবার বলছি আমি সাধারণ মেয়ে।

সংসারে অর্থ না থাক, সুখ ছিলো, শান্তি ছিলো। কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যেও প্রেমের কোথাও ফাটল ধরে নি। ওদের মুখে ক্লান্তির স্পষ্ট ছাপ মাঝে মাঝে দেখা দিলেও বিরক্তির রেখা দেখা যায় নি।

শুক্ল পক্ষে যেদিন পৃথিবীতে জ্যোৎস্নার প্লাবন নামতো, আকাশে একটি একটি করে তারা ফুটে উঠতো, সেদিন আপিস থেকে ফিরে কৈলাস দেখতো খোঁপায় বেল ফুলের মালা জড়িয়ে হৈমন্তী তারই পথ চেয়ে বসে আছে। ছেলে দু'টোকে চাকরের কাছে রেখে ওরা যেদিকে চোখ যায় সেদিকে বেরিয়ে পড়তো। হয় হৈমন্তীর দাদার বাড়ি গিয়ে কৈলাস শালীদের সংগে হৈ হৈ করতো, নয় তার কোনো বন্ধুর বাড়ি গিয়ে সময় কাটাতো। অনেক রাত্তিরে রিক্সায় ফিরে এসে জেগে জেগে ওরা দু'জন আরও অনেকক্ষণ গল্প করতো। তবু ক্লান্তি আসতো না। শুধু কখনও কখনও কয়েক মিনিটের জন্যে অবাক হয়ে কৈলাস হৈমন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতো, এ কেমন মেয়ে, দারিদ্র্য যার রূপ লাবণ্য মনের জোর—কিছুই হরণ করতে পারে না, দারিদ্র্যকে যে গ্রাহ্য করে না, হাজার অভাবের মধ্যে থাকলেও যার মুখের হাসি কিছুতেই মিলিয়ে যায় না। কৈলাসের মনে হতো হৈমন্তী যেন দেবী, আর সে নিজেকে ধন্য মনে করতো বারবার। এমন মেয়ে বিয়ে করবার সৌভাগ্য ক'জনের হয়। কৈলাসের শক্তি ছিলো তার স্ত্রী।

দারিদ্র্য আরও বিকট রূপ নিলো। বাইরের লোকের কাছে আর বোধ হয় মান সম্ভ্রম বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। বাড়িওয়ালা চেঁচামেচি করে, গয়লা চোখ রাঙায়, অনেক মাসের মাইনে না পেয়ে ঝি কাজ ছেড়ে চলে যায়। বাবলু খোকন বড়ো হচ্ছে। চারপাশে গভীর অন্ধকার। আশার সামান্য রেখাও আর চোখে পড়ে না। কৈলাসকে না জানিয়ে হৈমন্তী চুপে চাপে তার ছোটখাটো গয়না বিক্রি করে সংসারের প্রয়োজন মেটাতে লাগলো।

মাথা ঝিম ঝিম করে কৈলাসের। সে ভেবে পায় না সংসারের যে চাকা কাদায় ডুবে যেতে বসেছে তাকে কেমন করে, কোন্ শক্তি দিয়ে টেনে তুলবে। বারবার শুধু মাথা ঘুরে যায় তার।

এর মধ্যে একদিন বাড়ি বদলাতে হলো। পুরানো বাড়িওয়ালা ভাড়ার জন্তে এমন অপমান করলো যে ওরা বাড়ি না ছেড়ে পারলো না। কিন্তু এটা করে লাভ হলো ওদের। নতুন বাড়িটা হঠাৎ বেশ কম ভাড়ায় পাওয়া গেল। পাড়াটাও ভালো, বেশ খোলা মেলা। আশে পাশে অনেক ফাঁকা জমী। সকাল সকাল সংসারের কাজ সেরে হৈমন্তী ছেলেদের নিয়ে খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায়।

তারপর আস্তে আস্তে এমনি করে জীবন কাটাতে ওরা অভ্যস্ত হলো। এর চেয়ে ভালো করে দিন কাটানোর কথা ওদের আর মনেও পড়তো না। তবু দুঃখ করলো না হৈমন্তী, চারপাশে আরও পাঁচজনের অবস্থা দেখে সে স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে তারা অনেকের চেয়ে ভালো আছে। শুধু প্রাণের উচ্ছলতা দিয়ে সে সংসার ভরে রাখবার চেষ্টা করতো। মাঝে মাঝে তার তিন বোন আসতো—উমা, উষা, হাসি—চারজনে মিলে চিৎকার করে গান গেয়ে সেদিন অবধি প্রমাণ দিতো যে, দারিদ্র্যের মাঝে থেকেও তাদের প্রাণ শুকিয়ে যায় নি।

কিন্তু তবু কতোদিন আর প্রতিকূল অবস্থার সংগে যুদ্ধ করা যায়, আধপেটা খেয়ে কতোদিন আর শরীরের লাবণ্য ধরে রাখা যায়। হৈমন্তী হয় তো বুঝতে পারলো না। কিন্তু আস্তে আস্তে তার সমস্ত প্রাণ-শক্তি মরে যেতে লাগলো। ওদিকে কৈলাসও আর তেমন করে হৈমন্তীর কথা ভাববার অবসর পায় না। তাকে ছেলেদের খাবারের কথা ভাবতে হয়, তাদের দুধের দাম মেটাবার কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়, আর সংসারের প্রতিদিনের খরচ যোগাড় করবার জন্তে মাসের শেষে ধার করবার সব রকম চেষ্টা করতে হয়।

আর ঠিক এমন সময় সেই ঘটনা ঘটলো। স্বামী স্ত্রী যখন ব্যয়ের নানা ভাবনায় বিব্রত, যখন প্রচণ্ড পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনার কথাও তারা ভুলতে বসেছে, তখন অকস্মাৎ চারপাশে অজস্র আলো জলে উঠলো। আলোর এতো জোর যে চোখে ধাঁধা লাগে। অবশ্য যোগাযোগ হয়েছিলো কৈলাসের জন্তেই।

সেদিন কৈলাসের আপিসে বেরুতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিলো। একটির পর একটি ভরা ট্রামগুলি ছাড়তে বাধ্য হয়ে হতাশ চোখে সে অন্য ট্রামের অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু আশা নেই। প্রত্যেকটি ট্রামে বাদুড়-ঝোলা হয়ে মানুষ

চলেছে, কৈলাসের পক্ষে সহজে ট্রামে ওঠা সম্ভব হবে না। ব্যস্ত হয়ে সে ভাবছিলো, এখন কি করা যায়।

কিন্তু খুব বেশিক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হলো না। কয়েক মিনিটের মধ্যে ষ্টুডিবেকার গাড়িতে আরামে গা এলিয়ে সে সেদিন আপিসে এসে পৌঁছলো। চৈতন্য গড়াই-এর সংগে সেই প্রথম কৈলাসের আলাপ হয়। আর প্রথম দর্শনেই তার মনে হয়, এমন সরল মানুষ হয় না। এতো বড়ো লোক কিন্তু কোনো অহঙ্কার নেই।

কৈলাসের সামনে ষ্টুডিবেকার দাঁড় করিয়ে দরজা খুলে হাসি মুখে চৈতন্য গড়াই বললো, এই যে, কত দূর যাবেন? আসুন—

কৈলাস একটু ঘাবড়ে গেল। সহজে ভেবে ঠিক করতে পারলো না, উঠবে কি না। একে তো সে চেনে না। কিন্তু ভদ্রলোকের ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে সে তার অচেনা নয়।

আবার হাসলো চৈতন্য গড়াই, তারপর গাড়ি থেকে নেমে কৈলাসের হাত ধরে বললো, আসুন, আমিও ওদিকে যাচ্ছি—

ঢোঁক গিলে কৈলাস বললো, আমি মিশন রো-তে যাবো—

বাঃ, আমিও ঠিক ওইখানেই যাবো, আসুন।

কৈলাস গাড়িতে উঠে পড়লো। চৈতন্য সসম্ভ্রমে সরে গিয়ে তার জায়গা করে জিজ্ঞেস করলো, সিগ্রেট আছে?

না না, হেঁ হেঁ, আমি সিগ্রেট খাই না।

এই ড্রাইভার, ছটফট করতে করতে চৈতন্য ড্রাইভারের ঘাড়ে হাত দিয়ে বললো, তোমার কাছে খুচরো আছে? দু' প্যাকেট ক্যাপেষ্টেন নিয়ে এসো। পয়সা পরে নিও। খুচরো টাকা নেই এখন আমার কাছে, সব একশো টাকার নোট।

গাড়িতে বসে কৈলাস যেন কেমন বোকা ব'নে গেছে। একটু উসখুস করে চৈতন্যর দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ বললো, বেশ সুন্দর গাড়ি আপনার!

না-না-না, হাঃ-হাঃ-হাঃ, এ গাড়ি আমার নয়। গাড়ি যদি আমি কখনও নিজে কিনি তাহলে বার্ণাড শ'র মত রোলস্ রয়েস্ কিনবো। এসব গাড়িতে, মানে, আমি ঠিক কম্ফর্টেবল ফিল করি না।

এটা কার গাড়ি?

আমার এক অ্যাডমায়ারার হীরেন সান্যালের। ফিল্ম ওয়ার্লডে অমন অনেক চেলা-চামুণ্ডা আমার ডাইনে বাঁয়ে আছে, আমাকে সার্ভিস্ দিয়ে তারা ধন্য হয়ে যায়। দে টেক্ মি অ্যাজ এ প্রফেট। আমার নাম চৈতন্য গড়াই—মহাপ্রভু, হাঃ-হাঃ-হাঃ—

আপনি বুঝি ফিলিমে অ্যাক্টিং করেন?

ওঃ নো, আই ক্রিয়েট, প্রিজার্ভ, অ্যাণ্ড ডেষ্ট্রয় দি অ্যাকটরস্—

হাঁ করে কৈলাস বললো, ঠিক বুঝলাম না?

গরুর মত ড্যাবড্যাবে চোখে কৈলাসের দিকে তাকিয়ে চৈতন্য বুঝিয়ে দিলো, আমি ফিল্ম ডিরেক্টার—

ও, তাই নাকি? তাহলে তো আপনি খুব বড়োলোক—

না-না, বছরে চার পাঁচ লক্ষ টাকায় আর কি হয়? আই স্যুড্ হ্যাভ্ রোল্‌ড্ ইন ক্রোরস্—

কৈলাস চোখ বড়ো করে বললো, বলেন কি মশাই, আপনি বছরে চার পাঁচ লাখ টাকা আয় করেন?

চৈতন্য হাসলো, উত্তর দিলো না। ড্রাইভার সিগ্রেট কিনে ফিরে এসেছে, তার হাত থেকে ক্যাপষ্টেনের দু'টো প্যাকেট নিতে নিতে চৈতন্য বললো, জলদি, ডালহৌসী চলো—

লেকিন্ বাবু দশ বাজে ওয়াপাশ্ যানে বোলা—

চোপ্‌রও! সিধা চলো।

হীরেন সান্যালের নিউ মডেল ষ্টুডিবেকার কৈলাস আর চৈতন্যকে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে আস্তে আস্তে পথ করে চলতে লাগলো। কৈলাস একটু কুঁকড়ে গেল যেন। চৈতন্য গড়াই-এর দিকে আড় চোখে তাকিয়ে নিজের আধময়লা ধুতি পাঞ্জাবী আর ছেঁড়া চটি দেখতে দেখতে তার আবার নতুন করে মনে হলো, সে সত্যি গরিব—বড়ো দরিদ্র।

দাঁতে সিগ্রেট চেপে চৈতন্য বললো, আপনাকে আমি অনেকবার রাস্তায় দেখেছি, মানে আমি আপনার নেবার্। আপনাদের বাড়ির খুব কাছে থাকি।

তাই নাকি, কোন্ বাড়িটা আপনার বলুন তো?

আপনাদের সামনের পেভমেণ্টে তেতলা হলদে বাড়ি—

ও বুঝেছি। আপনার বাড়ির সামনে তো দিন রাত্তির অনেক মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে—

ধোঁয়া ছেড়ে চৈতন্য বললো, চাকরির জন্তে আসে সব। কতো ছেলে মেয়ে, দুঃস্থ সাহিত্যিক—হাজার হাজার—

আপনি চাকরি দিতে পারেন বুঝি ?

হাঃ হাঃ, তা পারি। এই তো সেদিন একজনকে বারো শো টাকা মাইনের চাকরি দিলাম।

ও বাবা, বা···রো—শো !

ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে ওটা খুব বড়ো ফিগার নয়। বারো লক্ষ টাকার অফার পেয়েছিলাম কিন্তু ইচ্ছে করে বম্বে গেলাম না—

কেন ? কেন ?

এ কোম্পানী, মানে প্রিমিয়ার পিকচার্স অর্থাৎ পি. পি. তাহলে অচল হতো, আমি ছাড়া এখানে এভ্রি বডি ল্যাকস্ গ্রে মেটার—

কৈলাস সপ্রশংস দৃষ্টিতে চৈতন্যকে দেখতে দেখতে বললো, নাকি ?

আর ইউ ইন্টারেষ্টেড্ ইন ফিল্মস ?

আজ্ঞে ?

ছবিতে নামবার ইচ্ছে আছে ? আই ক্যান গিভ্ ইউ এ চান্স দ্যান্ ? মানে রাস্তায় যখন আমি আপনাকে দেখতাম তখন বারবার মনে হতো, ইউ কুড্ ডু ওয়েল্ ইন ফিল্মস। বাই দি ওয়ে, চৈতন্য সিগ্রেট নামালো, আপনার সংগে একটি ইয়ং লেডিকেও মাঝে মাঝে দেখি, ইফ আই মে আস্ক্, তিনি কে ? ইওর সিষ্টার ?

কে ? হৈমন্তীর কথা বলছেন ? হেঁ হেঁ, আমার স্ত্রী ?

ও—য়া—ট ? চৈতন্যর সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ-শিহরণ খেলে গেল। কৈলাসের ছেঁড়া জুতো থেকে মাথা অবধি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে থেমে থেমে বললো, ইওর ওয়াইফ, আই সি !

আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব ভালো মেয়ে। খুব বুদ্ধি। আমি যা সামান্য মাইনে পাই তা' দিয়ে সুন্দর করে সংসার চালায়—

আমি তাঁকে অবশ্য খুব ভালো করে দেখি নি। জাষ্ট অ্যাট্ এ গ্লান্স্—
দয়া করে একদিন আসবেন আমাদের বাড়ি? বলতে লজ্জা হচ্ছে, যা বিশ্রী ঘর, হয় তো আপনার খুব অসুবিধা হবে।
কিছু না। আই অ্যাম দি ফ্রেণ্ড অব দি পুওর। আমার নাম চৈতন্য, আমি আচণ্ডালে ধরি দিই কোল, হাঃ হাঃ হাঃ—
কবে আসবেন বলুন?
কখন থাকেন আপনারা?
সন্ধ্যেবেলা। তবে মাঝে মাঝে আপিস থেকে ফিরতে আমার অনেক দেরি হয়—
রবিবারে সকালে থাকেন?
হ্যাঁ হ্যাঁ, পরশু আসবেন?
বেশ। রবিবার সকালেই আমি একটু আড়ালে থাকতে চাই। বাড়িতে যা ভিড় হয়, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।
সে তো দেখতেই পাই, আমাদের এখানে তখন কেউ থাকবে না। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যতোক্ষণ ইচ্ছে বসতে পারেন।
থ্যাঙ্ক ইউ। আর আপনিও ছবিতে নামবার কথাটা ভেবে দেখবেন। আই মিন ইট। আপনার মুখে একটা ওয়াণ্ডারফুল সোশ্যাল ডিসকন্টেন্ট-এর ছাপ আছে। শ্লেভিয়ান কন্সেপ্সনে আমি একটা নতুন গল্প এক লেখককে দিয়ে লেখাচ্ছি। ইফ ইউ আর ইন্টারেষ্টেড, তার হিরো—আই মিন্ আমি তাহলে সেই ছবিতে আপনাকে কাজ দিতে পারি।
হেঁ হেঁ, আমার ওসব হবে না।
প্রথমে সব আর্টিষ্টদের সেকথা মনে হয়। তবে দিস্ উইল্ বি অ্যান্ আউটষ্ট্যাণ্ডিং ষ্টোরি। শ' যেকথাগুলো স্পষ্ট করে বলতে পারে নি, আমি সেগুলো একেবারে ভালো করে লেখাচ্ছি, হাঃ হাঃ হাঃ—
কৈলাস হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললো, এই যে, দেখুন গাড়িটা এখানে একটু থামাতে বলবেন, আমাকে নামতে হবে—
নিশ্চয়ই। এই ড্রাইভার রোকো!
রাস্তায় নেমে গাড়ির দরজা বন্ধ করে কৈলাস বললো, রবিবার সকালে আসবেন কিন্তু ঠিক।

সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে চৈতন্য শুধু ঘাড় কাৎ করলো। তারপর দেখলো, প্রায় ছুটতে ছুটতে কৈলাস আপিসের দিকে চলেছে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে চৈতন্য বললো, ব্লাডি ইম্বেসিল্!

রবিবার সকালে চৈতন্য গড়াই ঠিক এলো। তার কথা কৈলাস অনেক ক'রে হৈমন্তীকে ব'লে রেখেছিলো। সে কিন্তু বিশেষ উৎসাহ দেখায় নি। কৈলাসের মুখ থেকে সব শুনে বলেছিলো, উমা উষাদের মুখে ওর খুব নাম শুনি বটে, ওর ছবি দেখতেও খুব ভালো লাগে। কিন্তু ফিলিমের লোকদের আমি খুব ভালো চোখে দেখতে পারি না।
কৈলাস মাথা চুলকে বলেছিলো, ইনি কিন্তু খুব ভদ্রলোক। নিজে এগিয়ে এসে আমাকে কেমন গাড়িতে তুলে নিলেন। বললেন, বায়স্কোপে নামলে খুব বড়ো চাকরি পাইয়ে দেবেন।
হৈমন্তী স্বামীর কথা শুনে হাসলো না। গম্ভীর হয়ে বললো, না না বেশ আছি, ওসবে কাজ নেই। গরিবের মুখে ওকথা মানায় না।
কৈলাসের বাড়িতে চৈতন্য গড়াই এলো ট্যাক্সি ক'রে। কৈলাস অনেকক্ষণ থেকে বাইরে দাঁড়িয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। সে তাকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে ভেবে পেলো না এইটুকু পথ আসবার জন্যে চৈতন্য ট্যাক্সি নিলো কেন। ভাবলো, হয়তো তাদের মত লোক সব সময় তাই করে থাকে অর্থাৎ হেঁটে পথ চলে না।
এই যে, গুডমর্নিং মিষ্টার চৌধুরী, চৈতন্য লাফ দিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিতে দিতে বললো, আই অ্যাম্ ভেরি সরি, আমার আসতে বড়ো দেরি হয়ে গেল—
না না, ঠিক আছে, আসুন।
আই হ্যাভ মাই ব্রেকফাষ্ট অ্যাট ফিরপো'জ অন সান ডেজ—
নাকি ?
সেখানেই দেরি হয়ে গেল। আর বলেন কেন, এভরি বডি ইজ ইন্টারেষ্টেড ইন-ফিল্মস। আজ ফারপোয় গগন নন্দী আই সি এস আর তার স্ত্রীর সংগে দেখা। মিসেস নন্দী ছবিতে নামতে চান—

বলেন কি, আই সি এস-এর স্ত্রী ছবিতে নামবেন ?

আই সি এস—ফুঃ! কতো রাজা মহারাজার মা বোন স্ত্রী ভাগ্নী দু' বেলা আমাকে লাঞ্চ ডিনার চায়ে ডেকে অস্থির করে তুলছে একটা চান্স পাবার জন্তে —বাট আই অ্যাম ফেড আপ উইথ দেম্—মেয়েদের ভিড় এখন এতো বেশি যে এক্সেপসেনালি ট্যালেনটেড্ না হলে আই অ্যাম্ আফ্রেড্, আই কান্ট টেক এনি বাড ইন্ অ্যাট দি মোমেণ্ট, হাঃ হাঃ হাঃ—

তা গগন নন্দীর স্ত্রীকে কি নামাবেন ?

না না, সী ইজ অ্যান ওল্ড হ্যাগ্, এ লাইনে সুবিধা করতে পারবেন না।

বসুন বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

চৈতন্য তবু বসলো না। দাঁতে সিগ্রেট চেপে ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। ছোটো ঘর। অল্প জিনিসে যতোদূর সম্ভব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। জানালায় হলদে রঙের পর্দা ঝুলছে। দেয়ালে কয়েকটি ফটোগ্রাফ। একটি চিনতে পারলো চৈতন্য, কৈলাস আর হৈমন্তীর বিয়ের ছবি। ঘরের মাঝখানে একটি ছোটো গোল টেবিল আর কাঠের কয়েকটি অতি সাধারণ চেয়ার।

রামময় মিত্র রোডের একটি ছোটো বাড়ির একতলায় দু'টো ঘরের ফ্ল্যাট। খুব যদি বেশি হয়, টাকা পঞ্চাশ ভাড়া হবে। বসবার ঘর রাস্তার ওপরেই। মন্দ আলো আসে না, কিন্তু হাওয়া একেবারেই নেই। চৈতন্য ঘামতে ঘামতে মাথা তুলে ওপরে তাকিয়ে দেখলো, পাখা নেই। টেবিল ফ্যানও চোখে পড়লো না ঘরের কোথাও। গ্রীষ্ম কাল। আজ বেশ গরম পড়েছে। বাড়ির ভেতর থেকে রান্নার ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ আসছে। আর মাঝে মাঝে হৈমন্তীর গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। কখনও চিৎকার করে ছেলেদের উনুনের কাছ থেকে সরে যেতে বলছে, কখনও চাকরের নাম ধরে ডেকে রান্নার দরকারী জিনিসপত্র হাতের কাছে এগিয়ে দিতে বলছে। চৈতন্য যতোক্ষণ পারে কান খাড়া করে হৈমন্তীর কণ্ঠস্বর শুনলো। তারপর এক সময় শব্দ করে সেই কাঠের চেয়ারে বসে পড়লো। কৈলাস অনেকক্ষণ আগেই বসে পড়েছে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে চৈতন্য বললো, একদিন সন্ধ্যেবেলা এলেই ভালো হতো, কি বলেন ? সকালে সংসারের নানা রকম কাজ থাকে—

না না, আমার কোনো কাজ নেই, কৈলাস হেসে বললো, আজ আপনি আসবেন বলে আমি খুব সকালে বাজার সেরে রেখেছি—

তাই নাকি ? আমি আসবো বলে বাজার করে রেখেছেন ? বাঃ, তাহলে আজ খাওয়াটা জমবে ভালো। বিলিতি খাওয়া খেতে খেতে অরুচি হয়ে গেছে। হাাঃ হাাঃ হাাঃ—

থতোমতো খেয়ে কৈলাস বললো, খাবেন ? একটু দাঁড়ান, হৈমন্তীকে বলে আসি।

না না, ব্যস্ত হবার দরকার নেই—

কিন্তু কৈলাস ততোক্ষণে ভেতরে চলে গেছে। হৈমন্তী তখন রান্না নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। মাথা তুলে কৈলাসের দিকে তাকাবার তার সময় নেই। মাসের প্রথম রবিবারে একটু ভালো খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বেচারী কৈলাস তো আপিসের দিন ভালো করে খেতেই পারে না।

এই যে হৈমন্তী, কৈলাস রান্নাঘরের চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকলো।

কি বলছো ?

মানে, একটা ঢোঁক গিলে কৈলাস বললো, একটু মুশকিল হয়েছে—

হৈমন্তী হেসে জিজ্ঞেস করলো, কি মুশকিল গো ? গয়লা তাগাদা দিতে এসেছে বুঝি ?

না না, চৈতন্য বাবু এসেছেন।

কে ?

চৈতন্য বাবু। মিষ্টার গড়াই—

তা গড়াই চড়াই যিনিই আসুন, আমার কি ? তুমি গিয়ে গল্প কর না ছাই ?

হেঁ হেঁ, তা করছি, কিন্তু তিনি খাবেন আজ এখানে—

রান্না থামিয়ে অবাক হয়ে হৈমন্তী বললো, বল কি ! আরে বুদ্ধি করে সেকথাটা একটু আগে বলতে পারলে না ?

আমি কি ছাই জানতাম ? আমার বাজার করার কথাটা কেমন এদিক ওদিক হয়ে গেল, আর উনি ভাবলেন ওর জন্যে বাজার করা হয়েছে—

তা বেশ হয়েছে। যা হয়েছে তাই খাবেন আর কি। আমি হারাণকে পাঠিয়ে দই মিষ্টি আনিয়ে নিচ্ছি। তুমি যাও, বোসো গিয়ে, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তুমি নিজে চা নিয়ে এসো। খুব ভদ্রলোক। তোমার সংগে আলাপ করলে খুশী হবেন। আমি তো আর তেমন কথাবার্তা বলতে পারি না—

খুব হয়েছে। ফিলিমের লোকের সংগে বসে আমি গল্প করতে পারবো না। ওরা বড়ো বদ হয়।

আহা, সকলে তো সমান নয়। চৈতন্য বাবু খুব ভদ্রলোক।

হৈমন্তী রসিকতা করে বললো, যদি ফিলিমে নামতে বলেন ?

নামবে। তাহ'লে তো বেঁচে যাবে, কৈলাস হেসে বললো, কতো লোক কতো হাতে সোনার পাখা দিয়ে হাওয়া করবে। রান্নাঘরে বসে এমন ঘামতে হবে না—

আচ্ছা আচ্ছা থাক, তুমি যাও, ভদ্রলোক অনেকক্ষণ একা বসে আছেন। আমি একটু পরে চা নিয়ে আসছি।

অল্পক্ষণের মধ্যে হৈমন্তী চা নিয়ে এলো। এতোক্ষণ ধরে চৈতন্য তারই প্রতীক্ষা করছিলো। তাকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে দুই হাত তুলে বললো, নমস্কার!

নমস্কার, বসুন।

লেডীজ ফার্ষ্ট, দয়া করে আপনি আগে বসুন মিসেস চৌধুরী, এই ফাঁকে হৈমন্তীর দিকে বেশ ভালো করে চৈতন্য তাকিয়ে দেখলো। সাদা শাড়ি পরেছে। দেখলেই বোঝা যায় রান্না করতে করতে এইমাত্র উঠে এলো। কাপড়ে হলুদের দাগ লেগেছে। মুখে জমাট বেঁধেছে ঘাম। চুল একটু উস্কোখুস্কো যেন। তা হোক। কে বলবে বোকা কেরাণীর বউ। কী অসামান্য ব্যক্তিত্ব চেহারায়! চৈতন্য জীবনে এমন চেহারা কখনও কোথাও দেখে নি। চোখে এমন তেজ যে বাধার পাহাড় নিমেষে ভস্ম করে দিতে পারে। চৈতন্যের সমস্ত চেতনা যেন কেঁপে উঠলো। মুগ্ধ বিস্ময়ে সে হৈমন্তীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

আর হৈমন্তী? তার চোখে যেন তীব্র আলোর দীপ্তি লেগেছে। এ কে! এ যেন তার যুগ-যুগান্তের চেনা। এর আগে এমন করে কেউ তো তার সংগে কথা বলে নি। এতো সম্মান তাকে করে নি কেউ। হঠাৎ কি হলো হৈমন্তীর! তার সমস্ত শরীরে এমন কাঁপন লেগেছে কেন। এখুনি হয়তো তার হাত কেঁপে কাপ দু'টো মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে যাবে।

তাড়াতাড়ি কোনোরকমে টেবিলের ওপর কাপ রেখে তোতা পাখির মত হৈমন্তী শুধু বললো, এখন তো বসতে পারবো না। রান্না বাকী আছে। আমি যাই—হৈমন্তী পালিয়ে বাঁচলো।

কিন্তু হৈমন্তী জানতে পারলো না সে কি রান্না করলো। মাছে মুন বেশি দিলো, অম্বলে গরম মশলা ছাড়লো, ঠিক মনে করতে পারলো না মাছের তরকারীতে ঝাল দিয়েছে কিনা। রাঁধতে রাঁধতে উদাস চোখে বাইরে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো আর প্রাণপণ শক্তিতে মনে মনে বার বার বলতে লাগলো, ঈশ্বর, আমাকে বাঁচাও!

নিজেকে সামলে নিতে হৈমন্তীর বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় লাগলো। নিজের কথা ভেবে লজ্জা পেলো সে। কে জানে চৈতন্যবাবু কি ভেবেছে, তার ব্যবহার নাটকীয় হয়েছে কি না। দুপুর বেলায় খাবার সময় কিন্তু সে বেশ সহজ হয়ে উঠলো। এর মধ্যে অবশ্য অনেক কাজ সেরে ফেলেছে হৈমন্তী। ছেলে দু'টোকে চান করিয়ে খাইয়ে দিয়েছে। নিজেও স্নান সেরে নিয়েছে। মাথায় পুরু করে সিঁদুরের রেখা টেনেছে, কপালে দিয়েছে বড়ো টিপ। সাদা শাড়ি বদলে নীল পাড়ের হাল্কা হলুদ রঙের শাড়ি পরেছে। পরিবেশন করবার আগে আয়নায় অনেকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখে নিলো হৈমন্তী।

যথারীতি মাটিতে আসন পেতে খাবারের জায়গা করা হয়েছে। কিন্তু প্রচণ্ড গরম পড়েছে আজ। হৈমন্তী ভাবলো, হয়তো চৈতন্যবাবুর খেতে খুব কষ্ট হবে। হারাণকে হাত পাখা হাতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সে নিজে পরিবেশন করতে লাগলো।

চৈতন্যর খাওয়ায় বেশি মন ছিলো না। সে বারবার হৈমন্তীর দিকে তাকাচ্ছিলো। কী অপূর্ব দেখাচ্ছে তাকে! চৈতন্য হৈমন্তীকে দেখার ফাঁকে ফাঁকে যন্ত্রচালিতের মত খাচ্ছিলো, কিন্তু খাওয়ায় তার লক্ষ্য ছিলো না। সে বুঝতে পারছিলো না যে কি খাচ্ছে আর কতটা খাচ্ছে।

কৈলাস তার পাতের দিকে তাকিয়ে বলল, কিছুই খাচ্ছেন না যে? ওরে হারাণ, জোরে বাতাস কর! গরমে বোধ হয় আপনার খেতে খুব কষ্ট হচ্ছে চৈতন্যবাবু—

না না না, যতো ঘাম ঝরে ততো ভালো। মানে আপনাদের এখানে যা মুন খাচ্ছি তা এখানেই রেখে যাচ্ছি, গুণ না গাইলে দোষ দেবেন না কিন্তু। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—

হৈমন্তী চৈতন্যের কাছে এসে খুব আস্তে বললো, দয়া করে ভালো করে খান। গরমে অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে পারছি কিন্তু উপায় তো নেই। কাজেই সেকথা বারবার তুললে আপনিই লজ্জা পাবেন—

আপনি ব্যস্ত হবেন না মিসেস চৌধুরী, আই অ্যাম্ এন্‌জয়িং দি লাঞ্চ ভেরি মাচ্।

লাভলি মাগুর মাছ! আমি তো মিঃ চৌধুরীকে কিছু বলি নি, আপনারা কী করে জানলেন যে মাগুর ছাড়া অন্য মাছের ঝোল আমি খেতে পারি না?

নাকি? হৈমন্তীও মাগুর মাছ ছাড়া খেতে পারে না—

হৈমন্তী বাধা দিয়ে বললো, আঃ তুমি থামো।

কিন্তু, খাওয়া থামিয়ে হৈমন্তীর চোখের দিকে তাকিয়ে কৈলাস বললো, দিস ইজ নট ফেয়ার মিসেস চৌধুরী, আপনি আমাদের সংগে খেতে বসলেন না—

ব্যস্ত হবেন না, আমি পরে খাবো।

জানি। কিন্তু গরমে আপনার যে বড়ো কষ্ট হচ্ছে, বারবার রান্না ঘরে যাচ্ছেন আসছেন—চৈতন্যর চোখে হৈমন্তীর জন্যে গভীর দরদ ফুটে উঠলো।

না না, আমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না, আপনি দয়া করে খান, হৈমন্তী চৈতন্যের থালায় আরও কয়েক টুকরো মাগুর মাছ দিয়ে দিলো।

অপূর্ব রান্না হয়েছে, চৈতন্য বাঁ হাতের আঙুলে কান চুলকে বললো, আই উইস্ বার্ণাড শ কুড হ্যাভ সাম অব দিজ—তাহ'লে উনি আমিষ ছাড়া আর কিছু খেতে চাইতেন না—

সে কথায় কান না দিয়ে কৈলাস চিৎকার করে উঠলো, মিষ্টার গড়াইকে আরও ভাত দাও—

নানা গল্পের মধ্যে দিয়ে খাওয়া শেষ হ'তে সেদিন অনেক দেরি হলো।

ইফ ইউ ডোন্ট মাইণ্ড মিষ্টার চৌধুরী, কালো কালো দাঁত বের করে চৈতন্য বললো, আই অ্যাম ফিলিং স্লিপি, যা খাওয়া হয়েছে আজ, এই চেয়ারে একটু ঘুমিয়ে নেবো? জাষ্ট্ এ ন্যাপ্?

নিশ্চয়ই, কিন্তু আপনার ওখানে অসুবিধা হবে বরং ওঘরে খাটে গিয়ে ঘুমোন, আমি হৈমন্তীকে বলে দিচ্ছি—

ভ্যাট্‌স্ ফাইন্। তবে মিসেস্ চৌধুরীর হয়তো ওঘরে কাজ আছে, আমি বরং যাই—

হেঁ হেঁ, তা কি হয়, ঘুম যখন পেয়েছে বলছেন, কৈলাস বিছানা ঠিক করতে কয়েক মিনিটের জন্যে অন্য ঘরে গেল।

আসলে ঘুম পায় নি চৈতন্যের। প্রথম দিনই সে এদের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে যেতে চাইলো। তাই ভবিষ্যতে এরা যেন লৌকিকতার কোনো আবরণ না রাখতে পারে আজ তারই ব্যবস্থা ঘুমোতে চেয়ে করে গেল। ঘুম তার হলো না। সে চেষ্টাও করলো না। হৈমন্তী আর কৈলাসের সংগে চৈতন্য সারা ছুপুর নানা মজার গল্প করে কাটালো। ঠিক সন্ধ্যের আগে চা খেয়ে বাড়ি ফিরে এলো। হয়তো এতো তাড়াতাড়ি আসতো না কিন্তু সন্ধ্যেবেলা হেরম্ব দত্তর আসবার কথা আছে। নতুন গল্প নিয়ে কথা হবে। তাকে চৈতন্য চটাতে চায় না, কারণ তাহলে তার নিজের আর্থিক ক্ষতি হবে। যদি আজ তার বাড়িতে হেরম্ব বাবুর আসবার কথা না থাকতো, তাহলে স্থবিধা করতে পারলে চৈতন্য রাত বারোটার আগে ও বাড়ি ছেড়ে আসতো না। ঠিক আছে, এমন বাড়িতে যখন তখন কড়া নাড়তে তার কোনো অস্থবিধা নেই। দারোয়ান পথ আটকাবে না, বেয়ারা কার্ড চাইবে না, কিংবা ওপর থেকে কেউ চাকরের মুখে বলে পাঠাবে না, মেমসা'ব শোয়া হৈ। কুকুর গাঁক গাঁক করবে না। ধূর্ত স্বামী চশমার ফাঁক দিয়ে সন্দেহের দৃষ্টি হানবে না। এ বাড়িতে তার মত লোকের অবারিত দ্বার। সে এলে এরা ধন্য হয়ে যাবে, কোথায় বসতে দেবে ভেবে পাবে না। চৈতন্য মনে মনে হাসলো, কৈলাসের চেহারা কী করুণ মনে হয়! এদের জন্যে একটা কিছু করতেই হবে। হৈমন্তী একটা ভালো মানুষ স্বামীর সংগে এমন কষ্ট করে কিছুতেই বেশিদিন থাকতে পারে না। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

চৈতন্য উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আজ আসি। আই হ্যাড এ ভেরি নাইস টাইম ইনডীড্!

হৈমন্তী মৃদু হেসে বললো, এর মধ্যেই যাবেন?

তার দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে চৈতন্য উত্তর দিলো, আজ সত্যি একটা কথার মানে আমি বুঝলাম, টাইম ফ্লাইজ—কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না!

হেঁ হেঁ, আবার আসবেন কিন্তু।

আসবো বৈকি, সার্টেনলি আই উইল—আচ্ছা আজ আসি, চললাম মিসেস চৌধুরী, দুই হাত তুলে নমস্কার করে চৈতন্য বললো; গুড বাই!

সে বেরিয়ে যাবার পর স্বামি-স্ত্রী অনেকক্ষণ ধরে তার প্রশংসা করলো। কী সরল! অমন মানুষ হয় না। দেখলে কে বলবে ফিলিমের লোক। যেন কোনো বড়ো আপিসের বড়ো সাহেব। হৈমন্তী মনে মনে ভাবলো, আবার আসবে তো? খেয়ালী লোক! ঝড়ের মত এমনি করে কবে আসবে আবার?

কয়েক পা হেঁটে বাড়ি ফিরে চৈতন্য দেখলো হেরম্ব দত্ত বসে আছে। তখন সবে সন্ধ্যে হয়েছে। এবাড়ি ওবাড়ি থেকে শাখ বেজে উঠেছে। এমন কান পেতে এর আগে চৈতন্য কোনোদিন শঙ্খধ্বনি শোনে নি। আজ তার কাজের কথা ভাবতে ভালো লাগছে না। কোনো কাজে মন দিতে পারবে না সে। হেরম্বকে দেখে আজ তার খুব ভালো লাগলো। তার সংগে সে অসঙ্কোচে মনের কথা বলতে পারে। হেরম্ব ট্রাম বাস ট্যাক্সি বড়ো একটা চড়ে না। বহু পুরানো ওপেল্ গাড়ি আছে তার। ঝড়ঝড় করে সর্বত্র সে সেই গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

চৈতন্য আসতেই হেরম্ব ভাঙা গলায় বললো, কোথায় থাকো, কখন থেকে গরমে বসে আছি।

হাঃ হাঃ হাঃ, ইন্টারেষ্টিং খবর আছে হেরম্ব বাবু, আমি সোনার খনি আবিষ্কার করেছি।

তোমার খালি লম্বাই চওড়াই। যাকগে ওসব বাজে কথা, সেই গল্পটার সম্বন্ধে কি করলে?

আজ আর কাজের কথা থাক, চলুন আপনার গাড়িতে একটু ঘুরে আসি?

না বাপু, আমার শুধু শুধু তেল পোড়ালে চলে না। আজ পেট্রল কম আছে, আলিপুর যেতে হবে সাড়ে আটটার সময়—

হাঃ হাঃ হাঃ, চৈতন্য হেসে বললো, আই আণ্ডারষ্টেণ্ড ছাট ইওর রুট্স্ আর ডীপ্ ইন দি সয়েল্ অব আলিপুর—

কোথায় ডীপ্! হেরম্ব দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললো, যখনই যাই এক পাল লোক বসে থাকে। ঈগল কোম্পানীর বড়ো সাহেব, কার্কম্যান-মরিস্থানের ছোটো সাহেব, বুড়ো গোছের বাঙালী বড়ো অফিসার—

রূপ যৌবন থাকলে অমন ভিড় লেগেই থাকে। তা আপনার ভাবনা কি, টক্ টু হার অব মিলিয়ন্স্—
তোমার মত বকতে পারি না আমি। কাজ নেই, কর্ম নেই, দিনরাত ভেকর ভেকর—
আই লিভ অন মাই উইটস্, হাঃ হাঃ হাঃ—
যাক গে, সোনার খনির কথা কী বলছিলে?
হুঁ হুঁ, সেখানে অফিসারের ভিড়-টিড় নেই। একেবারে ফাঁকা বাড়ি, যখন খুশি আসবো যাবো, কেউ বাধা দেবার নেই।
হুস্ করে আবার দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো হেরম্ব, তোমার কপালে বাপু পর পর জুটেও যায়! তা এটি কে?
হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, ফিগার দেখলে, বুঝলেন হেরম্ব বাবু, আপনি আলিপুরে যাওয়া বন্ধ করে দিতে পারেন—
আরে কে বল না ছাই? ভোগাচ্ছ কেন বাপু? নাম শোনবার জন্তে অধৈর্য হয়ে হেরম্ব দত্ত উসখুস করতে লাগলো।
হৈমন্তী চৌধুরী—
সে আবার কে? এর নামতো কখনও শুনি নি—
এই কাছেই থাকে। গরিব গেরস্থ। স্বামীটা একটা ইডিয়ট—
ভালোই তো, তা না হ'লে আবার তম্বি করতো, তবে খুব সাবধান, গেরস্থ বউ নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করো না। ওরা বড়ো গোঁয়াড় হয়। এদিক ওদিক হলে মারধোর খাবার চান্স্—
হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, কাকে বলছেন হেরম্ব বাবু, নিজের বুক চাপড়ে চৈতন্ত বললো, ডোণ্ট ইউ নো দ্যাট আই অ্যাম্ এ প্রফেট? মেরেছো কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না? হাঃ হাঃ হাঃ—
তোমার ভাগ্য ভালো। ওই চেহারা নিয়ে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছো, হেরম্ব হেসে বললো, অথচ আমাকে ছেলেবেলায় পাঁচজন বলতো নাকি রাজকুমারের মত দেখতে, কিন্তু কি হলো? শুধু পেট্রোল পোড়ানো সার—
হোয়াই আর ইউ কনসিলিং ফ্যাকট্স্ হেরম্ব বাবু? হৈমবতী, শৈলবতী—এদের নিয়ে তো দিব্যি ছিলেন এককালে—

আহা ওরা তো ভদ্র নয়। আর ওসব হলো বাল্যলীলা। তখন যা খুশি করা যেতো। কিন্তু এখন পাঁচজন চেনে, একটা প্রেষ্টিজ আছে, এখন তো আর যেখানে সেখানে আগেকার মত ঘুর ঘুর করতে পারি না।
তা বটে, আর আপনি তো ওসব পাড়ার ষ্টক্ বাল্যকালে ক্লিয়ার করে দিয়েছেন, এখন ঘুর ঘুর করা মানে ওয়েষ্ট অব মানি—
চুপ চুপ, কী বল যা-তা, হেরম্ব ভীত চোখে পেছনে তাকিয়ে দেখে বললো, মেয়েদের জন্তে আর পয়সা খরচ করতে পারবো না। তাই অনেকদিন থেকে ভদ্রগোছের একটাকে খুঁজছি। বড়লোকের ডিভোর্স করা স্ত্রী হলেই ভালো হয়। মাঝে মাঝে খুশিমতো গাড়িতে নিয়ে বেরোলাম। আর ফিলিমে নামবার ইচ্ছে থাকলে তো সুবিধাই হয়, হেসে হেরম্ব বললো, কি বল চৈতন্য?
চৈতন্য বললো, গুড আইডিয়া। তবে, দে আর ফ্রাইটফুলি এক্সপেনসিভ। গাড়িতে নিয়ে চৌরঙ্গীর দিকে গেলেই বলবে, ফিলিং থার্ষ্টি। ব্যাস ঢোকো "এম্বেসিতে"। মাছের মত পান করে মশাই। তারপর সরে পড়ে।
তা পড়ুক। নজর উঁচু হলে একটু খরচ হয় বৈকি!
আপনার অনেক পয়সা। ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড—
কোথায় পয়সা। তুমি তো অনেক আঁটকে রেখেছো। এসময় কিছু পেলে বড়ো উপকার হতো। দেবে নাকি?
আই অ্যাম্ অন দি ষ্ট্রীট। মহাপ্রভুর কি পয়সা থাকে? হাঃ হাঃ হাঃ—
আমাকে লেকচার দিচ্ছো কিন্তু নিজের বেলায় কি? ওই তো নন্দীর স্ত্রীকে নিয়ে মাথায় তুলে নাচলে কিছুদিন। হ্যাঁ ভালো কথা, তার কি খবর?
নাম করবেন না আর—
ছি ছি ছি, কি হলো?
ওল্ড হ্যাগ একটা। আজ সকালে ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়ে বেঁচেছি। আই অ্যাম্ নট গোয়িং টু সি হার এগেইন—
তোমার কথা তো, আবার কাল ঠিক টেলিফোন করবে। অমন রসের ঝগড়া তোমার সংগে সব মেয়েদের হয়।
দেখে নেবেন এবার। নির্লজ্জ মেয়েমানুষ। হরিড! আবার একটা ওল্ড স্কাউণ্ড্রেল এসে জুটেছে—

তাই বল, হেরম্ব হাসলো, রাইভেল্ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে সরে পড়তে চাও ? মেয়েদের ওপর তোমার তো অরুচি হবার কথা নয়—

রাখুন মশাই। ওটা আবার মেয়েমানুষ নাকি ? ইউ ক্যান কল্ হার্ অ্যান্ ইউনাক্। সেদিন আমাকে নিয়ে গেল এক্সটেসি ক্লাবে। আমার পয়সার ওল্ডস্কচের পুরো বোতল সাবাড় করলো। তারপর কি করলো জানেন ?

কী ? জড়িয়ে ধরে নাচতে নাচতে শাড়ি খুলে ফেললো ?

আরে না, এক ঘর লোকের সামনে লাথি মেরে বললো, গেট আউট ইউ ব্লাডি ফিল্ম স্লোক্! দামী শার্কস্কীনের নতুন স্যুটের ওপর হড় হড় করে বমি করে দিলো। ক্যান ইউ বিলিভ ?

খুব বিলিভ করি বাবা। কিন্তু তাতে কি হয়েছে ? মেয়ে নিয়ে ঘুরলে ওদের কাছ থেকে অমন লাথিটা ঝাঁটাটা খেতে হয়।

বাট আই অ্যাম নট ইউজড টু ছাট।

পৃথিবী সুদ্ধ লোক ইউজড, তুমি না হলে তো হবে না।

হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, আজ সকালে আবার ফারপোয় ডেকেছিলো।

গিয়েছিলে ?

হ্যাঁ, সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এলাম। আই আস্কড্ হার নট টু ইনভাইট মি ইন ফিউচার—

তা হৈমন্তী তো জুটে গেছে, আর কি দরকার ?

একটু গম্ভীর হয়ে চৈতন্য বললে, এর বেলায় একটু সময় লাগবে। গরিব গেরস্থ বাড়ির বউ কি-না—

দেখতে কেমন ?

হার আইজ আর পার্লস্।

বেশ আছো। আর এর বেলায় তো খরচও নেই কিছু ?

কিচ্ছু না। অনাদি ক্যাবিনের ছ'আনা দামের মোগলাই পরটা খাওয়ালে ড্যাম গ্ল্যাড হয়ে যাবে—

তবে ওই স্বামীটা—

হ্যাঃ ব্লাডি ইডিয়ট, আই স্যাল ফিনিশ্ হিম সুন্।

জয় হোক তোমার। দেখালে বটে তুমি, রিষ্টওয়াচ দেখে হেরম্ব বললো, যাই একটু আলিপুরের দিকে--

উড ইউ মাইণ্ড গিভিং মি এ লিফট প্লিজ ?

কোথায় যাবে বাপু এই রাত্তিরে ? একটু ঘরে থাক না। মা বোন তো আছে, তাদের দেখাশোনা কর।

দেখলেই পয়সা চায়, কয়লা নেই, ঘুঁটে নেই, আই হেট সাচ্ এ মিড্ল ক্লাস হোম, চৈতন্য উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তার চেয়ে যতোক্ষণ পারা যায় বাইরে থাকা ভালো।

হুঁঃ ? আমার সংগে যাবে চলো, কিন্তু তোমাকে নিয়ে বেরোলেই তো বিপদ। এখানে দু' মিনিট ওখানে পাঁচমিনিট করে সেই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে গিয়ে নামো আর আমার শুধু শুধু পুরো এক গ্যালন্ পেট্রল খরচ হয়—

সব শোধ করে দেবো হেরম্ব বাবু, ডোণ্ট ওয়ারি !

আর দিয়েছো ! আচ্ছা যাও, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে এসো—

আই অ্যাম রেডি, জাষ্ট্ গোয়িং টু ওয়াশ, ঘরের বাইরে যেতে যেতে চৈতন্য হেসে বললো, আই থিঙ্ক আই নীড্ ইট।

সে বেরিয়ে যেতেই হেরম্ব অতি সন্তর্পণে পকেট থেকে গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেট বের করে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে ঘন ঘন টান দিতে লাগলো। চৈতন্য আসবার আগেই সিগ্রেট শেষ করতে হবে। ওর সামনে প্যাকেট বের করলে আর রক্ষে নেই। একটার পর একটা টেনে সব শেষ করে দেবে। শেষ করতে না পারলে ভুল করে সিগ্রেট দেশলাই নিজের পকেটে রেখে দেবে। আর ফেরত দেবে না। পরের সিগ্রেটকে নিজের মনে করতে চৈতন্যর জুড়ি মেলা ভার।

অল্পক্ষণের মধ্যে সে তৈরী হয়ে নিচে নেমে এলো। স্যুট বদলে এসেছে। সে আসতেই হেরম্ব উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলো। কোথায় যাচ্ছো এই রাত্তিরে এতো সেজেগুজে ?

হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীট—মিসেস বক্সি।

রাজী করাতে পারলে ?

আই হোপ্ সো। তবে এর তো আর বোকা স্বামী নয়। হি ইজ এ ভেরি হার্ড নাট টু ক্র্যাক্।

ঝড়ঝড়ে ওপেল গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়ে ক্লাচ ছাড়তে ছাড়তে হেরম্ব দত্ত বললো, মিষ্টার বক্সি কী বলে ?

বলবে আবার কী, বড়ো টাকার লোভ।
মাড়োয়ারী প্রডিউসাররা মাথাটি খেয়েছে।
যতোই করুক, শেষ অবধি পি. পি-তে আসতেই হবে।
হ্যাঁ, হেসে হেরম্ব বললো, তোমার পাল্লায় যখন পড়েছে, তা এবার একদিন আমার সংগে আলাপ করিয়ে দাও?
আর একটু জমিয়ে নি। তার চেয়ে চলুন একদিন হৈমন্তীর ওখানে।
না না, ওসব গরিব গেরস্থ আমার ভালো লাগে না—
বাট সী ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং—
যতোই হোক। ওই ভাঙা কাপ, অধময়লা শাড়ি—এসব দেখতে আর ভালো লাগে না। স্ল্যাক্‌স্ কিংবা চলির ব্লাউজের গ্ল্যামার—এসব দেখলে বড়ো আনন্দ হয়।
তা সেইজন্যে তো আলিপুরে চললেন?
বললুম না বড়ো ভিড়। অনেক সময় লাগবে।
স্টিক করে থাকুন। সবুরে মেওয়া ফলবেই।
অগত্যা, নিয়ম করে তো যাচ্ছি।
ছবিতে নামবার কথা কী বলে?
বলে, আর কয়েক মাস পর।
ওয়েট দেন্। আমাদের খপ্পরে একবার পড়লে আর কার বাবার ক্ষমতা ধারে কাছে ঘেঁষে। আপনি যে কথা বলতে পারেন না, আমি হলে এতোদিনে লাখ পঞ্চাশের স্বপ্ন দেখিয়ে বাজি মাৎ করতাম—
অনীতার এখন খুব বেশি টাকার দরকার নেই। স্বামীর সংগে মামলা করে জিতেছে। ডিভোর্স হয়ে গেল।
বাঁচা গেল। তবে সী ইজ লিভিং উইথ সামবডি—
না না, মেজর ঠক্করের বাড়িতে ভাড়া থাকে।
হাঃ হাঃ হাঃ, শনিবার রাত্তিরে মেজরকে বোধ হয় ইন কাইণ্ড ভাড়া দেয়—
না জেনেশুনে একজন ভদ্রমহিলার নামে যা তা বলো না, হেরম্ব রীতিমতো রেগে গিয়ে বললো, একেবারে বাজে কথা। মেজর ঠক্কর ওর স্বামীর বন্ধু ছিলো। তাই কলকাতায় এলে এখনও খোঁজখবর নেয়।

চৈতন্য দেখলো বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে। সংশোধন করবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললো, আই বেগ ইউর পার্ডেন। সিগ্রেট আছে?

না, সিগ্রেট খাওয়া একটু কমাও চৈতন্য, মারা পড়বে যে, এলগিন রোডের মোড়ে ট্রাফিক লাইটের জন্যে ব্রেক করে হেরম্ব বললো, খাটো বাবুর অনেকদিন দেখা নেই, কোথায় থাকে সে আজকাল?

মানে আমাদের সাউণ্ড রেকর্ডার?

হ্যাঁ হ্যাঁ, খাটো বোস। কোথায় গেল লোকটা?

কে জানে। লোকটা খালি মিঁউ মিঁউ করে—

তুমি তো ওর কাছ থেকেও মোটামুটি হাতিয়েছো শুনলাম?

মোটামুটি কোথায়, বারো শো টাকা মোটে। তেমনি মিসেস মীনা হালদারের সংগে সুবিধা করিয়ে দিয়েছি—

ওখানে খাটো বাবু সুবিধা করতে পারবে কি?

দূর দূর! হি সাফারস্ ফ্রম্ এ সর্ট অফ টেরিবল্ ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স, ইংরেজী জানে না কি না।

শিখিয়ে দিলেই তো পারো।

ওর কিচ্ছু হবে না। বার্নাড শ'র কমপ্লিট ওয়ার্কস্ দিয়ে বললাম, খাটো বাবু ভালো করে পড়ুন, ইংরেজী শিখে যাবেন। লোকটা কি করলো জানেন?

কি?

কয়েকদিন পর বইগুলো না পড়ে ফেরত দিয়ে বললো, পড়বার সময় কোথায়, সকালবেলা পাঁঠার সন্ধানে ঘুরতে হয়, দুপুরে স্টুডিও আর রাত্তিরে পাঁঠার জন্যে ঘাস কিনতে বার হই—

চোখ বড়ো করে হেরম্ব দত্ত বললো, পাঁঠা! কি বলছো হে চৈতন্য? খাটো বাবু পাঁঠা দিয়ে কি করবে?

ক্লেভার ফেলো। কসবায় মাংসের দোকান খুলেছে। বলে, তোমরা যা কাণ্ড আরম্ভ করেছো, কোন্ দিন চাকরি যায় ঠিক নেই, তাই আগে থেকে গুছিয়ে নিচ্ছি।

খু খু করে হেসে হেরম্ব দত্ত বললো, শব্দযন্ত্রীর পাঁঠার দোকান, হি হি হি—

তা হোক, ভাবছি ধারে সের খানেক মাংস নিয়ে কাল হৈমন্তীকে দিয়ে আসবো। সী ইজ ভেরি পুওর। খেয়ে বাঁচবে।

পাঁঠার মাংসের বদলে নাইস টাইম—

যা বলেছেন, হাঃ হাঃ হাঃ—

হঠাৎ বেশ গম্ভীর হয়ে হেরম্ব বললো, হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ করে আর বেশি দিন কাটানো চলবে না। বিজয় সেনের খবর রাখো ?

বি ড্যামন্‌ড্, আই উইস্ আই কুড্ হিট হিম উইথ মাই শ্যুজ! ক্ষিতীন ঘোষের থার্ড অ্যাসিস্‌টেন্টের লাফালাফি সহ্য হয় না।

কিন্তু এখন সে বাংলা দেশের এ ক্লাস ডিরেক্টার। সাবধান, প্রডিউসারের হট্ ফেভারিট হয়ে উঠছে দিনে দিনে। ওর নতুন ছবিতে কয়েকটা শট যা টেক করেছে, দেখলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে।

কী বলছেন হেরম্ব বাবু, আই নেভার ষ্ট্যাণ্ড উইথ মাই মাউথ অ্যাগেপ্। ড্যাম ইওর বিজয় সেনের নতুন ছবি। 'অপবাদ' কোম্পানীকে যা পয়সা দেবে দেখে নেবেন— ইউ ক্যানট ইমেজিন্। মাইনে দিয়ে দুঃস্থ সাহিত্যিক রেখেছি কি সাধে। লোকটা লেখে মন্দ না, আমার আইডিয়া ঠিক ধরতে পেরেছে। আপনি নিয়ে এলেন বিজয় সেন! ব্লাডি আপষ্টার্ট! একটা ছবি করেই ধরাকে সরা জ্ঞান করতে আরম্ভ করেছে। দেখা যাবে দৌড় কতোদূর। বার্ণাড শ'র 'এভরিবডিজ্ পলিটিক্যাল্ হোয়াট ইজ হোয়াট' থেকে প্যাসেজ নিয়ে 'অপবাদে' যা ডায়লগ্ সেট করছি, দাঁতে দাঁত চেপে চৈতন্য টেনে টেনে উচ্চারণ করলো, বিজয় সেন!

কিন্তু প্রডিউসার ওর কাজে খুব খুশী আছে। বলে, আমি চিরকাল ধরে এমনি ছবি করতে চাচ্ছি—

থামুন, পয়সা না পেলে ওসব কথা আর মুখ দিয়ে বেরোবে না। পরের ছবিটা ভকা হলে দেখবেন কি হয়।

কিন্তু যদি হিট হয় ?

আরে দূর, পাবলিক অতো বোকা নয় যে বারবার এক ধরনের ছবি নিয়ে হৈ হৈ করবে—এই যে দাঁড়ান দাঁড়ান—

লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে সশব্দে দরজা বন্ধ করে চৈতন্য বললে, কাল দেখা করবো, কখন ষ্টুডিওতে যাবেন ?

ঠিক দশটায়, দেরি করো না যেন।

না না—

আর আমাকে যতো তাড়াতাড়ি হয় এই বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেবার ব্যবস্থা করো, সব ঘাঁটিগুলো তুমি আগলে রাখলে চলবে কেন—

কিন্তু হেরম্ব বাবুর কথা শেষ হবার আগেই চৈতন্য গেটের ভেতরে চলে গেছে। হেরম্ব এবার নিশ্চিন্ত হয়ে আবার পকেট থেকে সিগ্রেট বের করলো। তারপর আলিপুরের দিকে গাড়ি চালিয়ে রওনা হলো।

●

হীরেন সান্যালের সেই ষ্টুডিবেকার গাড়ি চড়ে পরদিন দুপুর বেলা চৈতন্য হৈমন্তীর বাড়িতে এসে কড়া নাড়লো। একটা ফ্যান আর খাটো বাবুর দোকান থেকে একসের মাংস নিয়ে সে আজ এসেছে। কৈলাস তখন বাড়ি ছিলো না। হৈমন্তী দরজা খুলে চৈতন্যকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠলো।

আই অ্যাম্ ভেরি সরি মিসেস চৌধুরী, অসময়ে এসে পড়লাম, সাদা ঝকঝকে রুমালে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে চৈতন্য বললো, এ সময় না এলে আজ আর সময় করতে পারতাম না, এখুনি ষ্টুডিওতে বেরিয়ে যেতে হবে—

আপনি একেবারে ঘেমে গেছেন, ভেতরে আসুন, একটু বসে যান।

না আজ আর বসবো না, বরং যদি আপনাদের অসুবিধা না হয়, সন্ধ্যেবেলা আসবো।

হৈমন্তী মাথা নিচু করে বললো, আমাদের আবার অসুবিধা কী, আপনি যখন ইচ্ছে আসবেন।

থ্যাঙ্ক ইউ, আজ আমি আপনাদের জন্যে দু'টো জিনিস নিয়ে এসেছিলাম—

হৈমন্তী মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলো, কি জিনিস ?

আমার বন্ধু অনেক মাংস পাঠিয়েছে, তারই কিছুটা আপনাদের খাবার জন্যে, আর একটা ফ্যান—

ফ্যান আনলেন কেন ?

ওটা কৈলাস বাবুকে আমার সামান্য উপহার।

হৈমন্তী একটু কঠিন সুরে বললো, তাহলে তিনি এলেই দেবেন।

দু' এক মিনিট চুপ করে থেকে চৈতন্য বললো, আমাকে ভুল বুঝবেন না মিসেস চৌধুরী। আমি জানি আপনাদের সংগে আমার এমন বেশি ঘনিষ্ঠতা

হয় নি যার জন্যে আমি কোনো উপহার দিতে পারি। বন্ধুত্ব ভিক্ষে করে পাওয়া যায় না কিন্তু অনেক সময় তা ঝড়ের মতো আসে। কাল আপনারা আমাকে যে যত্ন করলেন তা'তে আমার মনে হলো আমি আপনাদের পরিবারের একজন। তাই ঋণ শোধ করবার জন্যে নয়, আরও বাড়াবো বলে আমি সামান্য উপহার নিয়ে এলাম। আপনারা যদি খুশী মনে তা গ্রহণ না করেন তাহ'লে আমি মর্মান্তিক বেদনা পাবো।

এবার হৈমন্তী না হেসে পারলো না। বললো, বেশ সুন্দর কথা বলতে পারেন তো আপনি।

জানি না। কিন্তু মাঝে মাঝে সবই সুন্দর করে তুলতে ইচ্ছে করে। শিল্পী নিয়ে আমাদের কারবার, তাই চোখে সকলকেই সুন্দর লাগে, চৈতন্য ইশারায় ড্রাইভারকে ফ্যান আর মাংস নামিয়ে দিতে বললো।

হৈমন্তী সেই মাংসের দিকে তাকিয়ে বললো, দয়া করে আজ রাত্তিরে আপনি আমাদের এখানে খাবেন।

ধন্যবাদ, কিন্তু আমার আসতে একটু দেরি হবে, ধরুন দশটা, খুব অসুবিধা হবে কি?

না না, ঠিক আসবেন কিন্তু।

চৈতন্য হেসে বললো, নিশ্চয়ই।

এমনি করেই আরম্ভ হলো। চৈতন্যর এ বাড়িতে আসবার কোনো সময় রইলো না। সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যা রাত্তির—যে কোনো সময় সে আসতে লাগলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে গল্প করতে লাগলো। এমন আশ্চর্য কথা শোনালো, এরা যা এর আগে জীবনে শোনে নি, যা আজও কল্পনা করতে পারে না। সম্পদের কতো অবিশ্বাস্য গল্প, ঐশ্বর্যের কতো বিচিত্র কাহিনী। কে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে রাজার মতো থাকে, কারা প্লেনে ঘন ঘন বিলেত যায়, কে মাসে মাসে গাড়ির মডেল বদলায়, কে রিজেন্টস্ পার্কে দশ বিঘে জমি কিনলো, কে আলিপুরে প্রাসাদের মতো বাড়ি করলো, কে ছেলেকে অক্সফোর্ডে পাঠালো, মেয়েকে সিমলায় রেখে এলো—চৈতন্য গড়াই-এর গল্প যেন ফুরোতে চায় না।

হেরম্ব বাবুও আজকাল মাঝে মাঝে আসে। হীরেন সান্যাল একদিন এসে আলাপ করে গেল। যাবার সময় বলে গেল, তার ষ্টুডিবেকার গাড়ি যেন এরা দরকার হলেই চায়। খাটো বাবু এসে জানিয়ে গেল, যখনই মাংস খাবার ইচ্ছা হবে, দয়া করে হারানকে দিয়ে শুধু এরা যেন একটা স্লিপ্ তার কাছে পাঠিয়ে দেয়। ডাক্তার মহিম উকিলও এলো একদিন। এদের বিশেষ বন্ধু। চিড়িয়াখানার কাছে তার বিরাট বাড়ি। বললো, আমরা থাকতে আপনাদের ভাবনা কি, আমার বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেউ থাকে না। সব ঘর খালি পইড়্যা থাকে। যখনই ওদিকে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হইবো দয়া কইর‍্যা পায়ের ধুলা দিবেন। ইচ্ছে হইলে যতোদিন খুশি আমার বাড়িতে থেকেও আসতে পারেন। রিজেন্টস পার্ক থেকে চৈতন্য মিষ্টার গুপ্তকেও একদিন ধরে নিয়ে এলো। বিলাত ফেরত এঞ্জিনীয়ার। চৈতন্য বেশ ভারীক্কি চালে জানিয়ে দিলো যে ভবিষ্যতে বাড়ি করবার দরকার হলে মিষ্টার গুপ্তকে বললেই হবে। ভালোবাসলে ও নাকি বিনা পয়সার বাড়ি তুলে দেয়। হৈমন্তী ম্লান হেসে বলেছিলো, আমাদের আবার বাড়ি! কথা শুনে চৈতন্যর মুখ হৈমন্তীর দুঃখে করুণ হয়ে উঠেছিলো। সে তার পিঠ চাপড়ে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলো, সব হবে। দারিদ্র্যের মধ্যে শুকিয়ে যাবার জন্যে হৈমন্তীর জন্ম হয় নি। রজনীগন্ধার মতো মাথা উঁচু করে তাকে বিতরণ করতে হবে সৌরভ।

উপহার আসতে লাগলো একটির পর একটি। ভালো টেবিল ক্লথ, কাঁটা চামচ ছুরি, স্কোয়াশের বোতল, ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি, ট্রে, টি-সেট, বিলিতি দোকানের দামী ক্রকারি, বাবলুর জন্যে সানস্যুট, খোকনের জন্যে বড়ো বড়ো টেডি, হৈমন্তীর জন্যে সান্‌গ্লাসেশ, প্যারাসোল আর কৈলাসের জন্যে ফাউনটেন পেন, আরও কত কী! কৈলাস নিজেকে ধন্য মনে করলো। ব্যাঙ্কে সারাক্ষণ বড়ো বাবুর তাড়া খায়। সেখানে কেউ তাকে মানুষ বলে ধরে না। অথচ এরা তো কত বড়ো লোক, কিন্তু সব সময় কী ভদ্র ব্যবহার তার সংগে করে, কী সম্ভ্রম করে কথা বলে! তাই তারা তার বাড়িতে বেড়াতে এলে সে বর্তে যায়, তাদের সংগে কথা বলতে বলতে নিজে মনে মনে অনেক ওপরে উঠে যায়। নিজেকে আর দিশি ব্যাঙ্কের সাধারণ কেরাণী বলে মনে হয় না। আপিসে বন্ধুবান্ধবের কাছে গর্বের সংগে তার নতুন বন্ধুদের গল্প

বলে আনন্দ পায়। কেউ তার কথা বিশ্বাস করে, কেউ করে না। কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে তাকে ওপেল কিংবা ষ্টুডিবেকার গাড়িতে আপিসে আসতে দেখে কেউ কেউ তাকে একটু বেশি খাতির করে।

শুধু আপিসে নয়, গাড়ি করে তারা নানা জায়গায় বেড়াতে যায়। ওদের সংগে হয় বোটানিক্সে বেড়িয়ে আসে, নয় জু গার্ডেনের কাছে ডাক্তার মহিম উকিলের বাড়িতে ছুটির দিনে সারা দুপুর গল্প করে কাটায়, কোনোদিন রিজেন্টস্ পার্কে মিষ্টার গুপ্তর বাড়ি ডিনার খেয়ে অনেক রাত্তিরে বাড়ি ফেরে। বড়ো বড়ো হোটেলেও ওরা মাঝে মাঝে খেতে যায়। চৈতন্য প্রায়ই তাদের বাইরে খাবার নেমন্তন্ন করে। এখন ওদের সংগে এতো বেশি আলাপ হয়ে গেছে যে কৈলাস না থাকলেও কিছু যায় আসে না, হৈমন্তী অসঙ্কোচে তাদের সংগে একা বেরিয়ে পড়ে। ষ্টুডিও ঘুরে দেখে, সেখানে অনেক নতুন ছেলেমেয়ের সংগে প্রচুর আগ্রহ নিয়ে আলাপ করে, আর রাত্তিরে যখন পাশে শুয়ে কৈলাস নাক ডাকে আর উত্তেজনায় তার ঘুম আসে না, তখন অনেকক্ষণ ধরে হৈমন্তী তাদেরই কথা ভাবে। পৃথিবীকে সহসা বড়ো সুন্দর মনে হয় তার। এমন একটা জগতের সন্ধান সে পেয়েছে যেখানে দুঃখ নেই, অর্থাভাব নেই, ভাবনাচিন্তার লেশমাত্র নেই। সে-জগতে যারা বাস করে, আনন্দ যেন শুধু তাদেরই জন্যে। তারা ছেঁড়া শাড়ি সেলাই করে পারে না, এক জুতো মুচিকে দিয়ে দশবার সারায় না, কেমন করে মাসের শেষে র‍্যাশন আসবে সে-ভাবনায় করুণ মুখে আট আনা চার আনার হিসেব করে সময় নষ্ট করে না। তারা বেঁচে আছে, মুহূর্তে মুহূর্তে তারা জীবনকে নিঙড়ে নতুন করে চেখে দেখছে। অভদ্র পাওনাদারের তাগাদায় তারা লজ্জায় মরে গিয়ে নিশ্চয় একবারও মনে মনে বলে না, ধরণী দ্বিধা হও। তাদের দেখে সুখ, তাদের সংগে কথা বলে সুখ, তাদের সংগে বেড়িয়ে সুখ। সংসারের চাকায় পিষে যাওয়া ক্ষয়ে যাওয়া ফুরিয়ে যাওয়া মেয়ে হৈমন্তীকে তারা যেন নতুন হয়ে ফুটে ওঠবার মন্ত্র শোনালো। সে আর ভাবনা করে না, এমন বন্ধু ভাগ্য ক'জনের হয়! এখন হৈমন্তীর আর ভয় কি। মাংস খাবার ইচ্ছে হলে খাটো বাবু, গাড়ি চড়বার ইচ্ছে হলে হেরম্ব দত্ত, অসুখ-বিসুখ হলে ডাক্তার মহিম উকিল, আর অন্য যা কিছু দরকার হোক, সবার ওপরে রয়েছে তাদের পরিবারের অতো বড়ো বন্ধু

চৈতন্য গড়াই। তার ভরসায় হৈমন্তীর বুকের জোর তিনগুণ বেড়ে যায়। দেবদূতের মতো সে যেন তাদের পরিবারে অপরূপ আলোর বন্যা নিয়ে এসেছে, চারপাশ ভরে তুলেছে বিচিত্র বর্ণচ্ছটায়, আনন্দের প্লাবনে মাতিয়ে দিয়েছে প্রত্যেককে। সার্থক তোমার নাম! চৈতন্য! হৈমন্তী আপনমনে বললো, এই ঘুণ ধরা কাদায় ধ্বসা সংসারের পচে যাওয়া মানুষগুলিকে তুমি বাঁচাও!

•

দেখতে দেখতে শীত এসে গেল। কয়েকদিনের মধ্যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়লো। এতো বেশি ঠাণ্ডা যে দুপুর বেলায়ও দেহ হিম হয়ে যায়। জামা কাপড় কারোর কিছু নেই। সংসারের প্রত্যেকের জন্যে কিছু না কিছু কিনতে হবে। তা না হলে চলবে না, বড়ো অসুখ করে যেতে পারে। কিন্তু টাকা কোথায়! অভাবের কথা মনে হ'লে আজকাল হৈমন্তীর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এমন করে জোড়াতালি দিয়ে কাঁহাতক সংসার চালানো যায়। তার কোথাও যেতে কেমন যেন লজ্জা করে, একটা দামী শাড়ি নেই, একটা ভালো ব্লাউজ নেই, তাদের দারিদ্র্যের বিকট চেহারা, অভাবের স্পর্শ যাদের কোথাও নেই, তাদের দেখাবে কেমন করে! পুরানো আলোয়ান নিয়ে সব সময় সব জায়গায় যাওয়া যায় না। কৈলাসকে দেখলে তার আরও বেশি লজ্জা হয়। দামী দামী গরম স্যুট পরে যখন চৈতন্য হেরম্ব আর আরও অনেকে তাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে তখন কৈলাস আদ্দির পাতলা পাঞ্জাবী কিংবা মোটা খাঁকি সার্ট পরে শীতে ঠক ঠক করে কাঁপে। তার জন্যে গরম কোট দরকার, হৈমন্তীর জন্যেও কোট কেনা না হলে সন্ধ্যেবেলা সে আর কোথাও বেরোতে পারবে না। সেদিন মিষ্টার গুপ্তর বাড়ি ডিনারে যাবার আগে চৈতন্য স্পষ্ট বললো, কোটটা সংগে নিয়ে নিন মিসেস চৌধুরী, ফিরতে রাত হবে, ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। হৈমন্তী তাড়াতাড়ি বললো, কোনো ভয় নেই, আমার শীত লাগে না। কোট যে নেই সেকথা চৈতন্যকে জানাতে তার কোথায় যেন বেধে গেল। এমনি অনেক কথা তাদের জানাতে তার বেধে যায়।

সংসারের খরচ আরও বেড়েছে। কৈলাসের সামান্য টাকায় কী হয়। নতুন বন্ধুরা তাদের জন্যে অনেক করে, অনেক উপহার দেয়, তাই তারা অনেক চা

করতে হয়। অনেক সময় শুধু চা দেয়া যায় না, সংগে অন্য কিছুও দিতে হয়। এটা এখন রোজকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই মাঝে মাঝে কৈলাস আর হৈমন্তী রাত্তিরে কম খেয়ে কিংবা ছেলেদের ফল একটু কমিয়ে দিয়ে খরচ পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করে। উপায় কি, এমন বন্ধুদের জন্যে ওই সামান্য খরচটুকু না করলে চলে না। সংসারে যতোই অভাব থাক, যারা তাদের বড়ো বন্ধু, তারা কাজের পর ক্লান্ত হয়ে এলে, মুখের সামনে কিছু না কিছু ধরে না দিলে চলবে কেমন করে। অথচ শুধু এই কারণে মাসের প্রথম সপ্তাহের পর অর্থের আরও অকুলান হয়।

একদিন শুকনো মুখে কৈলাস বললো, হৈমন্তী, তোমার কাছে কালকের খরচের মতো টাকা আছে তো?

গম্ভীর মুখে হৈমন্তী বললো, কোথা থেকে থাকবে? কি লাখ টাকা তুমি দাও আমাকে?

হেঁ হেঁ, আমার কাছে একটাও টাকা নেই। কাল কী হবে?

হৈমন্তী সত্যিই বিরক্ত হলো, আমি কি জানি, যেখান থেকে পারো যোগাড় করো, না হলে চলবে কেমন করে? আজ মোটে মাসের আট তারিখ—

তা হলে আমি বেরোই একবার?

যেখানে খুশি যাও!

সে-বছরে সে-রাত্রে বোধ হয় সব চেয়ে বেশি শীত পড়েছিলো। অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিলো, আর ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে যেন ধারালো তীর বিঁধিয়ে দিচ্ছিলো। শুধু লংক্লথের একটা পুরানো পাঞ্জাবী পরে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে কৈলাস বাড়ি থেকে বেরোতে বাধ্য হলো। তার জন্যে হৈমন্তীর মায়া হলো হঠাৎ। ইচ্ছে হলো ডেকে বলে, তুমি এই ঠাণ্ডায় বেরিও না, আমি যেমন করে পারি চালাবো। কিন্তু তবু সে কৈলাসকে ফিরে ডাকলো না। যাক, ঘুরুক ধার করতে, ভুগে মরুক—তার জন্যেই তো হৈমন্তীর এই অবস্থা। সারা জীবন ধরে সে শুধু কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে এলো।

কৈলাস বেরিয়ে যাবার কয়েক মিনিট পর ঘরে ঢুকলো চৈতন্য গড়াই। হৈমন্তী তখনও নিজেকে সামলে নিতে পারে নি। উত্তেজনায় তার সারা মুখ লাল হয়ে আছে, ফুটে উঠেছে বিরক্তির স্পষ্ট রেখা।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে চৈতন্য জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার? ইউ লুক ভেরি আপসেট।

তেমনি মুখে হৈমন্তী উত্তর দিলো, কিছু না, আপনি বসুন, চৈতন্যর দিকে একবার তাকিয়ে সে শুধু কোনো রকমে বললো, আমি আসছি, চোখের জল গোপন করবার জন্যে হৈমন্তী আড়ালে গেল। সে ফিরে এলো একটু পরে। আজ চৈতন্যকে তার আরও বেশি আপনার বলে মনে হলো। বৃষ্টি ঝরা শীতের কঠিন সন্ধ্যায় সে দামী গরম স্যুট পরে এসেছে। তাকে দেখে মনে হয় তার কাছে রয়েছে যেন অগাধ সম্পত্তির সিন্দুকের চাবি। হৈমন্তীকে সে কি তা দেবে না?

কি হয়েছে আপনার মিসেস চৌধুরী?

কিছু না, আপনি ভালো আছেন? এতো দেরি করলেন কেন?

কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। আপনার এমন চেহারা আমি কখনও দেখি নি, মনে হচ্ছে একটা সাংঘাতিক কিছু আপনার হয়েছে। আমাকে আপনারা বন্ধু বলে মনে করেন কিনা জানি না, আমি আপনাদের একেবারে আপনার বলে মনে করি। তাই আপনাদের সংগে আলাপের প্রথম দিন থেকে আমি লৌকিকতা না করে যখন তখন এসেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছি, জানি না আমার অজ্ঞাতে আপনাদের বিরক্ত করেছি কিনা—

না, কিছু বিরক্ত করেন নি, আপনাকেও আমরা আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে নিয়েছি!

তাই যদি হয় তাহলে অসঙ্কোচে বলুন আপনার কি হয়েছে?

চৈতন্যর মুখের দিকে তাকিয়ে হৈমন্তী কি যেন ভাবতে লাগলো। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, মাঝে মাঝে গায়ে এসে লাগছে ঠাণ্ডা হাওয়া, শরীর কেঁপে উঠছে বারবার। কৈলাস এই ঠাণ্ডায় কোথায় গেল, কে জানে। বাড়িতে একটাও টাকা নেই। কিছু যোগাড় করতে না পেরে সে যদি শূন্য হাতে ফেরে তাহ'লে কাল কী করবে হৈমন্তী। হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে চৈতন্য তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে যেন হৈমন্তীর জন্যে সমবেদনা উপচে পড়ছে।

বলুন মিসেস চৌধুরী, চৈতন্য আস্তে হৈমন্তীর একটা হাত ধরলো।

হৈমন্তী বাধা দিলো না। অসঙ্কোচে চৈতন্যকে জানিয়ে দিলো তাদের দারিদ্র্যের ইতিহাস, অভাব অনটনের মধ্যে কাটানো অনেক ভয়াবহ দিনের কথা। বলতে বলতে হৈমন্তীর গলার স্বর ক্লান্ত, ভারী, নীরস হয়ে উঠলো। তবু সে থামলো না। শুধু মাঝে মাঝে কয়েক মুহূর্তের জন্যে চৈতন্যর হাতের স্পর্শ নিবিড়ভাবে অনুভব করে তার শরীরে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চ লাগলো।

সমস্ত শুনে খুব জোরে হেসে উঠলো চৈতন্য, হাঃ হাঃ হাঃ, এর জন্যে আপনি এতো ভাবছেন ?

এতেদিন ভাবি নি, এখন না ভেবে পারছি না, কারণ ছেলেরা বড়ো হয়ে উঠেছে! নিজেদের জন্যে ব্যস্ত হই না, কিন্তু ওরা ? এতো অভাবের মধ্যে ওদের ভালো করে মানুষ করবো কেমন করে ?

কিচ্ছু ভাববেন না মিসেস চৌধুরী, চৈতন্য জোরে হৈমন্তীর হাত চেপে ধরে বললো, টাকার অভাব আপনার বেশিদিন থাকবে না। আপনি শুধু নিজে ধনী হবেন না, ধনীর বংশ সৃষ্টি করে যাবেন।

হৈমন্তী ম্লান হাস্‌লো, কী বলছেন আপনি চৈতন্য বাবু!

আমি যা বলছি আপনি ইচ্ছে করলে অক্ষরে অক্ষরে তা সত্যি হবে, সুযোগ বুঝে চৈতন্য বললো, অজস্র টাকা আপনার হবে, হাজার—লাখ—পাঁচ লাখ—দশ লাখ—পঞ্চাশ লাখ! শুধু টাকা নয় সংগে সংগে নামও হবে, সারা দেশ আপনাকে চিনবে। আপনি রাস্তায় বেরোলে আপনাকে দেখবার জন্যে ভিড় জমে যাবে। আপনার একটু হাসি ধরে রাখবার জন্যে ক্যামেরা ঘাড়ে ঝুলিয়ে কতো কাগজওয়ালার দল আপনার বাড়িতে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকবে—

আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না—

আর ভূমিকা না করে চৈতন্য ফস্ করে বলে ফেললো, আপনি ফিল্মে নামুন। শুধু আপনার জন্যে নয়, এই শিল্পের উন্নতি করবার জন্যে। আপনাকে পেয়ে আমরা ধন্য হবো, আর আপনার সব দুঃখ অবিলম্বে দূর হয়ে যাবে। এখন আপনি ভেবে দেখুন ?

বিস্ময়ে দিশা হারিয়ে চৈতন্যের হাতের তলা থেকে নিজের হাত অতি দ্রুত সরিয়ে নিয়ে হৈমন্তী টেনে টেনে উচ্চারণ করলো, আমি ফি—ল্—মে নামবো!

একটুও বিচলিত হলো না চৈতন্য, কেন নয় ?

না না না—

বলুন ? কেন নয় ?

দাদা কি বলবে ? বন্ধু আত্মীয় পাড়ার লোক—

হাঃ-হাঃ-হাঃ, অনেকক্ষণ ধরে চৈতন্য হাসলো। তারপর খপ্ করে আবার হৈমন্তীর হাত ধরে ছবির নায়কের মতো স্বরে সে বলে চললো, দাদা, বন্ধু, আত্মীয়, পাড়ার লোক ! হৈমন্তীর দিকে তাকিয়ে চৈতন্যর চোখ জ্বলে উঠলো, কে ভাবে আপনার কথা ? আপনার কষ্টের কথা মনে করে কার ঘুম হয় না ? হাড় ভাঙা শীতে যখন ঠক ঠক করে কাঁপেন, মা হ'য়ে ছেলেদের যখন দুধের অভাবে মিল্ক পাউডার খাইয়ে রাখেন, বাড়িওলা যখন ভাড়ার জন্যে চোখ রাঙিয়ে জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে দেবার কথা ব'লে ইতরের মতো শাসিয়ে যায়, নিজে প্রায় উপবাসী থেকে যখন ক্লান্ত শ্রান্ত অসুস্থ স্বামীকে ঝড় বাদলের রাত্তিরেও কালকের বাজারের টাকা ধার করবার জন্যে রাস্তায় ঠেলে দিতে বাধ্য হন তখন আপনাকে সাহায্য করতে কে এসে আপনার পাশে দাঁড়ায় মিসেস হৈমন্তী চৌধুরী ? বন্ধু ? আত্মীয় ? পাড়ার লোক ? বলুন ?

ম্লান ভাঙা স্তিমিত স্বরে হৈমন্তী বললো, আপনি—আপনি এসব কথা জানলেন কেমন ক'রে ?

হাঃ হাঃ হাঃ, আই ওয়াক উইথ মাই আইজ ওপেন্। আমি সব বুঝি, সব জানি। ভেবেছিলাম অন্তরঙ্গ বন্ধু মনে করে আপনি নিজেই অনেক আগে আমাকে এসব কথা বলবেন। কিন্তু এতোদিন হয়ে গেল এখনো কথা তোলা প্রয়োজন মনে করলেন না, এক মিনিট চুপ করে থেকে চৈতন্য গড়াই বললো, আপনারা হচ্ছেন সেই জাতের আদর্শ বাঙালী, যারা লাথি ঝাঁটা খেয়ে তিল তিল করে পচে মরে কিন্তু মুখ ফুটে প্রতিবাদ করে না, ভালো ভাবে বাঁচবার জন্যে জীবন পণ ক'রে বিদ্রোহ ক'রে দেখে না তাদের শক্তি কতোখানি !

করুণ স্বরে হৈমন্তী বললো, কিন্তু আমি কী করবো ? আমাকে আপনি এসব কথা বলছেন কেন ?

কারণ ইচ্ছে করলে আপনি একা আপনার সংসারের রূপ একেবারে পাল্টে দিতে পারেন, একটা সিগ্রেট ধরিয়ে চৈতন্য বলে গেল, বুঝতে পারেন না, আপনার

আমার ভালো মানুষ স্বামী দিনরাত কী অমানুষিক পরিশ্রম করেন? কিন্তু তার একার সাধ্য কতোটুকু? আপনি কি করেছেন তার মতো লোককে সাহায্য করবার জন্যে? কিছু না। শুধু সংসারের প্রয়োজন মেটাবার দাবি করেছেন, তিনি ব্যর্থ হলে অভিমান করেছেন কিংবা তাকে অক্ষম মনে করে তার ওপর অবিচার করেছেন। একবারও কি ভেবে দেখেছেন যে আপনার বুদ্ধি দিয়ে, প্রতিভা দিয়ে আপনি সহজেই অর্থ উপার্জন ক'রে সংসার অনেক স্বচ্ছল করতে পারেন?

হৈমন্তী উত্তর দিলো না। মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলো শুধু। একবার ভাবলো, কৈলাস ফিরতে এতো দেরি করছে কেন। তবে কি সে এখনও কালকের বাজারের টাকা যোগাড় করতে পারে নি!

চৈতন্য গড়াই বেশ জোরে জিজ্ঞেস করলো, আপনার বলবার কী আছে বলুন মিসেস চৌধুরী?

বলে দিন আমি কী করবো?

আপনার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে নিশ্চয়ই ইস্কুল মাষ্টারি করে, কী কোনো আপিসে কেরানীগিরি করে সময় নষ্ট করবেন না। সময় নষ্ট বলছি কারণ তা করে আপনার কিছু লাভ হবে না। খুব সামান্য টাকা আপনি রোজগার করবেন। আপনার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে। ছেলেমেয়েদের আপনি ভালো করে দেখাশোনা করতে পারবেন না, তাদের জন্যে বেশি মাইনে দিয়ে লোকও রাখতে পারবেন না, ফলে আপনার সংসারের খুব সুবিধা হবে না, সিগ্রেটে পরপর কয়েকটা টান দিয়ে চৈতন্য বললো, আপনার এমন একটা কিছু করা দরকার যা আপনাকে দেবে অনেক অর্থ, প্রচুর আরাম, বিপুল শান্তি। আপনি ছেলেদের জন্যে আয়া রাখবেন কিংবা তাদের বাইরে বিলিতি ইস্কুলে পাঠিয়ে দেবেন, নিজে গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াবেন, স্বামীকে যেখানে খুশি হাওয়া বদলের জন্যে পাঠাবেন, নিজে মাথা উঁচু করে সর্বত্র চলাফেরা করবেন। তাই শুধু আপনাদের কথা সর্বক্ষণ ভাবি বলে, আপনাদের পরিবারের মঙ্গল কামনা করি বলে আমি আপনাকে ফিল্মে নামবার কথা বলেছিলাম। কারণ তাহলে আপনাদের এই অভাব কিছুতেই থাকতে পারে না।

কিন্তু আমি কি অভিনয় করতে পারবো? যদি কিছু করতে না পারি তখন আপনিই লজ্জায় পড়বেন যে?

হাঃ হাঃ হাঃ, আপনি আমাকে হাসালেন মিসেস চৌধুরী, চৈতন্য গড়াই নড়ে চড়ে বসে বললো, এই লাইনে পনেরো বছরের অভিজ্ঞতা আমাকে আর কিছু শেখাক বা না শেখাক, কার অভিনয় করবার ক্ষমতা আছে তা বেশ ভালো ক'রে বুঝতে শিখিয়েছে। আর অভিনেত্রী নির্বাচনে আমার কখনও ভুল হয় না। আপনি মিনতির নাম শুনেছেন?

হ্যাঁ।

আমি তাকে প্রথম ছবিতে নামাই। আপনি নিশ্চয় বিশাখা বোসের অভিনয় দেখেছেন, তাকেও আমি প্রথম চান্স্ দিই—

কিন্তু আমার বেলায় যদি আপনার নির্বাচন ভুল হয়—যদি আপনার নাম খারাপ হয়?

তা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না, সেটা আমি বুঝবো, হৈমন্তীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবী স্বরে চৈতন্য জিজ্ঞেস করলো, বলুন? আপনি ছবিতে নামতে রাজী আছেন কি না?

চৈতন্যর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হৈমন্তীর চোখে স্বপ্নঘোর নেমে এলো। সে যেন তাকে যাদু করেছে, বশীকরণের মন্ত্র কানে দিয়ে রাত্রিদিন তাকে নতুন জগতে যাবার ব্যাকুল আহ্বান জানাচ্ছে। এ দারিদ্র্য ঘুচে যাবে, ম্লান মুখে ফুটবে উজ্জ্বল রেখা, টাকার ভাবনায় ঘুমহীন হবে না কোনো রাত। আবার যৌবন ফিরে আসবে, আবার ফুল ফুটবে শুকিয়ে আসা মালঞ্চে, বন্ধ হবে এই তিলে তিলে ক্ষয়। হৈমন্তীর ইচ্ছে হলো চৈতন্যর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, যতো শিগগির পারো আমাকে মুক্তি দাও, আমার হাত ধরে আমাকে তোমার বিপুল সুখের জগতে নিয়ে চলো, আমি আর পারছি না!

কিন্তু হৈমন্তী শুধু বললো, একটু ভেবে দেখি।

নিশ্চয়ই, ভেবে দেখবেন বৈকি, চৈতন্য কি ভেবে বললো, মিষ্টার চৌধুরী কী বলেন দেখুন—

তিনি আমার কোনো কাজে কখনও বাধা দেন না, তাঁর কথা আমি ভাবছি না—অমন অদ্ভুত ভালো লোক হয় না, আই হ্যাভ্ নেভার সীন্ সাচ্ এ নাইস্

ম্যান্, চৈতন্য অনেকক্ষণ হৈমন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলো। তারপর একসময় হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আজ আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে, আমাকে এবার যেতে হবে, যখন হয় আমাকে আপনাদের মতামত জানাবেন, আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো, যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে চৈতন্য আবার বললো, আমার 'মাই ডার্লিং' ছবিটা শিগগিরই শেষ হবে, তা'তে ঠিক আপনার মনের মতো একটা পার্ট আছে। কাজেই মতামত দিতে বেশি দেরি করবেন না। আর খুব বেশি লোকের সংগে পরামর্শ করবার দরকার নেই। জানেন তো, সত্যিকার ভালো খুব কম লোকে চায়। অনেক টাকা পাবার সম্ভাবনা আছে জেনে তারা আপনাকে ঈর্ষা করবে, আজে-বাজে নানা কথা ব'লে দমিয়ে দিতে চাইবে, চৈতন্য হাসলো, কিন্তু আমি জানি, ইউ আর্ এ ওমেন্ অফ কলোসাল্ পারসোন্যালিটি। কারো কথায় পিছিয়ে আসার মেয়ে আপনি নন!

হৈমন্তী আর একবার হেসে জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু পারবো তো?

হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, হৈমন্তীর কাছে এগিয়ে এসে বেশ জোরে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে চৈতন্য বললো, আজকের তারিখ মনে রাখবেন, আপনাদের বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমি একটা আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী করে যাচ্ছি, আপনি যদি ছবিতে নামেন তাহ'লে তার প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে, চৈতন্য ধরাবার আগে দেশলাই-এর ওপর টক টক করে কয়েকবার সিগ্রেট ঠুকে দৃঢ়স্বরে বললো, চিত্র-তারকার আকাশে আপনি উল্কাগির মতো আত্মপ্রকাশ করবেন। আবির্ভাবের সংগে সংগে ফিল্মওয়ার্ল্ড আপনাকে নিয়ে ক্ষেপে উঠবে, মেতে উঠবে, ঘরে ঘরে আপনি আশ্চর্য সাড়া জাগিয়ে তুলবেন। প্রডিউসাররা হৈমন্তী চৌধুরী ছাড়া আর কারোর নাম মুখে আনতে চাইবে না। ইউ আর আনপ্যারাল্ল্ড্! যে কোনো ভূমিকায় অভিনয় করুন না কেন, ছবির পর্দায় আপনি সাপ খেলিয়ে দেবেন মিসেস চৌধুরী—সাপ খেলিয়ে দেবেন!

অব্যক্ত উত্তেজনায় হৈমন্তীর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছিলো।

পরদিন কিসের একটা ছুটি ছিলো। অনেকক্ষণ আগে চৈতন্যর ঘুম ভেঙেছিলো কিন্তু সে বিছানা ছাড়তে পারছিলো না, মধুর আলস্যে চোখ বুজে শুয়ে ছিলো।

সকাল সাড়ে সাতটা হবে তখন। ভাইপো এসে জানালো, কৈলাস বাবু দেখা করতে এসেছেন।

কথা শুনে চৈতন্য ধড়ফড় ক'রে উঠে বসলো, কে? কৈলাস বাবু। ভালো করে বসতে বলেছিস তো? যা বলগে আমি এখুনি যাচ্ছি। আর শিগগির ঠাকুরকে বল নিচে দু'কাপ চা পাঠিয়ে দিতে, মাকে বল টোষ্ট আর অমলেট করতে। যা যা শিগগির—খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে চৈতন্য তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলো। কৈলাস এতো সকালে আজ কেন এসেছে সেকথা বুঝতে পেরে খুশীতে তার মন ভরে গেল।

চৈতন্যকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে কৈলাস বললো, হেঁ হেঁ আপনাকে ডেকেছে—

কে, মিসেস চৌধুরী?

হেঁ হেঁ—

আজ সন্ধ্যেবেলা নিশ্চয়ই আমি যাবো।

সন্ধ্যেবেলা গেলে হবে না, এখুনি যেতে হবে। আমাকে বলেছে আপনাকে সংগে করে নিয়ে যেতে, হেঁ হেঁ—

বেশ আমি এখুনি আপনার সংগে যাচ্ছি। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো? চৈতন্য কৃত্রিম কৌতূহল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

হেঁ হেঁ, সে ফিলিম করবে।

গুড্, এই তো বুদ্ধিমতী মেয়ের মতো কথা!

আমিও কাল রাত্তিরে তাই বললাম। হৈমন্তীর অনেক গুণ জানেন মিষ্টার গড়াই, আমি তো ওর জন্যে কিছুই করতে পারলাম না, আপনি দয়া করে ওর জন্যে যা পারেন করুন। আপনার ক্ষমতা কতো, আপনিই পারবেন!

আমাকে কিছু বলতে হবে না মিষ্টার চৌধুরী, আমিই ওকে কাল ছবিতে নামবার কথা বললাম। আত্মীয়দের কথা ভেবে উনি ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু আজকাল তো সকলেই নামছে, কত বড়ো লোকের মেয়ে, বউ। আমরাই সকলকে নিতে পারি না—এতো বেশি ভিড়।

সেই সকালে কৈলাসের সংগে এসে হৈমন্তীর কাছ থেকে চৈতন্য পাকা কথা নিয়ে

গেল আর সেই সন্ধ্যায় চার হাজার চারশো টাকার চেক হৈমন্তীর হাতে দিয়ে বললো, 'মাই ডার্লিং' বাংলা ছবিতে আপনি হিরোইনের বোনের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। আপনার সমস্ত পারিশ্রমিক আপনাকে আগাম দেয়া হলো। এই যে চার হাজার চারশো টাকার চেক—

হৈমন্তীর চেতনা বোধ হয় এখুনি লুপ্ত হয়ে যাবে। এতো আনন্দ সে রাখবে কোথায়! চার হাজার চারশো টাকা! সারা জীবনেও তারা কি এতো টাকা জমাতে পারতো!

সে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চৈতন্যর দিকে তাকিয়ে বললো, ছবিতে না নেমেই এতো টাকা—

হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, তাহলে ভেবে দেখুন, নামলে আরও কতো বেশি রোজগার করবেন। বুধবার থেকে আপনার স্যুটিং আরম্ভ। ঠিক এগারটার সময় তৈরী থাকবেন। প্রথমদিন ষ্টুডিওর গাড়িতে আমি আপনাকে সংগে করে নিয়ে যাবো। কাল সব কাগজে খবর বেরিয়ে যাবে—

কিন্তু আপনারা তো আমাকে পরীক্ষা করে দেখলেন না, অভিনয় করতে পারব কিনা?

হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, আপনার বেলায় নো অডিশন্ ইজ নেসেশারি। হেরম্ব বাবু আপনাকে দেখে গেছেন, আমি রেকমেণ্ড্ করে দিয়েছি। আবার কে পরীক্ষা করবে? আমার কথা শুনেই প্রডিউসার খুশী হয়ে চেক লিখে দিলো।

আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার নেই মিষ্টার গড়াই!

হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—

পরদিন সত্যি কাগজে কাগজে হৈমন্তীর নাম প্রকাশিত হলো। শুধু নাম নয় তার সম্পর্কে আরও অনেক কথা ছাপা হলো। গৃহস্থ বাড়ির বিদুষী বউ, ছেলেবেলা থেকে নাকি অভিনয়ে তীব্র আকর্ষণ। সমস্ত শক্তি দিয়ে চিত্র জগতকে উন্নত করবার জন্যে তিনি প্রিমিয়ার পিকচার্সে যোগদান করলেন। খবর পড়তে পড়তে হৈমন্তীর যেন নেশা লাগলো। সে একবার পড়লো, দু'বার পড়লো। তবু তার আশা মিটলো না। সে নানা কাগজে বারবার একই খবর পড়তে লাগলো। তবে কি সত্যি তার নাম হবে? তবে কি সত্যি তার টাকা হবে? তবে কি সত্যি তাকে দেখবার জন্যে হাজার হাজার

লোক ভিড় করবে! চৈতন্য গড়াই-এর কথা মিথ্যা হবার নয়। হৈমন্তী শুধু শিগগির পাঁচজনের একজন হয়ে উঠবে।

কিন্তু সে হলো পরের কথা। কাগজে তার অভিনয় করবার খবর বেরোবার সংগে সংগে চতুর্দিকে কঠিন সমালোচনা হলো তাকে নিয়ে। আত্মীয় বন্ধুরা ছি ছি করলো কৈলাসকে বারবার সতর্ক করে বললো, স্ত্রীকে দিয়ে ব্যবসা করাতে তোমার লজ্জা করে না? ভদ্র বাড়ির বউ রূপ যৌবন দেখিয়ে পয়সা করবে? এ তুমি কী করলে কৈলাস!

আপিসেও কৈলাসকে বিদ্রূপ সহ্য করতে হলো। এতোদিন পর ছা-পোষা কেরাণী বন্ধুর দল তার গাড়ি চড়ে অপিসের আসবার আসল কারণ খুঁজে পেলো। কৈলাস কিন্তু নির্বিকার। সে কাউকে কিছু বলে না, শুধু হেঁ হেঁ করে চুপ করে থাকে। তার হৈমন্তীর নাম হবে, তার প্রতিভার কথা লোকের মুখে মুখে ফিরবে—বিয়ের দিন থেকে আজ অবধি কৈলাস তো তাই চেয়েছিলো।

বাড়িতে এসে সকলের চেয়ে বেশি অভদ্র ব্যবহার করে গেল হৈমন্তীর দাদা অনুপম। কৈলাসকে অনুরোধ করলো এসব বন্ধ করে দিতে। কিন্তু সে রাজী হলো না দেখে যা খুশি তাই বলে তাকে অপমান করলো আর জানিয়ে গেল, এবার থেকে সে মনে করবে হৈমন্তী মরে গেছে। অন্য বোনদের বিয়ে দিতে হবে বলে সে নিজে বিয়ে করে নি, শুধু নিজের স্বার্থের কথা ভেবে হৈমন্তী এখন যদি এই কাণ্ড করে তাহলে তার মতো অবস্থার লোক কেমন ক'রে তাদের বিয়ে দেবে! ফিল্মে নামা মেয়ের বোনকে তাদের সমাজের কোনো ভালো পাত্র বিয়ে করতে চাইবে না। হৈমন্তী তখন সবে চার হাজার চারশো টাকার চেক ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছে। তার রক্ত গরম। সেও বেশ কঠিন কণ্ঠে অনুপমকে বললো যে, টাকায় সব হয়। হৈমন্তীর ছবিতে নামবার জন্যে সত্যি যদি উমা উষা হাসির বিয়ে না হয়, তাহলে সে লাখ টাকা খরচ করে বোনদের বিয়ে দেবে। কথা শুনে অনুপম আরও রেগে গিয়ে বললো, হৈমন্তীর পাপের পয়সা নিয়ে বিয়ে করবার আগে তার বোনরা যেন মরে যায়।

উমা উষা হাসি কিন্তু এ ঘটনার পর লুকিয়ে একদিন হৈমন্তীর সংগে দেখা করে গেল। তাকে উৎসাহ দিয়ে বললো, বেশ করছিস দিদি, তুই বেঁচে যাবি।

আধপেটা খেয়ে আমরা তো বেঁচে মরে আছি। দাঁড়া না, তু নাম একটুই কর, তারপর তোকে ধরে আমরাও নেমে পড়বো।

নামবি বৈকি, চৈতন্য বাবু ইচ্ছে করলে যাকে খুশি ছবিতে একেবারে হিরোইন করে নামাতে পারে, ফিলিম লাইনে অতো ক্ষমতা আর কারোর নেই, বুঝলি ?

হ্যাঁ, খুব খাতির না হলে এতো তাড়াতাড়ি কি তোর সব ব্যবস্থা এমন করে করে দিতে পারতো !

তোদেরও ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু খবরদার, দাদার তালে নেচে গোবেচারা গোছের গরিবকে কিছুতেই বিয়ে করিস না—

মাথা খারাপ, তা' কি করি ! তোর অবস্থা দেখে শিক্ষা হয়ে গেছে।

হৈমন্তী একটু গম্ভীর হয়ে বললো, তবে তোর জামাইবাবু খুব ভালো লোক। বদ লোক হলে কি আর আমাকে ছবিতে নামতে দিতো ! অনেকে আছে না, খেতে পরতে দিতে পারে না অথচ তম্বি করে—

উষা বললো, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে জামাইবাবুর মতো লোক হয় না, তোর কথায় ওঠে বসে।

চৈতন্য তাদের ছবিতে নামবার কথা হৈমন্তীর কাছ থেকে শুনে বললো, বেশ বেশ, এক্ষুনি সব ঠিক করে দেবো। কচি বয়সের অমন সব সুন্দরী মেয়েরা ছবিতে না নামলে কি ভালো ছবি করা যায় ! ওরা নামলে আমি ওদের জন্যে নতুন বই লেখাবো, নাম দেবো, 'থ্রী সিষ্টারস্ ইন ব্লু'—মাথায় একটা আইডিয়া আছে অনেক দিন থেকে।

কিন্তু সেই শেষ। বোধহয় অনুপমের কঠিন আদেশ অমান্য করে উমা উষা হাসি আর এ বাড়িতে আসবার সুযোগ করতে পারে নি।

•

হৈমন্তীর প্রথম রোজগার ! কে ভেবেছিলো তার মতো মেয়ে এক কথায় এত টাকা উপার্জন করতে পারে ! এ টাকা নিয়ে সে করবে কি ! এমন কতোবার পাবে, আরও পাবে, বারবার পাবে। হৈমন্তী ঠিক করলো, নিজের হাতে একশো রকম রান্না করে চৈতন্যকে খাওয়াবে। আর কাউকে নয়, শুধু চৈতন্য গড়াইকে—যে তার মূল্য বুঝলো, নিজেকে চিনতে শেখালো, তার সব দুঃখ

ঘোচাবার প্রাণপণ চেষ্টা করলো। কেন তার সংগে হৈমন্তীর আরও অনেক আগে আলাপ হলো না।

বেশিদিন দেরি করলো না সে। এক রবিবারে চৈতন্যকে নেমন্তন্ন করলো। সেদিন সে অনেকক্ষণ ধরে ঘর সাজালো, অনেক সময় নিয়ে রান্না করলো, সন্ধ্যেবেলা প্রাণভরে নিজে সাজলো। যদি চারপাশ থেকে রাজ্যের লজ্জা এসে তাকে না ঘিরে ধরতো, যদি এতোদিনের সংস্কার তার মনে সংকোচ না জাগিয়ে দিতো, তাহলে আজ সে গড় হয়ে চৈতন্যকে ভক্তিভরে প্রণাম করতো। কিন্তু এতো লজ্জা কেন! এতো ভয় কেন! এমন সঙ্কোচ কেন! হৈমন্তীর ইচ্ছে হলো মুহূর্তে মনের এই ছোটোখাটো বাধা প্রাণপণ শক্তিতে চুরমার করে দেয়।

খাবার পর ওরা তিনজন বাইরের ঘরে বসে গল্প করতে লাগলো। আজ তেমন শীত নেই। হঠাৎ বসন্তের হাওয়া দিয়েছে। শুক্ল পক্ষ। আকাশে অনেক তারা ফুটেছে।

অনুপমের সংগে গোলমালের কথা হৈমন্তী কিছুতেই ভুলতে পারছিলো না। তার এতো আনন্দের মাঝে সে চিন্তা থেকে থেকে কাঁটার মতো খচ্‌খচ্‌ করে উঠছিলো। খাবার সময় এই নিয়ে ওরা তিনজনে আলোচনা করেছিলো। সে আলোচনার জের টেনে চৈতন্য বললো, শিল্পী হতে হলে অনেক কিছু ছাড়তে হয় মিসেস চৌধুরী, এ হলো কতকটা সন্ন্যাসের মতো। আমাকে দেখুন, আজ অবধি বিয়ে করবার সময় পেলাম না।

কি-ই বা এমন বয়স হয়েছে আপনার, এখনও অনেক সময় আছে।

না বোধ হয়, রিচিং ফরটি। আর সময় কোথায়। নিজেও এখন এতো ব্যস্ত যে অন্য কোনো দিকে মন দেবার ইচ্ছেও নেই—

তারপর চৈতন্য গড়াই আরম্ভ করলো তার অতীতের নানা গল্প। কবে কে তার জন্যে পাগল হয়েছিলো, কোন্‌ অমলেশ সুন্দরী তাকে পাবে না বলে ফিলিম ছেড়ে চলে গেল। মিনতি যেদিন বুঝলো, কাজ ছাড়া চৈতন্য কিছু জানে না, তার কয়েক দিন পর এক অভিনেতাকে বিয়ে করে বসলো। বিশাখার অবস্থাও ঠিক তাই হয়েছিলো।

অনেক চেষ্টা করে একদিন সে বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো যে, কোন মেয়ের ওপর কোনোদিন চৈতন্যর সামান্য দুর্বলতা হবে না। অগত্যা সেও যাকে হাতের

সামনে পেলো তাকে বিয়ে করলো। আজও চৈতন্য কাজ ছাড়া কিছু জানে না।
মনে প্রাণে সে আদর্শ পুরুষ।
কাজেই সে কাজ ছাড়া আর কি করতে পারে!
হাই তুলতে তুলতে কৈলাস বললো, কবে আমি হৈমন্তীকে সেকথা বলেছি!
হেঁ হেঁ, আপনার মতো লোক হয়! চরিত্র ভালো না হলে আপনার কথায় চার হাজার চারশো টাকা কোম্পানী বের করে, পরপর কয়েকটা হাই তুলে সে বললো, হেঁ হেঁ, আপনারা গল্প করুন যতোক্ষণ ইচ্ছে, আমার বড়ো ঘুম পাচ্ছে। আজ অনেকবার বাজারে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে কি-না—
তুমি যাও না ঘুমোতে, হৈমন্তী হেসে বললো, তোমাকে বড়ো ক্লান্ত দেখাচ্ছে।
হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও উঠি, অনেক রাত্তির হলো—
ব্যস্ত হয়ে হৈমন্তী বললো, কিছু রাত হয় নি। আমার একেবারেই ঘুম পায় নি যে, একটু চুপ করে থেকে সে বললো, আজ সারা রাত বসে গল্প করলে হয় না?
হেঁ হেঁ, তা বেশ হয়, আমার আবার আজকেই ঘুম পেলো, তা তোমরা দু'জন বসে গল্প কর, আমি ঘুমোতে যাই হেঁ হেঁ, তুড়ি দিতে দিতে হাই তুলে কৈলাস পাশের ঘরে চলে গেল।
চৈতন্য চীৎকার করে বললো, আপনি থাকলে কিন্তু গল্প আরও বেশি জমতো মিষ্টার চৌধুরী—
আর মিষ্টার চৌধুরী! কৈলাস তখন কোনোরকমে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে বালিস আঁকড়ে ধরে পাশ ফিরেছে।
কৈলাস চলে যাবার পর হৈমন্তী কিংবা চৈতন্য কেউই অনেকক্ষণ কথা বললো না। চৈতন্য একটু বিস্মিত হয়েছে। সে ভাবতে পারে নি, হৈমন্তী তাকে সহসা এমনি করে রাত্রিরে থাকতে বলবে।
তখন অনেক রাত। বারোটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। বাড়ির সামনে একটি দীর্ঘ পুরানো বকুল গাছ। হাওয়ায় মাঝে মাঝে পাতার শির শির শব্দ আসছে। আর কোনো শব্দ নেই। সামনে পা ছড়িয়ে সোফার পেছনে দুই হাত মেলে দিয়ে চোখ বন্ধ করে চৈতন্য বসেছিলো। আলোটা কি জানি কেন আজ চোখে বড়ো বেশি লাগছে। আলো নিভিয়ে দিলে অনেক ভালো লাগতো যেন।

সে এদের কথাই ভাবছিলো। এদের সে বাঁচাতে চলেছে। একটা চুরমার হয়ে যাওয়া পরিবারকে মন্ত্র-বলে যেন আবার নতুন করে তৈরী করতে যাচ্ছে। এ বাড়ির সব কিছুই তো তার। এই সোফা, ওই আলো, আলমারী, ড্রেসিং টেবল, পর্দা, বই। আর হৈমন্তী? না না, তার কথা ভাবতে আজ ভয় লাগছে চৈতন্যর। কোনোদিনও সে তাকে জানতে দেবে না, কাউকে বলবে না। হৈমন্তী কথা তুললেও অস্বীকার করবে, তাকে কথা বাড়াতে দেবে না। কৈলাস তাকে আজ যেমন শ্রদ্ধা করে চিরকাল তেমনি করবে। বাবলু খোকন যখন বড়ো হয়ে উঠবে তারাও মা বাবার মুখে বারবার শুনবে, চিতু কাকুর মতো লোক হয় না। তাকে রাজা বলে মনে করবে, মানুষ বলে শ্রদ্ধা করবে, চরিত্রবান বলে পায়ের ধূলো মাথায় নেবে। যতোদিন বেঁচে থাকবে ততোদিন এ বাড়িতে চৈতন্য আসবে যাবে কিন্তু কোনোদিনও একটি প্রাণীও জানতে পারবে না যে এ বাড়ির গৃহিনীর জন্যে কী গভীর প্রেমের অনির্বাণ শিখা রাত্রিদিন তার মনের নিভৃততম কোণ অবধি সৃষ্টির সূক্ষ্ম অনুপ্রেরণায় তাকে মাতাল করে রাখে! এই হীন নীচ পঙ্কিল পার্থিব জগত থেকে তাকে ক্ষণে ক্ষণে অসীমের সন্ধান দেয়। সেকথা কেউ কোনোদিন জানবে না—হৈমন্তীও নয়। এতো বিশ্বাস চৈতন্যকে আর কেউ করে নি, তার ওপর এতোখানি নির্ভর করে নি কেউ। সে হবে এই পরিবারের নিশ্চিন্ত নির্ভর। সে অক্ষুণ্ণ রাখবে এদের বিশ্বাস।

হৈমন্তী কথা বললো, তুমি—আপনি—দিশা হারিয়ে সে থেমে গেল।

কি বলবে বল হৈমন্তী, থেমে গেলে কেন?

এতোক্ষণ চুপ করে কি ভাবছো তুমি?

তোমাদের কথা—

আমাদের কথা তুমি কেন এতো ভাবো? কেন এতো করো আমাদের জন্যে? বলতে পারো, আমরা তোমাকে কী দিয়েছি? কি করেছি তোমার জন্যে?

তা জানি না হৈমন্তী, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চৈতন্য বললো, তোমরা আমাকে কী বন্ধনে বেঁধেছো, বলতে পারি না। আমার জন্যে হয়তো কিছুই করো নি, দেয়া-নেয়ার চুলচেরা হিসেব নিকেশ করতে আমি কোনোদিন এ বাড়িতে আসি নি—আসবোও না, একটু থামলো চৈতন্য, কিন্তু তোমরা আমাকে এমন কিছু

দিয়েছো যা' প্রাইসলেস্, ম্যাগনিফিসেন্ট অ্যাণ্ড এভারলাষ্টিং। ইউ হ্যাভ্ গিভ্ন্ মি জয়—ইটারনেল্ জয়্!

তুমি মহৎ তাই একথা বলছো। আমরা অতি দীন। তোমাকে অপরিসীম আনন্দ দেবো কেমন করে!

চৈতন্য উত্তর দিলো না। আবার চুপ করে বসে রইলো। হৈমন্তী তার কাছে সরে এসে একটা হাত কোলের ওপর তুলে নিয়ে বললো, তুমি আমাদের অনেক দিয়েছো। অন্ধকার গুহা থেকে আমাদের আলোর সমুদ্রে এনে ফেলেছো। এতো দিয়েছো যে আমাদের রাখবার জায়গা নেই, হৃদয় কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

তুমি আশ্চর্য মেয়ে হৈমন্তী! তোমার তুলনা মেলে না। আমি জীবনে অনেককে অনেক কিছু দেবার চেষ্টা করেছি কিন্তু একটি মানুষও তোমার মতো বিরাট মন নিয়ে তা গ্রহণ করতে পারে নি। আমাকে তারা শুধু ছোটো করে এনেছে, ব্যাপক পরিধির ইঙ্গিত দিতে পারে নি।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে হৈমন্তী জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু তুমি যা চাও তা দেবার সাধ্য কি আমার আছে?

আছে। আমি মনে প্রাণে সেকথা বিশ্বাস করি।

না না, আমাকে অতো বড়ো করে তুমি দেখো না। আমি যে সর্বস্ব উজাড় করে তোমাকে দিতে পারবো না—কিছুতেই না। এই সারা দিনরাতের অকাল বৈধব্য আমি সহ্য করবো কেমন করে!

বৈধব্য নয় হৈমন্তী, বল নতুন উপলব্ধি। জীবনে কোথাও যা পাই নি, তোমার মধ্যে আমি তাই পেয়েছি। আমার মনের যতো ক্ষয় ক্ষতি পাপ পরাজয়, তোমার চোখের জ্যোতিতে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমার মনের নিভৃত প্রদেশে আমি যেন এক সোনার খনি খুঁজে পেয়েছি। সুপ্ত তন্ত্রীতে তুমি যে নিপুণ ঝঙ্কার তুলেছো তা' আর কোনোদিনও থামবে না—থামতে পারে না।

আমার মনের জটিল কথাগুলো তুমি এমন সহজ করে বলছো কেমন করে?

তুমি যে আমাকে সহজ মানুষ করে তুলেছো, হৈমন্তী। আমার সব জটিলতা তোমার আলোর আবরণে মুহূর্তে ঢেকে দিয়েছো।

এমন করে তুমি আর বলো না। আমি খুশী ধরে রাখতে পারছি না। দেখছো না আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এলো, চেতনা লুপ্ত হয়ে এলো—আমি কী করবো!

আমার মনের মধ্যে আমি যে মহামানবকে আবিষ্কার করেছি, সমস্ত শক্তি দিয়ে সারাক্ষণ নিজের সংগে সংগ্রাম করে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। কিছুতেই আমার মন থেকে সে যেন মিলিয়ে না যায়। তোমার জন্মে আমাকে কোনোদিনও যেন নিজের কাছে ছোটো হতে না হয়। আমার মান সম্ভ্রম, আমার সুনাম দুর্নাম, আমার সমস্ত কিছু আমি আজ তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেলাম হৈমন্তী—বল তুমি এই কঠিন দায়িত্ব নিতে রাজী আছো?

তুমি পুরুষ, তুমি আমার মতো করে মালা গাঁথবার সময় পাবে না। কিন্তু আমি সারা জীবন ধরে নিজেকে ঠকাবো কেমন করে। সে যে বড়ো কষ্ট। যে আমার ঘুম ভাঙালো, চোখ মেলে আমি যদি তাকে কোনদিনও না দেখতে পাই তাহলে আমার বেঁচে থেকে কি লাভ?

না-ই বা দেখতে পেলে তাকে। জেগে ওঠার আনন্দে আমার সব দুঃখ যেমন ক'রে ঘুচে গেল, তোমার জ্বালা ঠিক তেমনি করেই একদিন জুড়িয়ে যাবে হৈমন্তী। নিজেকে যে খুঁজে পেয়েছি, তাই তো অনেক পাওয়া, তাই তো পরম লাভ। যার জন্যে নিজেকে পেলাম, হোক না সে দূরের মানুষ, সে তো রইলো আমার রক্তের মধ্যে মিশে।

হৈমন্তী কয়েক মুহূর্ত চৈতন্যের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো। তারপর ভারী কান্নায় তার কোলের ওপর ভেঙে পড়ে বললো, আমি পারবো না, এ বৈধব্য সহ্য করতে পারবো না—কিছুতেই না—

ছিঃ হৈমন্তী, আজকের দিনে এমন করে কাঁদতে নেই, চৈতন্য তার মাথায় গভীর স্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, কান্না দিয়ে শুরু করলে, কান্না দিয়ে যে শেষ করতে হবে, একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললো, হাসো, গান গাও, আজ শুধু আনন্দ কর।

চৈতন্যর কথা শুনে হৈমন্তী জলভরা চোখে মাথা তুলে অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময় তার বড়ো

বেশি লজ্জা হলো। আস্তে আস্তে উঠে সে সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিয়ে আবার তার পাশে সেই সোফায় এসে বসলো।

মৃদুস্বরে হৈমন্তী যেন চৈতন্যকে কানে কানে জিজ্ঞেস করলো, গান গাইতে বললে নাকি তুমি আমায় ?

চৈতন্য ধীর স্বরে উত্তর দিলো, আজ যে গান গাইবার দিন হৈমন্তী।

বল তুমি কী গান শুনতে চাও ?

আমি কিছু বলবো না। আজ নিজের খুশিতে চলবার দিন। যে গান খুশি তুমি গাও হৈমন্তী।

হাল্কা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরে। রাত শেষ হয়ে এলো। এখন কোন্ ঋতু ? টুপটাপ বকুল ঝরে কি বাইরে ? শব্দ আসে না কিন্তু মন প্রাণ দিয়ে ঝরা বকুলের সৌরভ অনুভব করা যায়। প্রকাশের অসহ উত্তেজনায় হৈমন্তীর প্রতি রোমকূপ কেঁপে উঠলো। এতো তীব্র অনুভূতি কোথায় ছিল এতোদিন !

হঠাৎ কখন অবুশ হয়ে এলো তার দেহ আর প্রদীপ জ্বলে উঠলো দুই চোখে। মিলিয়ে যাক, ফুরিয়ে যাক, এই মুহূর্তে একেবারে নিঃশেষে শেষ হয়ে যাক তার সারা দেহ মন প্রাণ ! শুধু বকুলের পাতায় পাতায়, রাত্রির বিপুল সৌরভে আর জ্যোৎস্নার মাদকতায় মিশে থাক তার চৈতন্যের এই শেষ প্রহর।

স্যুটিং

টালিগঞ্জের দিকে একটা সুন্দর দোতলা গোটা বাড়ি পাওয়া গেল। হৈমন্তী যা ভেবেছিলো, ভাড়া তার চেয়ে একটু বেশি—আড়াই শো টাকা। তা হোক, একটু বেশি ভাড়া হলে কিছু যায় আসে না। বরং টালিগঞ্জে বাড়ি পেয়ে হৈমন্তী খুশী হলো। এইদিকেই এখন তার থাকা দরকার কারণ তার কর্মক্ষেত্র হলো টালিগঞ্জ। শুধু তাই নয়, এদিকে থাকলে, এই শিল্পের আরও অনেকের সংগে পরিচয়ের সুবিধা হয়, ষ্টুডিও থেকে ফেরবার পথে পাঁচজন তার বাড়িতে আসতে পারে, পাঁচটা নতুন কনট্রাক্টের খবর পাওয়া যেতে পারে, ষ্টুডিওর কাছাকাছি থাকলে ঠিক এই সময় অর্থাৎ তার উঠতির সময় অনেক রকম সুবিধা হবে।

নতুন বাড়িতে এসে হৈমন্তী মনের মতো করে ঘর সাজালো। নতুন ফার্নিচার কিনলো, দামী কার্পেট পাতলো, ঘরের রঙের সংগে মিলিয়ে সুন্দর পর্দা টাঙালো। ঠিক করলো, রেফ্রিজারেটার আর অ্যালসেশান কুকুর শিগগিরই কিনে ফেলবে। 'মাই ডার্লিং'-এ পাওয়া টাকা আগেই ফুরিয়ে গিয়েছিলো। আর এখন যে ছবিতে সে কাজ করছে তার জন্যে আগাম পাওয়া টাকা ঘর সাজাতেই ফুরিয়ে গেল। টাকার কথা হৈমন্তী একেবারে ভাবে না আজকাল, টাকা তো এখন লাখে লাখে আসবে। নিজের জন্যে একটি মোটর গাড়ি হৈমন্তীর সব চেয়ে আগে দরকার।

গাড়ি কিনতে হৈমন্তীর আর খুব বেশি দেরি হবে না। আর একটি ছবির পুরো টাকা পেলেই সে মোটর কিনে ফেলবে। রেফ্রিজারেটার আর কুকুরও সেই টাকাতেই হয়ে যাবে। সংসারে কিছুই ছিলো না, বাইরের আর পাঁচজনের সংগে আলাপ হবার পর হৈমন্তী চোখে অবহেলা নিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবে, কৈলাস তার জন্যে শুধু ধার করেছে, আর কিছু না। কিন্তু তা করুক, কত বড়োলোকও তো ধার করে। আর ভবিষ্যতে তা যদি করতেই হয় তাহ'লে কৈলাসই করবে, হৈমন্তী নয়।

যে ছবিতে এখন সে কাজ করছে তা থেকে আরও হাজার দু'য়েক টাকা পাবে। ওরা এত ভদ্রলোক যে গায়ে পড়ে টাকা চাইতে তার লজ্জা করে। শুধু ভদ্র নয়, ফিল্ম লাইনের প্রত্যেকটি লোক রীতিমতো বড়োলোক। তাই হৈমন্তী তাদের কাছে চেয়ে নিজেকে ছোটো করতে চায় না। তাদের সংগে মিশে মিশে তার নিজেকে তাদেরই একজন বলে মনে হয়। সংসারে এখনও অভাব থাকলেও সে কোনোদিন মুখ ফুটে তাদের সেকথা জানাতে পারবে না। সময় হলে তারা আপনি চেক পাঠিয়ে দেবে। নিজেকে ধনী মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে দিন কাটাতে বড়ো ভালো লাগে হৈমন্তীর।

হৈমন্তীকে দেখলে এখন আর চিনতে পারা যাবে না। এর মধ্যে সে অনেক দেখেছে, অনেক জেনেছে, অনেক বুঝেছে। সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে যে অর্থই সকল সুখের মূল। হলুদ লাগা কাপড় পরে রান্নাঘরে সময় কাটানো সে-হৈমন্তী আর নেই। আজকাল তাকে পাঁচজন চেনে, তার কাছে এসে লোকে চাকরির জন্যে ঘন্টার পর ঘন্টা সাধাসাধি করে। কারোর একথা জানতে বাকী নেই যে চৈতন্য গড়াই আর হেরম্ব দত্ত হৈমন্তীকে খুব বেশি ভালোবাসে, তার সব কথা শোনে, তার বাড়িতে এসে অনেকক্ষণ বসে থাকে, স্যুটিংএর দেরি থাকলে বিছানায় একটু গড়িয়ে নেয়। এ পাড়ায় বাড়ি নিয়ে সুবিধা হয়েছে বৈকি হৈমন্তীর। সময়ে-অসময়ে তার কাছে লোক আসে। হয় ষ্টুডিওতে যাবার সময়, নয় সেখান থেকে ফেরবার সময়। এমন দিন যায় না যেদিন হেরম্ব আর চৈতন্য হৈমন্তীর বাড়িতে আসে না। এই নিয়ে ফিল্মের পাঁচজন আড়ালে নানাকথা বলাবলি করতে আরম্ভ করেছে। মাঝে মাঝে কিছু কথা হৈমন্তীর কানে আসে। কিন্তু সে রাগে না, খুশী হয়। তার মধ্যে কিছু না থাকলে অত বড়ো পরিচালকরা তার বাড়িতে নিয়ম করে আসবেই বা কেন। লোকে তো তার জন্যে তাকে হিংসে করবেই। এ লাইনে যখনই কেউ কাউকে হিংসে করে তখনই বুঝে নিতে হয় যে নতুন এসে সে অন্যদের অসুবিধা ঘটাচ্ছে, দর্শকের প্রিয় হয়ে অন্যদের অন্নে ভাগ বসাচ্ছে। হৈমন্তীকে এসব কথা অবশ্য চৈতন্য গড়াই বুঝিয়েছে। আর হেরম্ব দত্ত মাথা নেড়ে নিঃশব্দে সায় দিয়ে গেছে।

এই অল্প সময়ের মধ্যে সব দিক দিয়ে হৈমন্তী বদলে গেছে। দেহে মাংস

লেগেছে তার, চেহারায় নতুন দীপ্তি এসেছে, ভাষা অন্যরকম হয়ে গেছে। কৈলাস তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে, আমার স্ত্রী কী সুন্দর! আর হৈমন্তীকে যখন সে তার রূপের প্রশংসা করে কিছু বলতে যায়, তখন হৈমন্তী তাকে তাড়া দিয়ে থামিয়ে দেয়, চুপ কর। আমার সামনে ওসব বাজে কথা আর কখনও বলবে না।

হেঁ হেঁ হেঁ, আরও কিছু হয়তো কৈলাসের বলবার ইচ্ছে করে কিন্তু স্ত্রীর ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে সে থেমে যায়।

কৈলাসকে আজকাল একেবারেই সহ্য করতে পারে না হৈমন্তী। তাকে চোখের সামনে দেখলেই তার গা ঘিন ঘিন করে ওঠে আর সারা মন বিরক্তিতে ভ'রে যায়। কিন্তু হৈমন্তী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। লোকের সামনে কৈলাসকে সে সামান্য অসম্মান করে না। বরং বারবার নানা কথা বলে সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে স্বামীর সংগে তার খুব বেশি ভাব। তার ভয় হয়, পাছে লোকে বলে যে ফিলিমে নেমে সে স্বামীকে অবহেলা করছে। একে তো তার দাদা অনুপম তার নামে দু'কথা বলবার জন্যে মুখ উঁচিয়ে বসে আছে, এখন একটা ছুতো পেলে আর রক্ষা থাকবে না। দরকারের সময় কেউ এক পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে না অথচ সামান্য খুঁত পেলে দশজন এগিয়ে আসবে সমালোচনা করতে। হৈমন্তী সকলকে চিনে নিয়েছে। তবু সে খুব সাবধান হয়ে চলে, তার নিজের জন্যে নয়, তার বাড়িতে ফিলিমের যে অতি ভদ্রলোকেরা দয়া করে আসে তাদের জন্যে। হৈমন্তীর জন্যে তাদের সামান্য দুর্নাম হয় তা সে কিছুতেই চায় না। তবে লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে সে তো আর নিজের কোনোরকম ক্ষতি করতে পারে না। অত বোকা মেয়ে হৈমন্তী নয়। সে জানে, তার সম্বন্ধে আত্মীয়রা এর মধ্যেই নানা কথা বলতে আরম্ভ করেছে। তার বাড়িতে নাকি রাজ্যের নাম করা দুশ্চরিত্র লোকের আনাগোনা শুরু হয়েছে আর হৈমন্তী তাদের সংগে গলা ধরাধরি করে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাউকে ভয় করে না হৈমন্তী, অত রেখে ঢেকে সে কাজ করে না। একশো বার সে তাদের বাড়িতে আসতে বলবে, তাদের সংগে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াবে। তারা কি যা-তা লোক নাকি। হৈমন্তীর বহু ভাগ্য যে তারা তাকে একান্ত আপনার বলে মনে করতে পেরেছে। কত হাজার মেয়ে তাদের

সংগে ঘোরবার জন্যে, তাদের সংগে আন্তরিকতা করবার জন্যে তীর্থের কাকের মত বসে আছে। তাদের গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, হাজার তিনেক টাকার ওপর মাইনে পাওয়া স্বামী আছে। তবু কেন তারা এদের জন্যে ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করে, বারবার ফোনে খবর নেয়, ঘন ঘন নেমতন্ন করে! শুধু এদের সংগে ঘনিষ্ঠতা করে ছবিতে নামবার জন্যে। কে নাম চায় না, কে অর্থ চায় না, কে চায় না নিজের উপার্জনে সংসারের চাকা একেবারে ঘুরিয়ে দিতে! সকলেই নিজের ব্যক্তিত্ব জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করতে চায়।

হৈমন্তীর প্রায় সংগে সংগে যারা ফিলিমে নেমেছে কিংবা নামবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে তারা কেউই তার মত দরিদ্র নয়। তার স্বামীর মতো অক্ষম লোকের সংগে তাদের ঘর করতে হয় না। তাদের অনেক আছে, তাদের তুলনায় হৈমন্তীর কিছুই নেই। তবু আজ সে তাদের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গেছে, অনেক বেশি প্রিয় হয়ে উঠেছে। এ কি কম গর্বের কথা!

অম্বর বক্সির স্ত্রীর কথাই ধরা যাক না কেন। তুলতুলকে কী সুন্দর দেখতে! গাড়ি ছাড়া এক পাও চলে না। অম্বর বক্সির তিন তিনটে গাড়ি। অত বড়ো ব্যারিষ্টারের সংগে বন্ধুত্ব করতে সকলেই চায়। মহাশ্বেতা নাম নিয়ে অভিনয় করে তুলতুল দর্শক সাধারণের কাছে এর মধ্যেই বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু অমন স্বামী হৈমন্তীর নেই, এখনও গাড়িও হয় নি তার, তবুও মাত্র একটি ছবিতে ছোট সাধারণ ভূমিকায় অভিনয় করে হৈমন্তী তুলতুলকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিভার দাম সকলেই দেয়।

শোনা যাচ্ছে, 'অপবাদ' ছবিতে নাকি তুলতুল নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবে। হৈমন্তীর সেটা করবার কথা ছিলো কিন্তু ওই ছবিতে সব চেয়ে শক্ত ভূমিকা হচ্ছে নায়িকার বান্ধবীর। কলেজে পড়া কুমারী মেয়ে। চৈতন্য তাকে বুঝিয়েছে যে ওই চরিত্রটি হৈমন্তীর জন্যে বিশেষভাবে লেখা। নায়িকার দশ বছর বিয়ে হয়েছে। বিবাহিতা মেয়ের চেয়ে কুমারী মেয়ের ভূমিকায় হৈমন্তী অনেক ভালো করবে, তাই তাকে দেয়া হয়েছে নায়িকার বান্ধবীর পার্ট। ভারি খুশী হৈমন্তী। চৈতন্য তুলতুল বক্সির চেয়ে তার কথা অনেক বেশি করে ভাবে। অথচ তার কিছুই নেই। একই ছবিতে তুলতুলের সংগে অভিনয় করবার সুযোগ হলো জেনে হৈমন্তীর খুব আনন্দ

ছলো। এমনি প্রতিযোগিতা সে চায়, কিছুতেই ভয়ে পিছিয়ে পড়ে না। 'অপবাদ' মুক্তি পাবার পর দেখা যাবে লোকে কার অভিনয় ভালো বলে—তার না তুলতুলের।

তারপর অনীতা মিত্রের কথা মনে হয় হৈমন্তীর। হেরম্ব বাবু বলেছে, সেও নাকি শিগগির ছবিতে নামবে। দিল্লীর বড়ো অফিসারের স্ত্রী অনীতা। তার স্বামী সরকারের কোনো বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি। কিন্তু হলে হবে কি, অনীতা স্বামীর সংগে ঘর করতে পারলো না। হেরম্ব বাবু আরও বলেছে, অনীতার স্বামী কমলাক্ষ মিত্র নাকি লোক ভালো নয়। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে তার আর একটা স্ত্রী আছে। অনীতা খুব ভালো মেয়ে। চরিত্রহীন স্বামী বলে সে তাকে ডিভোর্স করে চলে এসেছে।

অনীতার সংগে এখনও হৈমন্তীর আলাপ হয় নি। হেরম্ব বাবু তাকে ছ'একবার আলিপুরে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইলেও সে ইচ্ছে করে যায় নি। সব চেয়ে আগে সে প্রস্তুত হয়ে নিতে চায়। কৃপার পাত্রী হয়ে তাকে সমাজে অনেকদিন বাস করতে হয়েছে, কিন্তু দিন ফুরিয়েছে দারিদ্র্যের। এবার সে যেখানে যাবে সেখানে মাথা তুলে নিজের পরিচয় দেবে, তেমনি করে সাজ-পোশাক করবে। কেরাণীর বউ হয়ে আর কোনোদিনও কোথাও সে যাবে না। কৃপা সইতে পারে না হৈমন্তী। নামুক অনীতা মিত্র ফিলিমে। দেখা যাবে ডেপুটি সেক্রেটারির স্ত্রী না হয়েও কর্মক্ষেত্রে হৈমন্তী অনীতার চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে কি-না।

আর একজন বাঙালী মেয়ে বম্বেতে বেশ নাম করেছে। তার নাম মীনা হালদার! মীনাকে হৈমন্তী একদিন ষ্টুডিওতে দেখেছিলো। তাকে দেখে হৈমন্তীর চোখে ধাঁধা লেগে গিয়েছিলো। রোগা লম্বা ফর্সা চেহারা, চলির-ব্লাউজ আর জর্জেটের থান পরে তাকে কী অপূর্ব দেখাচ্ছিলো। মীনাকেও এরা সকলেই ভালোবাসে। কিন্তু সে সব সময় বড়ো ব্যস্ত। বেশির ভাগ ইংরেজ বন্ধু তার। মাত্র একদিন পি. পি. ষ্টুডিওতে এসেছিলো, কিন্তু সংগে ছিলো চার পাঁচজন ইংরেজ ছেলে মেয়ে। মীনা এত সুন্দর ইংরেজী বলে যে চোখ বন্ধ করে শুনলে মনে হয় যেন কোনো ইংরেজ মেয়ে বলছে। বলবেই বা না কেন, কত বড়ো লোকের স্ত্রী। ওর স্বামী শরৎ হালদার হেনরি উইলিয়ামস অ্যাণ্ড

কোম্পানী লিমিটেডের ডিরেক্টার-পার্টনার। আহা, হৈমন্তীর যদি অমন স্বামী হতো! কিন্তু মীনারও স্বামী ভাগ্য ভালো নয়। শুধু তো নাম করা বড়োলোক স্বামী হলে হয় না, মনের মানুষ হওয়া চাই। শরৎ হালদার নাকি অত্যন্ত খিটখিটে লোক, মীনাকে দু' চারদিন মারতে উঠেছে। মীনা চুপ করে এসব অন্যায় অত্যাচার সহ্য করবে কেন, স্বামীকে নানা কথা বুঝিয়ে কায়দা করে তারই এক বন্ধুর সংগে বম্বে গিয়ে ছবিতে নামে। শরৎ হালদারের বন্ধু শিবেন বটব্যাল ওই রকম আর এক বড়ো কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। কাণাঘুসো শোনা যাচ্ছে, এক্সটেসি ক্লাব থেকে অনেক রাত্তিরে মীনা আর শিবেন টলতে টলতে গাড়িতে ওঠে, তারপর ওরা দু'জনে কোথাও একসংগে থেকে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দেয়। শরৎ হালদার জানে সব। কুকুরের চাবুকের দু' এক ঘা মীনার পিঠেও মাঝে মাঝে বসায়। কিন্তু কিছুই করতে পারে না। করবে আবার কি, আজকাল মীনাও তার ভ্যানিটি ব্যাগের লম্বা স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে স্বামীর মুখে সপাং সপাং বসিয়ে দেয়। এসব কথা বাইরের সকলে জানে। হৈমন্তী ভাবে যে অমন সুন্দর যার চেহারা তার গায়ে হাত তুলতে যে স্বামীর দ্বিধা হয় না, সে নিঃসন্দেহে অতি বড়ো পাষণ্ড।

যাহোক, এই মীনা হালদার প্রিমিয়ার পিকচার্সে কাজ করবে। বম্বেতে তার সংগে খাটো বাবুর আলাপ হয়। একদিন সুযোগ পেয়ে খাটো বাবু মীনাকে পি. পি-তে যোগ দেবার প্রস্তাব জানায়। মীনা মধুর হেসে তার ঘাড়ে আস্তে হাত রেখে বলেছিলো, ইট ইজ সো নাইস্ অব ইউ—

সেদিন খাটো বাবু আর কথা বাড়ায় নি। ইংরেজী বলবার ভয়ে সরে পড়ে। কলকাতায় ফিরে চৈতন্যকে নিয়ে এক রবিবার সকালে সটান চৌরঙ্গী টেরেসে গিয়ে ওঠে। ব্যাস বাজী মাৎ। পণ্ডিতকে সকলে শ্রদ্ধা করে। হৈমন্তীর মনে হয় পি. পি-তে চৈতন্য একমাত্র লেখাপড়া জানা লোক। সে মীনা হালদারের বাড়ি গিয়ে কফির কাপে চুমুক মারতে মারতে বার্ণাড শ'র 'ম্যান এণ্ড সুপারম্যান' থেকে লাইন মুখস্ত বলে এমন এক বক্তৃতা দেয় যে মীনা হালদার বিস্ময়ে তার গায়ে ঢলে পড়ে আর কি, ইউ আর ওয়াণ্ডারফুল্ মিস্টার গড়াই—ইউ আর ওয়াণ্ডারফুল! উড ইউ মাইণ্ড হ্যাভিং অ্যানাদার কাপ অব কফি প্লিজ?

নট অ্যাট অল্, থ্যাঙ্ক ইউ মিসেস হালদার, চৈতন্য দাঁতে সিগ্রেট চেপে ধরে নাকি বলেছিলো, এ রিয়েল আর্টিষ্ট, ম্যানে 'ম্যান এণ্ড সুপার ম্যানে'শ' যেমন বলেছেন, যারা যথার্থ শিল্পী, তারা শুধু সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কিছুতে মন দিতে পারে না। স্ত্রী উপোস করে, ছেলে মেয়েরা খালি পায়ে ঘুরে বেড়ায় তবু শিল্পী কাজ বন্ধ রাখে না—এইসব আর কি।

এমন সময়, হৈমন্তী চৈতন্যর মুখে আগাগোড়া বর্ণনা শুনেছে, স্যুটপরা একজন হুট করে সে-ঘরে ঢুকে কটমট করে ওদের দিকে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে থাকে। মীনার স্বামী শরৎ হালদার। তাকে সে ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মীনা উঠে ভেতরে চলে যায়। তার পেছন পেছন শরৎ হালদারও চলে যায়। ওরা শুনতে পায় বেশ জোরে মিস্টার হালদার মীনাকে জিজ্ঞেস করছে, হু আর দিজ রিফর্যাফস্?

মীনাও তার গলার সংগে তাল মিলিয়ে উত্তর দেয়, ডোণ্ট বি রুড্, শার্‌ৎ, আই এক্সপেক্ট এ লিটল্ কার্টসি ফ্রম ইউ—

সাট আপ ইউ বিচ্! আই সে, হু আর দে?

মাই ফ্রেণ্ডস্—

গড ড্যামনড সিলি ব্লোক্‌স্। আস্ক দেম্ টু গেট আউট, উইল ইউ? আই ওয়ার্ণ, দিস ইজ নট ইওর ষ্টুডিও—

ওঃ শার্‌ৎ, ইউ আর এ বীষ্ট্—দড়াম করে একটা শব্দ হলো। তারপর সব চুপচাপ।

ব্যাপার দেখে খাটো বাবুর আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। সে এদিক ওদিক তাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ওহে চৈতন্য, ব্যাপার সুবিধের নয়। চলো সরে পড়ি।

দাঁতে সিগ্রেট চেপে নির্বিকারভাবে চৈতন্য মুচকি হেসে বলে, কেন—কেন? ভয় পাচ্ছেন কেন খাটোবাবু?

আমাদের কথা ইংরেজীতে ওই রাগী স্বামী কি বললো যে। যদি মারধোর দেয়?

চৈতন্য আরও ভাল করে বসে বলে, তাহলে মার খাবেন, হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—

কাঁদো কাঁদো মুখে খাটোবাবু বলে, হ্যাঃ হ্যাঃ করো না, শুনতে পাবে।

পাক না। দে আর অ্যাট লগারহেডস্। সরে যদি পড়তেই হয় তাহলে—

এমন সময় মীনা এসে হাজির। যেন কিছুই হয় নি এমন ভাব দেখিয়ে বলে, অল রাইট মিষ্টার গড়াই, আই অ্যাম উয়িলিং টু ওয়ার্ক উইথ ইউ—
থ্যাঙ্ক ইউ, চৈতন্য আর খাটোবাবু সেদিন আর কথা না বাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। খাটোবাবু অনেকক্ষণ আগে থেকেই পালাই পালাই করছিলো। এবার রাস্তায় এসে নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। চৈতন্য জানে কোথায় কী ভাবে যেতে হয়। বাইরে হীরেন সান্যালের ষ্টুডিবেকার যথারীতি অপেক্ষা করছিলো। মীনা হালদার ওদের বিদায় দেবার সময় নাকি অনেকক্ষণ সেই মোটর গাড়ির দিয়ে তাকিয়ে থাকে।
কাজেই অদূর ভবিষ্যতে হৈমন্তীকে সেই কথায় কথায় ইংরেজী বলা মীনা হালদারের সংগেও কাজ করতে হবে। সোজা পথ ধরে একা এগিয়ে যেতে চায় না হৈমন্তী। সে এমনি অনেকের সংগে প্রতিযোগিতা করে প্রথম স্থান অধিকার কতে চায়।
শুধু কাজ করবার সময় নয়, সব দিক দিয়ে ওদের সংগে প্রতিযোগিতা করে তাকে প্রথম হতে হবে। ওরা যতই বড়োলোক হোক, যতই নাম করা লোকের স্ত্রী হোক না কেন, ওদের নিয়ে আড়ালে এরা ঠাট্টা করে। নিজের বাড়িতে বসেই হৈমন্তী ওদের সম্বন্ধে নানা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কথা শুনেছে। স্বামীর সংগে ওদের এই আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক নিয়ে বাইরের লোকের মত ফিল্মের লোকেরাও সুযোগ পেলেই রসিকতা করে।
অনীতা স্বামী ছেড়ে চলে এসেছে বলে, একমাত্র হেরম্ববাবু ছাড়া আর কেউই তার ওপর প্রসন্ন নয়। তুলতুলেরও নাকি স্বামীর সংগে ভালো বনিবনা নেই। তাই তাকেও এরা ছেড়ে কথা বলে না। আর মীনার ব্যাপার তো কারোর অজানা নেই। তার ব্যাপার নিয়ে সকলেই হাসাহাসি করে। শুধু খাটোবাবু করুণ মুখে বাধা দিয়ে বলে, তা এ নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করবার কি আছে, স্বামী অমন রাগী হলে কোন্ মেয়ে তাকে মাথায় নিয়ে নাচে?
মোট কথা এই, সব দেখে শুনে হৈমন্তী আরও সাবধান হয়ে গেছে। ভেতরে যাই থাক না কেন, কৈলাসের সংগে তার যে খুব ভাব সেকথা বাইরের লোককে যেমন করে হোক জানিয়ে দিতে হবে। এ লাইনের কেউ যেন কোনোদিনও কোনোদিক থেকে তাকে একটুকুও ছোট না মনে করে। এখন

সকলে তাকে যেমন ভালবাসে, ঠিক তেমনি করেই তারা যেন চিরদিন ভালোবেসে যায়।

কিন্তু দিনে দিনে কী যে হচ্ছে হৈমন্তীর! কৈলাসকে সে আর কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। তার স্বামী যেন সব দিক দিয়ে সকলের চেয়ে পেছনে পড়ে আছে। না পারে বড়ো একটা চাকরি করতে, না পারে ইংরেজী বলতে, না পারে টাই বেঁধে হোটেলে খেতে। কিছুই পারে না কৈলাস।

একদিন হৈমন্তী তাকে বললো, তুমি কিছু পারো না কেন?

অবাক হয়ে কৈলাস বললো, বাঃ-আবার কী? হাঙরের চামড়া—আরে শার্ক স্কীন তুমি তো শেষ অবধি দিলে না, তা যাহোক এমনি স্যুট পরে বিজনেস ম্যান সেজে তো দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছি, একটু ভীত স্বরে কৈলাস জিজ্ঞেস করলো, কোথাও কিছু ভুল করলাম নাকি?

না না, ম্লান স্বরে হৈমন্তী বললো, ধুতি পাঞ্জাবীই ভালো ছিলো, তোমাকে স্যুট ঠিক মানায় না, আরও বোকা বোকা দেখায়।

মাথা চুলকে মহা ভাবনায় পড়ে কৈলাস, বললো, তা হলে কি পরি বল তো?

ম্লান হেসে হৈমন্তী বললো, নিজের বুদ্ধিতে তুমি কি কিছুই করতে পারো না?

কিন্তু তোমার বুদ্ধি যে আমার চেয়ে অনেক বেশি। তাইতো সব সময় তোমার বুদ্ধিতে চলি।

হৈমন্তী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লো, অম্বর বক্সি, শরৎ হালদার কিংবা কমলাক্ষ মিত্রের মত তুমি কেন হলে না। তাহলে তোমার কত নাম হতো, সকলের কাছে তুমি কত খাতির পেতে!

কিছুক্ষণ কৈলাস চুপ করে রইলো. তারপর সহানুভূতির গভীর দৃষ্টিতে হৈমন্তীর দিকে তাকিয়ে দরদ ভরা স্বরে বললো, আমার নাম হবে কেন গো! তোমার মত আমার তো গুণ নেই, স্ত্রীর মাথায় একটা হাত রেখে কৈলাস বললো, তোমার অনেক গুণ, তোমার কত বুদ্ধি! আমার সৌভাগ্য যে তোমার মতো স্ত্রী পেয়েছিলাম। তোমার নাম হচ্ছে, কত বড়ো বড়ো লোক তোমাকে ভালোবাসছে, সকলে তোমার নাম জেনেছে। আমি তাতেই খুশী হৈমন্তী, আমি আর কিছু চাই না।

হৈমন্তী চোখ বন্ধ করে কৈলাসের কথা শুনছিলো। সে যখন এমনি কথা

বলে তখন হৈমন্তীর তাকে মন্দ লাগে না, কিন্তু তবু স্বামী বলে ভাবতে আজকাল যেন বড়ো বেশি বাধে। কি করবে হৈমন্তী? মাঝে মাঝে তার বড়ো কষ্ট হয়, তার যেন সব থেকেও কিছু নেই। কিন্তু তার এ ভাবনা ক্ষণিকের। উচ্ছল জীবনের অলোড়নে সারা দিনের মধ্যে কৈলাসের কথা আর মনেও পড়ে না।

বাইরের লোকের সামনে ঠাট বজায় রাখলেও মনে মনে কৈলাসকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে হৈমন্তী। সে তা না করে পারে নি। চৈতন্য সে-রাত্রে তাকে যে কথাগুলি বলেছিলো, সব দিক বজায় রাখবার জন্যে যা চেয়েছিলো, হৈমন্তী তা দিতে অক্ষম। অথচ কৈলাসকেও সে মনে মনে বাদ দিতে পারছে না। চৈতন্যর কথায় সে চেষ্টা করেছিলো নিজেকে জয় করে নিতে, কিন্তু নিজের কাছে নিজের হার হয়েছে হৈমন্তীর। তাই যখন একথা তার মনে হয় তখন বুক জ্বলে।

এ বাড়িতে আসবার পর হৈমন্তীর নিজের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা করেছে। একটা ঘরে সে একা থাকে। তার খাট আলমারী ড্রেসিং টেবিল সবই সেই ঘরে। আরও একটা শোবার ঘর আছে এ বাড়িতে, সে-ঘরে কৈলাস ছেলেদের সংগে শোয়।

কৈলাসের কাছে আজকাল হৈমন্তীর কোনো লজ্জা নেই। সে মনে মনে চায় যে তার স্বামী সব জানুক। কিন্তু কৈলাস যেন কিছুতেই কিছু বুঝতে চায় না। হৈমন্তী তাকে সব কথা নিজের থেকে মুখ ফুটে বলে কেমন করে।

আজকাল আর হৈমন্তীর কোনো বাধা নেই। এতদিন পর হঠাৎ সে যেন কাজের মানুষ হয়ে উঠেছে। সে বুঝতে পেরেছে যে তারও বেঁচে থাকবার প্রয়োজন আছে, তারও করবার অনেক কাজ আছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠলেও সে বিছানা ছাড়ে না, ঝি মুখের কাছে শুধু এক কাপ চা ধরে দেয়। বাবলু খোকনের জন্য এখনও সে আয়া রাখে নি বটে, তবে ভালো ঝি রেখেছে। সে-ই তাদের দেখাশুনো করে। এই নিয়েও নাকি পাঁচজনে নানা কথা বলে, ছেলে দু'টো রোগা হয়ে যাচ্ছে, হৈমন্তী ওদের দিকে ফিরেও দেখে না, শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে ইত্যাদি।

লোকে যখন এসব কথা বলে তখন হৈমন্তী তার অর্থ খুঁজে পায় না।

নিজে না দেখে, ছেলেদের দেখবার জন্য একজন ভালো লোক রাখলে ক্ষতি কি! তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে তো প্রাণপাত পরিশ্রম করছে। আর যাকে রেখেছে সেই সুশীলা ঝি একজন পাকা লোক। হৈমন্তীর চেয়ে অনেক ভালোভাবে সে ছেলেদের দেখতে পারে। লোকে কেন একথা বোঝে না যে সংসারের কাজের জন্য বেশি সময় নষ্ট না করে সে যদি আরও বেশি অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে তাহলে সংসারে ঐশ্বর্যের ছাপ গভীর হয়। ছেলেদের সে সুশীলার চেয়ে বেশি যত্ন করতে পারতো না। আয় আরও বাড়লে সে আয়া রাখবে। আর বাবলু খোকন বড়ো হলে সে তাদের পড়াশুনো করবার জন্য পাঠিয়ে দেবে হয় কারসিয়াং নয় ডেরাডুন। আরও পরে সে তাদের পাঠাবে অক্সফোর্ড কিংবা কেম্ব্রিজ। আর অভাব কি হৈমন্তীর! কোন আত্মীয় তার সংগে নাই বা সম্পর্ক রাখলো, যখন তার দিন শেষ হয়ে যাবে, রূপ যৌবন বয়স থাকবে না তখন থাকবে হীরের টুকরো দুই ছেলে, তখন যুগের হাওয়া ঘুরে যাবে। হৈমন্তী কেমন করে পয়সা করলো সেকথা কেউ মনে রাখবে না। মনে রাখলেও এই কারণে সমালোচনা করবার দিন শেষ হয়ে যাবে, শুধু বাবলু খোকনের উচ্চশিক্ষা সব চেয়ে বড়ো হয়ে লোকের মনে উজ্জল হয়ে থাকবে। সকলে পাঁচ মুখে হৈমন্তীর প্রশংসা করবে।

সকাল থেকে রাত্তির অবধি হৈমন্তীর নিশ্বাস ফেলবার সময় থাকে না। আজকাল রাজ্যের লোক আসে তার সংগে দেখা করতে। সকলকে দিয়ে যে কাজ পাওয়া যায় তা নয়, কিন্তু ওরা হলো লক্ষ্মীর বাহন, কে যে কখন কাজে লাগে বলা যায় না। তাই চৈতন্য বলে দিয়েছে, সকলের সংগে দেখা করবে, সকলের সংগে ভালো ব্যবহার করবে, সকলকে হাতে রাখবে। ওদের দিয়ে কোনো না কোনো কাজ তোমার হবেই। যে দেবো-দেবো করে শেষ অবধি তোমাকে কোন নতুন কাজ দিতে পরলো না, হয়তো তার গাড়ি আছে, তুমি তার সংগে এমন আলাপ রাখবে যেন তোমার প্রয়োজনে সে সব চেয়ে আগে গাড়ি ধার দেয়। তাদের মধ্যে হয়তো কারোর মোটর নেই কিন্তু খাবারের কিংবা কাপড়ের দোকানে শেয়ার আছে। দরকার মতো খাবার নেবে, দরকার মতো দাম না দিয়ে কাপড় আদায় করবে। কিন্তু খুব কায়দা করে এসব করতে হয়। চিত্রতারকাদের ওপর

অনেকের দুর্বলতা আছে, তেমন কেউ যদি কখনও তোমার কাছে আসে, তাদের কখনও অমনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দিও না। সামান্য হলেও কোনো না কোনো কাজ তাদের দিয়ে করিয়ে নেবে। তুমি যা বলবে, দেখবে তারা তাই করে ধন্য হয়ে যাবে। এসব করতে সঙ্কোচ করবার কোনো মানে হয় না কারণ যারা ব্যবসা করে তাদের কাজ উদ্ধারের জন্য অনেক কিছু করতে হয়। হৈমন্তী ব্যবসা করতে নেমেছে, অদূর ভবিষ্যতে সে নিজে কোম্পানী খুলে ছবি তৈরী করবে। তাই এখন থেকে তাকে প্রস্তুত হতে হবে।

চৈতন্যর কথা হৈমন্তী বেদবাক্য বলে মনে করে। তার কথা মত না চলে উপায় নেই। এই পরিবারের মঙ্গল একমাত্র সে-ই চায়। কাজেই যারা বাড়িতে আসে হৈমন্তী তাদের যথারীতি আপ্যায়ন করে, আসুন সতীশ বাবু, বসুন। এই যে, পটল বাবু যে আর আসেন না, কী ব্যাপার? ওমা কিশোর বাবু গাড়ি কিনলেন কবে? চলুন একদিন অনেক দূর বেড়িয়ে আসি। মুনলাইট পিকনিক এসময়ে মন্দ হবে না—এমনি নানা লোক একের পর এক আসে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে, চা খায়। কেউ শুধু গল্প করে, কেউ ভবিষ্যতে ছবি করলে হৈমন্তীকে নায়িকা করবে এমন প্রতিজ্ঞা করে, কেউ শুধু তার স্তবগান করে বাড়ি ফিরে যায়। এরা দলে দলে আসে। এদের আসা-যাওয়ার কোনো সময় নেই, যখন তখন কড়া নাড়ে। কৈলাসের কাজ হলো তাদের যত্ন করে বসানো, ঠিক মতো চা হচ্ছে কিনা তার তদারক করা আর মাঝে মাঝে ঘরে এসে তাদের কথায় সায় দেয়া। কখনও হয়তো খোকন বায়না ধরে, বাবলু কেঁদে গলা ফাটিয়ে দেয়, কিন্তু কিছুতেই তাদের জন্যে কেউ হৈমন্তীকে বিরক্ত করতে পারবে না। সুশীলা কিংবা কৈলাস, যে পারে তাদের সামলায়। এখন তাদের দিকে ফিরে দেখবার সময় হৈমন্তীর নেই। নানা কথা ভেবে অনেক বুঝে তাকে প্রতিমুহূর্তে চলতে হয়। এখন তার গাড়ি কেনবার অসুবিধা আছে অথচ গাড়ি না হলে বার হওয়া যায় না। কারণ সে হেঁটে রাস্তায় চলছে দেখলে লোকে অবাক হবে। তাই বাধ্য হ'য়ে তাকে অন্য লোকের গাড়ি কথায় কথায় চাইতে হয়। আর বলা বাহুল্য যে গাড়ি দেয় তাকে একটু বেশি আদর-আপ্যায়ন না করলে চলবে কেন। সে যেই

হোক, একটা গাড়ির মালিক তো, হৈমন্তীর এমন ভক্তর সংখ্যা যতো বাড়ে ততো মঙ্গল। উঠতির সময় ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামালে তার চলবে না। কথায়-বার্তায় ব্যবহারে সকলের প্রিয় হয়ে অতি দ্রুত সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ সুগম করে তুলতে হবে।

দুপুরে সাধারণত হৈমন্তীকে ষ্টুডিওতে যেতে হয়। ষ্টুডিও এখন তার বাড়ির কাছেই, তবু হেঁটে কিংবা ট্রামে যাওয়া অশোভন। কিন্তু এইজন্যে তাকে বেশি ভাবতে হয় না, চৈতন্য কিংবা হেরম্ব তাকে নিয়ম করে তুলে নিয়ে যায়। যদি সারা দিন সারা রাত হৈমন্তী ষ্টুডিওতে কাজ করতে পারতো তাহ'লে সে সব চেয়ে বেশি খুশী হ'তো, এতটুকু ক্লান্ত হতো না। সেখানে যতোক্ষণ থাকে ততোক্ষণ তার আর কোনো কথা মনে থাকে না, কাজের উত্তেজনায় একে একে সব কিছু চাপা পড়ে যায়। হৈমন্তীর মনে হয়, পৃথিবীর কোথাও যদি আনন্দ থাকে তাহলে তা' আছে প্রিমিয়ার পিকচার্সের ষ্টুডিওতে। যেদিকে তাকাও সেদিকে আভিজাত্যের হাওয়া, সম্পদের ছাপ, অনুপ্রেরণার ইঙ্গিত। এ ষ্টুডিও ছেড়ে কে অন্য কোথাও যেতে চায়! কেউ না।

অরণ্যে যেমন বাঘ, মরুভূমিতে যেমন উট, সমুদ্রে যেমন জাহাজ, প্রিমিয়ার পিকচার্স লিমিটেডের ষ্টুডিওতে তেমন চৈতন্য গড়াই। যতোক্ষণ পারে তার সংগে থাকে হৈমন্তী, যখন সে অন্য ফ্লোরে কিংবা অন্য কোথাও যায় তখন চোখের পাতা না ফেলে তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। চেয়ে চেয়ে সাধ মেটে না হৈমন্তীর।

এই যে হৈমন্তী, তার পিঠে হাত রাখে হেরম্ব দত্ত, তোমার সংগে আলাপ করিয়ে দি, এর নাম মিনতি দেবী, আমাদের ষ্টুডিওর রানী—

নমস্কার, হৈমন্তী হাসিমুখে তার আপাদমস্তক দেখতে দেখতে ভাবে, চৈতন্য একেই একদিন প্রত্যাখান করেছিলো। তার চোখে ফুটে ওঠে জয়ের উল্লাস।

হৈমন্তী জিজ্ঞেস করে, আপনি এখন কোন্ ছবিতে কাজ করছেন?

মিনতি হেসে উত্তর দেয়, আমাদের দিন শেষ, এবার আপনাদের যুগ, একটু থেমে সে আবার বলে, 'অপবাদে' কাজ করবার কথা ছিলো কিন্তু শেষ অবধি পেলাম না। শুনলাম আপনাদের মতো বড়ো ঘরের বউরা সব নাকি তা'তে অভিনয় করছেন।

এই তুলনা করায় মনে মনে খুব খুশী হয়ে হৈমন্তী বলে, আপনারা যে পথ করে গেছেন সে পথ ধরেই তো আমাদের চলতে হবে। ওঃ, আপনার কী অপূর্ব অভিনয়! আপনার চেয়ে ভালো অ্যাক্টিং আর কে করবে বলুন?

হেসে হেরম্ব দত্তর গালে টোকা মেরে মিনতি বলে, সেকথা এরা থেকে থেকে বোঝেন না কেন জানি না। যাক, এখন আপনারা এগিয়ে যান, আমরা দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখি, হৈমন্তীর হাত ধরে মিনতি বলে, শুধু মনে রাখবেন, প্রিমিয়ার পিকচার্সে কাজ করতে হলে অনেক রকম অভিনয় করা দরকার, যদি পারেন, নাম করতে একটুও দেরি হবে না—

মিনতি কথা শেষ করবার আগেই রাগে কাঁপতে কাঁপতে সেখানে চৈতন্য গড়াই এসে হাজির হলো। তার চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে, গলার বোতাম খুলে গেছে, ঘন ঘন সিগ্রেটে টান মারতে মারতে সে চীৎকার করে উঠলো, ব্লাডি ফুল্! ডাজন্ট্ নো হাউ টু বিহেভ উইথ এ জেণ্টেলম্যান—অ্যাবসোলুটলি আনএজুকেটেড—

হৈমন্তী বেশ বিচলিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার চিতু?

হেরম্ব বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করলো না, কী হয়েছে, সকালবেলা চেঁচামেচি করছো কেন?

আরে এত বড়ো সাহস—আমাকে কিনা ফ্লোর থেকে বেরিয়ে যেতে বললো—

হেরম্ব মুচকি হেসে বললো, তা তুমি বিজয় সেনের ফ্লোরে সর্দারি করতে গিয়েছিলে কেন?

সর্দারি মানে? আই অ্যাম দি সিনিয়র ডিরেক্টার অব দিস কোম্পানী, আই হ্যাভ গট এভরি রাইট টু গো এনি হোয়ার আই লাইক—ষ্টুডিওর কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে আমি খবর রাখবো না?

হেরম্ব দত্ত হেসে বললো, রাখা উচিত নয়, তাহলে অন্য পাঁচজন তোমার খবর রাখতে চাইবে।

ড্যাম সোয়াইন, চৈতন্য চীৎকার করে যেতে লাগলো, লোকটা যখন খেতে পেত না, আমি তখন ক্ষিতীন ঘোষকে বলে ওর চাকরি করে দিলাম; এখন আমাকেই বলে, অয়েল ইওর ওন্ মেসিন! ওর বিদ্যের দৌড় আমার জানা আছে—

হৈমন্তীর এদের ব্যাপারে কথা বলবার অধিকার আছে। সে বেশ জোরে বললো, নিজেকে বিজয়বাবু কি মনে করেন?
জিনিয়স, চৈতন্য প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া সিগ্রেট দূরে ছুঁড়ে ফেলে বললো, একটা ছবি হিট্ হয়েছে বলে একেবারে ধরাকে সরা মনে করছে—ব্লক হেডেড বাটার ফিংগারড্ ডঙ্কি, আই স্মাল ফিনিশ হিম্—
হেরম্ব দেখলো নিজের সিগ্রেট খাবার এই সুযোগ। এখন হাওয়া গরম, চৈতন্য নিশ্চয়ই তার কাছে চাইবে না। কিন্তু যেই সে অতি সন্তর্পণে কায়দা করে পকেট থেকে প্যাকেট বের করে দেশলাই জ্বালাতে যাবে অমনি তার দিকে হাত বাড়িয়ে চৈতন্য বললো, সিগ্রেট দিন তো!
ভাঙা গলায় হেরম্ব বললো, এই তো খেলে—
কিন্তু ততোক্ষণে চৈতন্য তার হাত থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট ছিনিয়ে নিয়েছে।
মিনতি এতোক্ষণ চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়েছিলো। এবার এগিয়ে এসে চৈতন্যর গালে হাত দিয়ে আস্তে আঘাত করে বললো, ঠিক তেমনি আছো তুমি, কেবল ঝগড়া করবার জন্যে ব্যস্ত, এবার একটু শান্ত হও।
চৈতন্য আবার ঝড়ের মত বেরিয়ে যাচ্ছিলো কিন্তু হেরম্ব তার হাত ধরে বললো, আবার কোথায় যাচ্ছো?
যাবো আবার কোথায়, বেনা বনে মুক্তো ছড়িয়ে এসেছি তাই তুলতে—
আঃ, হেঁয়ালি কর কেন, সোজা করে কথা বলতে পারো না?
দাঁতে সিগ্রেট চেপে চৈতন্য বললো লোকটা যখন ওর ফ্লোর থেকে আমাকে বেরিয়ে যেতে বললো, আমি তখন রাগ সামলাতে না পেরে ষ্টেটস্ম্যান এডিসন শ'র "প্লেজ আনপ্লেজেন্ট" ওর দিকে ছুঁড়ে মারি। বাট ইট মিস্‌ড হিম—সেটা বোধ হয় এখনও ওখানে পড়ে আছে, যাই তুলে আনি—
তা এইজন্যে তোমার নিজে যাবার কি দরকার? একটা বেয়ারাকে বল না, নিয়ে আসবে—
না না না—বলতে বলতে চৈতন্য সেখান থেকে চলে গেল।
নাঃ, আবার কি কাণ্ড বাধাবে, মিনতি আর হৈমন্তীর দিকে তাকিয়ে হেরম্ব বললো, চলুন আমরাও ওর সংগে যাই?
হ্যাঁ হ্যাঁ তাই চলুন—

হাসতে হাসতে হেরম্ব বললো, চৈতন্য দেখছি বার্ণাড শ'কে নানা ভাবে কাজে লাগাচ্ছে—গ্রন্থাবলী ছুঁড়ে মারতেও আরম্ভ করেছে—হি হি হি—

শেষ অবধি ওদের সঙ্গে হৈমন্তীর যাওয়া হলো না। হেরম্ব বাবুর সংগে নাকি মিনতির কি দরকার আছে, তাই ওরা স্টুডিওর বাগানে বেড়াতে বেড়াতে কথা বলতে লাগলো। হৈমন্তীর আজ স্যুটিং হবার কথা ছিলো, সে এখানে এসেছে ঘণ্টা দু'য়েক, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছে না যে আজ কাজ হবে কিনা। এখনও তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য এমন প্রায়ই হয়। এখন চৈতন্যর মাথা গরম, তার কথা বলবার অবসর হবে না, হেরম্ব বাবু মিনতির দরকারী কথা শুনছে। দরকারী কথা আর কি, কাজের কথা বলবে নিশ্চয়ই। মিনতিকে কি জানি কেন, একেবারেই পছন্দ হয় না হৈমন্তীর। লোকের গায়ে পড়তে বড়ো ভালোবাসে, কি দরকার ছিলো অত আত্মীয়তা করে চৈতন্যর গালে হাত দেবার। এখন বিয়ে যা করেছিস, ভালো করে ঘর সংসার কর, আবার এর তার সংগে ফষ্টিনষ্টি করা কেন! এই মেয়ে নাকি একদিন চৈতন্যর জন্যে পাগল হয়েছিলো। সেকথা ভাবলে হৈমন্তীর হাসি পায়। বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার চেষ্টা। যাহোক চৈতন্যর গায়ে পড়বার চেষ্টা করে কোনো সুবিধা মিনতির হয় নি। এক অক্ষর ইংরেজী জানে না। চৈতন্য বলেছে, অমন মিডলক্লাস মেয়েকে আমল দেবার লোকই সে নয়।

আর কয়েক দিনের মধ্যেই শীত এসে পড়বে। এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাঝে মাঝে কাঁপুনি লাগে। আগে শীত এলে ভয়ে হৈমন্তীর সমস্ত শরীর যেন ঠাণ্ডা হয়ে যেতো। গরম কাপড়ের ভাবনায় ঘুম হতো না তার। কিন্তু আজকাল শীত এলে সে খুশী হয়, পাঁচজনের সামনে নানা রকম গরম কোট পরে বার হতে ভালো লাগে আর এখন তার বাড়িতে বেশি ভিড় হয়। শীতের জন্যে সব সময় বাইরে বার হওয়া সম্ভব হয় না। তাই সকলে সময় পেলেই তার ওখানে চলে আসে আর তারপর গল্পে গল্পে কাপের পর কাপ চা শেষ হয়। শীতের মাত্রা বাড়ে বলে সহজে ওঠা যায় না। হৈমন্তী খুশী মনে সকলের সংগে প্রাণ খুলে অনেকক্ষণ ধরে অনেক রকম গল্প করে।

ষ্টুডিওর বাগানে একা বেড়াতে বেড়াতে হৈমন্তী সহসা মাথা তুলে তাকিয়ে দেখলো গাছে গাছে শীতের আমেজ লেগেছে, আলো স্তিমিত হয়ে এসেছে,

চারদিকে কেমন যেন থমথমে ভাব। বেশ বড়ো বাগান, এপাশে ওপাশে অনেক ফুলের গাছ। অনেক ফ্লোর, সামনে সাউণ্ড ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়াইয়ান সার্ট পরে অ্যাসিসটেন্টরা ছুটোছুটি করছে, কারোর কারোর গলায় ক্যামেরা ঝোলানো। বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ হৈমন্তীর খেয়াল হলো যে সে একেবারে বিজয় সেনের ফ্লোরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কৌতূহলী চোখে সে কাছাকাছি কাকে যেন খুঁজলো বারবার। কিন্তু না, সে কোথাও নেই। কোথায় গেল চৈতন্য ?

এতো বড়ো ষ্টুডিওতে শুধু একমাত্র বিজয় সেনকে হৈমন্তীর একেবারে অন্য রকম মনে হয়। সে গাড়ি চড়ে এখানে আসে না, কথা খুব কম বলে আর সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা যে বিজয় সেন ধুতি পরে স্টুডিওতে আসে। তাই দামী স্যুট পরা অসংখ্য লোকের মাঝে বিজয় সেনকে যেন একেবারে বেমানান মনে হয়, গরিবের মতো দেখায়। লোকটাকে ভালো লাগে না হৈমন্তীর। অথচ তাকে নিয়ে এরাই বা কেন এতো মাতামাতি করে সেকথা হৈমন্তী ভেবে পায় না। বিজয় সেনকে ফ্লোরের বাইরে বড়ো একটা দেখা যায় না। ঠিক সকাল দশটায় ষ্টুডিওতে এসে কাজ আরম্ভ করে। চৈতন্য আর হেরম্ব ছাড়া আর সকলেই বিজয় সেনের ব্যবহারে মুগ্ধ। তার মুখে সব সময় হাসি লেগে আছে, সকলকে সে শ্রদ্ধা করে কথা বলে।

কিন্তু হৈমন্তী তাকে পছন্দ করে না, কারণ সে অন্য দলের লোক। চৈতন্য আর হেরম্ব যদি বলে এখানে জল উঁচু, সে তখন খুশী মনে মাথা নেড়ে সায় দেয়। কিন্তু হৈমন্তী পছন্দ না করলে হবে কি, বিজয় সেনকে সমস্ত দেশ ভালোবাসতে আরম্ভ করেছে। এবং যেকথা ভেবে হেরম্ব চৈতন্যর দল মুখে কিছু না প্রকাশ করলেও মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে, তা হলো বিজয় সেনের আশ্চর্য জনপ্রিয়তা। মাত্র একটি ছবি করে সে এত বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে নানা জায়গা থেকে তার নেমতন্ন আসতে আরম্ভ করেছে। আর যে সব উন্নতনাসা শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোক বাংলা ছায়াচিত্র শিল্পের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে দিশি প্রেক্ষাগৃহের ধারে কাছেও আসতো না, আজ অকস্মাৎ তারা বিজয় সেনকে বাড়িতে এসে অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছে, আর আগ্রহ প্রকাশ করে তার পরের ছবি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করছে। এবং আরও আনন্দের কথা এই যে বিজয়

সেনের প্রথম ছবি দেখবার পর আপামর জনসাধারণ বাংলা ছবি সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে উঠেছে। তার ছবির নাম হলো, "সংগ্রামের পরে"।

ঘটনা অতি সাধারণ। নাচ নেই, কারণে অকারণে নায়িকার গাছে চড়ে কিংবা স্ল্যাকস্ পরে ফুল ধরে ঘুরে ফিরে গান গাওয়া নেই। বিজয় সেনের ছবিতে অনেক দরিদ্র মানুষের ভিড়। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা পোকামাকড়ের মতো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। বারবার প্রকাশ পাচ্ছে তাদের অসন্তোষ আর রুদ্ধ আক্রোশ। তাদের বেঁচে থাকা মানে তিলে তিলে ক্ষয়। তবু এই যন্ত্রণার মধ্যেও আজও একেবারে শেষ হ'য়ে যায় নি তাদের আত্মবিশ্বাস ; আর তারই দৃঢ়তায় আজকের এই ভগ্নস্তূপ থেকে তারা একদিন গড়ে নেবে অট্টালিকা। সুগম করবে কাঁকড় ছড়ানো সংকট-সঙ্কুল পথ। জীবনে আনবে সমন্বয়।

গল্পের লেখক একেবারে নতুন। তার উপন্যাস প্রকাশিত হবার সংগে সংগে বিজয় সেন তার বাড়ি গিয়ে চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। আর তখন তার ওপর নানাদিক থেকে নানা আক্রমণ হয়েছিলো, এ আবার একটা গল্প নাকি ? এ কিছুতেই ছবি হতে পারে না। প্রডিউসার ভালো লোক বলেই এ ষ্টুডিওতে ব্যাঙও যা খুশি তাই করতে পারে—এই রকম আরও অনেক কথা সমস্ত ষ্টুডিও ভ'রে দিনরাত অলোচনা হতো।

বিজয় সেনের "সংগ্রামের পরে" মুক্তি পাবার দিন অবধি চৈতন্য হেরম্বর দল চতুর্দিকে তাকে ছোটো করবার, মূর্খ বলে প্রমাণ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড হলো প্রথম দিন। লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো বিজয় সেনের নাম। পরদিন কাগজে কাগজে তার ছবি বার হলো। তাকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালো অনেক ভদ্রলোক, তার জন্যে খোলা রইলো অনেক গৃহস্থের দ্বার।

বস্তুত, বোধ হয় বিজয় সেন নিজের অজ্ঞাতে ছায়াচিত্রের কর্মীদের পদমর্যাদা জনসাধারণের কাছে অনেকখানি বাড়িয়ে দিলো। তার আগে কি হতো ? দূর থেকে লোকে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখতো, ছেলে ছোকরারা গাড়ির নম্বর টুকে হৈ হৈ করতো কিংবা বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়াতো। কিন্তু বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতো না কেউ, তা করতে তাদের লজ্জা হতো, ঘৃণা

হতো, ভয় হতো। কারণ তারা মনে করতো ছায়াচিত্রের কর্মীরা যেন অন্য জগতের মানুষ। আমাদের পৃথিবীতে তাদের মানায় না, তাদের কাছে যা নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার, আমাদের সমাজে তা ভয়ঙ্কর।

অনেকের আবার একটু অন্যরকম ধারনা ছিলো। অর্থাৎ যারা ফিলিমে কাজ করে তাদের চরিত্র নাকি কিছুতে ভালো হ'তে পারে না। আর তাদের বাড়িতে প্রবেশ করতে দিলে একটা অঘটন ঘটবেই। গৃহস্থ বধুকে গৃহের বার করা নাকি তাদের ধর্ম। ও জগতের বেশির ভাগ লোকের চরিত্র আলোচনা করলে একথার সহজ প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ যাদের অন্য কোথাও গতি হতো না, লেখাপড়া যারা কিছুই করে নি, দুশচরিত্র বলে যাদের রীতিমতো নাম ছিলো, তারা হয় ছবিতে নামতে নয় ফিলিমে কাজ করতে আসতো। ভদ্র কুমারী মেয়ের সংগে প্রেম করা দূরের কথা, আলাপ করবার সুযোগ তারা পেতো না। গৃহস্থের বাড়িতে তাদের প্রবেশ নিষেধ ছিলো। কিন্তু বিবাহিত মেয়েদের বেলা হয়তো লোকে ততো ভয় করে না, তাই মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধবের সুন্দরী স্ত্রীদের সংগে তাদের আলাপ করবার সুযোগ হতো এবং নির্বিকার চিত্তে তারা সে সুযোগের সদ্ব্যাবহার করতো অর্থাৎ নানা ছল করে বন্ধুর স্ত্রী নিয়ে নিরুদ্দেশ হতো। এমন ঘটনা একবার দু'বার নয় বহুবার ঘটেছে। ফিলিমের সেই সব বেইমান, অশিক্ষিত লম্পট কর্মীরা অনেক গৃহস্থের গৃহে স্থচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরিয়েছে বলে বর্তমান সমাজে তারা দশজনের একজন হয়ে জনসাধারনের সংগে মিলে মিশে কোনোদিনও বাস করতে পারে নি। সমাজ তাদের কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে নি, অবহেলায় দূরে ঠেলে রেখে এসেছে এতদিন, সন্তর্পণে তাদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে এসেছে। যে গৃহস্থ সমাজের এই শাসন মানে নি, অন্যায় বলে প্রতিবাদ জানিয়ে ফিলিমের লোককে বাড়িতে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছে সেই ঠকেছে। হয় তার মেয়ে ছবিতে নামবে বলে তাকে না জানিয়ে নিখোঁজ হয়েছে কিংবা তার স্ত্রী প্লে-ব্যাক করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে, মানে একটা না একটা কিছু ঘটে ঘর চুরমার হয়ে গেছে।

তবু অনেকে ছিলো যারা ইচ্ছে করে এদের সংগে মেলামেশা করতো। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, এই বেইমান বেতমিজ লম্পটগুলোর মাথায় হাত বুলিয়ে গ্রেট

ইষ্টার্ণে বিলিয়ার্ড খেলে, পাঁচ রকম ভালোমন্দ খেয়ে পান করে রাত কাটানো। দরকার মতো তাদের তথাকথিত মডার্ণ স্ত্রীরা অনর্গল ভুল ইংরেজী বলে তাদের গালে ঘটা করে টোকা মেরে গায়ে ঢলে পড়তো। ছায়াচিত্রের কর্মীদের মতে এরাই ছিলো তখনকার আধুনিক মহিলা, যারা ফিলিম সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করতো আর সামান্য অর্থ পেলে ছবিতে নামতেও দ্বিধা করতো না। কেন না এদের সময় কাটানোর ধরন ছিলো চিত্রজগতের মানুষদের মতোই। তাই অবশেষে চিত্রকর্মীরা গৃহস্থ বাড়িতে প্রবেশ করবার বৃথা চেষ্টা না করে ক্লাবে যাওয়া লেখাপড়া জানা "সোসাইটি লেডি"র সন্ধানে কোট টাই পরে ঘুরে বেড়াতো। এদের একদিন "কোয়ালিটি"তে নিয়ে গেলে হাত ধরতে দেয়, দু'দিন "ম্যাগনোলিয়া"য় নিয়ে গেলে গায়ে পড়ে আর "এমবেসি" "প্রিন্সেসে" নিয়ে গেলে তো কথাই নেই—তাহলে আরও অগ্রসর হতে দ্বিধা করে না।

চিত্রজগতের একমাত্র মানুষ বিজয় সেন এদের কোনোদিনও সামান্য প্রাধান্য দেয় নি। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, এদের দিয়ে চিত্র শিল্পের সত্যিকার উন্নতি কখনও হবে না। কেন না এঁরা যে সমাজে বাস করবার গর্ব করে, দুঃখের বিষয় সে সমাজের অস্তিত্ব বাংলাদেশে নেই। এদের লোকে ঘৃণা করে, মানুষ বলে শ্রদ্ধা করতে পারে না, দেশের কলঙ্ক বলে উল্লেখ করে।

এদের অভিনয় করা ছবি যে কোনোদিনও দেশের লোকের মন প্রাণ স্পর্শ করবে না সে কথা বিজয় সেন জানতো। কেন না দেশের খাঁটি মানুষের সংগে তাদের নিজেদেরই কোনো যোগ নেই।

কিন্তু হৈমন্তীকে একদিন ষ্টুডিওতে দেখে বিজয় সেনের খুব ভালো লেগেছিলো। তার মনে হয়েছিলো যে ঠিক মতো শেখাতে পারলে অভিনয়ে এ মেয়ে অসম্ভব সম্ভব করতে পারে। নিজে এগিয়ে এসে বিজয় সেন হৈমন্তীর সংগে আলাপ করেছিলো। তখন অবশ্য চৈতন্য কিংবা হেরম্ব কেউই ঠিক সেই জায়গায় উপস্থিত ছিলো না।

কিন্তু আলাপ করলে হবে কি, হৈমন্তী বিজয় সেনের ওপর মোটেই প্রসন্ন ছিলো না। চৈতন্য এর মধ্যেই তার জমি প্রস্তুত করে রেখেছিলো। আর তা ছাড়া বিজয় সেনের কোনো কিছুই হৈমন্তীর ভালো লাগে নি। তার সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবী পরে ষ্টুডিওতে আসা, ট্রামে কিংবা সাইকেল রিক্সায় বাড়ি ফেরা,

—সব কিছু দেখে বিজয় সেনকে হৈমন্তীর কিছুতেই মনে ধরতো না। তাকে তার অতি সাধারণ মানুষ বলে মনে হতো। সাধারণ মানুষের কথা আর তাদের সাধারণ দৈনন্দিন পীড়াদায়ক জীবনযাত্রার কথা আর ভাবতে চায় না হৈমন্তী—ভাবতে তার ভয় করে। সে এখন নতুন জগতে এসে পড়েছে, নতুনত্বের স্বাদ তার চাই। যেখানে অর্থ নেই, সম্পদের স্পর্শ নেই, জীবনের জাঁকজমক নেই, হৈমন্তী আর সেখানে কিছুতেই থাকবে না।

নমস্কার করে বিজয় সেন বললো, আমার নাম বিজয় সেন—

হৈমন্তী প্রতি নমস্কার করলো, আপনার নাম শুনেছি, ছবিও আমার ভাল লেগেছে।

বিজয় সেন হেসে বললো, আপনাদের পাঁচজনের ভালো লাগবার জন্যেই তো আমি ছবি করি। আপনারও অভিনয় আমার খুব ভালো লেগেছে, দু' এক মিনিটের জন্যে ওপরে তাকিয়ে থেকে বিজয় সেন আস্তে আস্তে বললো, তবে আমার মনে হয়, সত্যি ভালো অভিনয় করতে হলে গল্পের সংগে জীবনের যোগ থাকা দরকার। ভালো গল্প হলে হয় তো আপনি আরও অনেক ভালো অভিনয় করতে পারতেন।

হৈমন্তী একটু গম্ভীর হয়ে বললো, "মাই ডার্লিং" গল্প তো আমার খারাপ লাগে নি। আর ও ছবি কোম্পানীকে অনেক পয়সাও দিয়েছে।

হয় তো আপনার কথা ঠিক। আমি ঠিক জানি না। আর 'মাই ডার্লিং'' সম্পর্কে আমি আমার মতামতও আপনাকে জানাবো না, কেন না ভালো ছবি সম্বন্ধে আমার ধারণা হয় তো ঠিক আপনার মতো নয়—

হৈমন্তী হেসে বললো, সকলেরই নিজস্ব মতামত আছে, অনেকের সংগে অনেকের মত মেলে না।

তা তো ঠিক, তবে আজকের যুগে ছবি সম্বন্ধে মানুষের মতামত কি হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

নিশ্চয়ই, একটু ভেবে হৈমন্তী বললো, আবার অনেকে আছেন, যাঁরা নিজের বুদ্ধি খাটান না কিন্তু নিজেদের বুদ্ধিমান বলে প্রমাণ করবার জন্যে খুব শিগগির পরের মত নিজের বলে মেনে নেন।

ঠিক তাদের কথা আমি ধরছি না, কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে বিজয় সেন

বললো, এই আপনার কথাই ধরুন, আজ আপনার যা মত, জীবনের সংগে আরও নিবিড় পরিচয় হলে হয়তো কাল তা বদলে যেতে পারে, আর তখন ঠিক নিজেকে বুদ্ধিমান বলে প্রমাণ করবার জন্যে আপনি পরের মত নিজের ব'লে মেনে নেয় না।

হৈমন্তী হাল্কা হাসি হেসে বললো, তা বটে, তবে মানুষের এই মতামত নিয়ে চিরকাল যুদ্ধ চলে আসছে আর আমার মনে হয় সেটা চিরকাল চলবেও—

বিজয় সেনও হাসলো, তা হয়তো চলতে পারে। কিন্তু কার মতামতের কতখানি মূল্য তা একদিন যাচাই হয়ে যায়—

বিজয় সেনের সংগে হৈমন্তীর সেই একদিনই এমনি আরও অনেক কথা হয়েছিলো। কিন্তু তারপর হঠাৎ এমন এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যায় যার জন্যে অনেকবার আসতে যেতে দেখা হলেও ওরা শুধু শুকনো নমস্কার করে পরস্পরকে এড়িয়ে গেছে। হৈমন্তী লজ্জা পেয়েছিল খুব। সে যদি জানতো যে চৈতন্য এমন কাণ্ড করবে তাহলে সে কিছুতেই তাকে সবিস্তারে বিজন সেনের সংগে তার আলোচনার কথা জানাতো না।

সব শুনে চৈতন্য চিৎকার করে উঠলো, হোয়াট এ চাক্! তোমার কাছে আমার গল্পের নিন্দে করতে এসেছিলো—দাঁড়াও, আই স্যাল হিট হিম উইথ মাই শ্যুজ! কি করেছেন উনি! বেড়ালের ভাগ্যে একবার শিকে ছিঁড়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন! ব্লাডি সোয়াইন—

হৈমন্তী বাধা দিয়ে বললো, না না, নিন্দে উনি কিছু করেন নি—

আবার কি করবে? ডার্টি স্নিক! তোমাকে আমাদের ইউনিট থেকে ভাগিয়ে নিজের ইউনিটে নিয়ে যেতে এসেছিলো—

সেকথা উনি কিন্তু কিছু বলেন নি—

এ আবার বলাবলি কী? হি অলওয়েজ মুভস্ ইন হিজ্ ওন ইন্টারেষ্ট। ওকে এ ষ্টুডিও থেকে না তাড়াতে পারলে আমার নাম চৈতন্য গড়াই নয়। দেয়ার স্যুড বি এ লিমিট অব এভরিথিং। আজকালকার যুগে খেঁটে শাড়ি পরে কে ওর ইউনিটে মিনমিনে গাঁয়ের বধূর পার্ট করতে যাবে? আমাদের ওপর রাস্কেলের রাগ হলো সেই জন্যে। কেননা বড়ো বড়ো ঘরের

লেখাপড়া জানা সব আধুনিক মেয়েরা আগে আমাদের কাছেই আসে। তারা কেউ সোয়াইন বিজয় সেনকে গ্রাহ্য করে না।

এরপর ষ্টুডিওতে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড হলো! চৈতন্য দৌড়ে গিয়ে ধরলো বিজয় সেনকে। গালাগাল তর্কাতর্কি—প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না। শেষে আর পাঁচজন ব্যাপারটা মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করে। হৈমন্তী লজ্জায় কাঠ হয়ে একদিকে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলো। সে যে এই গোলমালের মূল কারণ সেকথা ভেবে খুব খারাপ লাগছিলো তার। এবং এই ঘটনার পর থেকেই বিজয় সেন তাকে একেবারে এড়িয়ে চলে আর চৈতন্য স্যুটিং-এর সময় তার ফ্লোরে গেলে চিৎকার করে বেরিয়ে যেতে বলে। যাহোক হৈমন্তী অগত্যা এই ভেবে সান্ত্বনা পেলো যে একদিন বিজয় সেনের কাছে ক্ষমা চেয়ে সে তাকে ভালো করে সব কথা বুঝিয়ে বলবে। কেন না তাকে নিয়ে ফিলিম ওয়ার্ল্ডে কারুর সংগে কারুর কোনোরকম গোলমাল হয় তা সে কিছুতেই চায় না। সেটা তার কাছে যেমনি দুঃখের তেমনি লজ্জার।

বিজয় সেনের ফ্লোরের সামনে কয়েক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে আজ অনেক দিন পর হৈমন্তীর আবার এসব কথা মনে পড়লো। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করছে বিজয় সেন। আর মাস খানেকের মধ্যে তার নতুন ছবি মুক্তি পাবে। এ ছবির নাম “নন্দন চর”। জেলেদের সুখ দুঃখ প্রেম নৈরাশ্যের কাহিনী। গামছা পরা জেলেদের কালো কালো চেহারার কথা ভাবলে গা ঘিনঘিন করে ওঠে হৈমন্তীর। ওসব জিনিস রূপালি পর্দায় দর্শক সাধারণ যে খুব আগ্রহ নিয়ে দেখবে না সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাই সে ভেবে পায় না কেন বিজয় সেন ওই সব নোংরা লোকের ব্যাপার নিয়ে ছবি করছে। তার চেয়ে “অপবাদ” অনেক ভালো। বড়ো লোকের একমাত্র মেয়ের কাহিনী। সে নিজে মোটর চালায়, গুলি ছোঁড়ে, বাড়ির বাগানের গাছ থেকে ফুল পেড়ে মাথায় পরে ঘন ঘন গান গায়। তার বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামীও খুব বড়োলোক। কিন্তু হলে হবে কি, মেয়েটি আবার প্রেমে পড়লো। খবর পেয়ে স্বামী সুইসাইড করলো। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে কী অপূর্ব গান গাইলো। আর সেটও তৈরী করা হয়েছে সুন্দর। বাড়ির সিঁড়িগুলি দেখলে দর্শকের

মাথা ঘুরে যাবে। দশ হাজার টাকা নাকি শুধু ওই সিঁড়ির সেট তৈরী করতে লেগেছে। হৈমন্তী হয়েছে নায়িকার কলেজে পড়া বান্ধবী। সে স্ল্যাকস্ পরে খেলার মাঠে গিয়ে স্যাণ্ডউইচ খায়, বন্ধু বান্ধবের বাগান বাড়িতে মুন লাইট পিকনিক করে আর থেকে থেকে রবীন্দ্র সংগীত গায়। গল্পের শেষ এখনও ঠিক হয় নি কিন্তু স্যুটিং আরম্ভ হয়ে গেছে। ছবি শেষ হতে দেরি হবে। চৈতন্য বলে, ক্লাস জিনিস করতে গেলে নাকি সব সময় দেরি হয়ই। যা হোক হৈমন্তীর দৃঢ় বিশ্বাস এ ছবি মুক্তি পেলে হৈ হৈ পড়ে যাবে। বিজয় সেনের চেয়ে চৈতন্যর অনেক বেশি নাম হবে। হৈমন্তীর তো হবেই। সে অধীর আগ্রহে শুধু "অপবাদ" শেষ হবার অপেক্ষা করে।

বিজয় সেন গ্রাহ্য করে না চৈতন্যর ফ্লোরে কি হচ্ছে না হচ্ছে, কিন্তু চৈতন্য ছল ছুতো করে প্রায়ই বিজয় সেনের ছবির খবর নেয়। এবার দু'জনের মধ্যে প্রবল-প্রতিযোগিতা হবে। যার ছবি হিট্ হবে সেই এ কোম্পানীর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালকের আসন পাবে।

হৈমন্তী বিজয় সেনের ফ্লোরের কাছাকাছি চৈতন্যকে দেখতে পেলো না। একটু দূরে দেখলো মিনতির সংগে কথা বলতে বলতে হেরম্ব দত্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরও একটু দূরে চৈতন্যকে দেখা গেল। সে-হাত পা নেড়ে ষ্টুডিওর ম্যানেজার অধীর বাবুকে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে। যাক, হৈমন্তী স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো, আবার নতুন করে বিজয় সেনের সংগে সে কোনো গোলমাল করে নি।

হৈমন্তী দু' এক পা এগিয়ে যেতেই একটি মোটা সোটা গোলগাল মেয়ে এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে হাত ধরে হাসলো, হি হি হি, আমার নাম বোধনা, হি হি হি—

ও, হৈমন্তী জিজ্ঞেস করলো, আপনি কার ইউনিটে কাজ করেন?

সে আবার কী? হি হি হি, কোথাও কাজ নেই, কাজ খুঁজতে তো অনেকবার এলাম। হুলো বাবু বলেছে শিগগিরই কাজ পাইয়ে দেবে, হি হি হি—

হুলো বাবুর নাম শুনে হৈমন্তী মনে মনে হাসলো। সে এই ষ্টুডিওর একজন সাধারণ টেকনিসিয়ান। সে কিছুতেই এখানে বোধনার কাজ করে দিতে

পারবে না। বোধনার দিকে তাকিয়ে দেখে হৈমন্তীর তাকে মন্দ লাগলো না।
কী ধরনের কাজ আপনি চান?
কুষ্ঠিতে লেখা আছে আমি ষ্টার হবো. হি হি হি, আপনি আমাকে আপনি বলে কথা বলবেন না। আমি সব দিক থেকে আপনার চেয়ে অনেক ছোটো—
মনে মনে খুশী হয়ে হৈমন্তী বললো, থিয়েটার-টিয়েটার করেছো কখনও?
না, বললাম যে কুষ্ঠীতে করবো বলে লেখা আছে। তা, হি হি হি, আপনি তো খুব বড়ো ষ্টার, আমার দিদি। আমার একটা গতি করে দিন না কোনোরকমে—
একটু কথা বলে দেখি—
হি হি হি, কথা আবার কী? আপনার কথায় তো প্রিমিয়ার পিকচার্সের কেষ্ট-বিষ্টুরা ওঠে বসে।
তাই নাকি? হেসে হৈমন্তী বললো, কেমন করে জানলে?
এ খবর আর কে না জানে, একটু থেমে হৈমন্তীর আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বোধনা জিজ্ঞেস করলো, আপনার কী গণ হৈমন্তীদি?
কী বললে?
আপনার কী রাক্ষস গণ?
হাসি চেপে হৈমন্তী বললো, তা তো ঠিক মনে নেই। তুমি বুঝি খুব কুষ্ঠী মানো?
হ্যাঁ, বাবা পুরুত কি-না—
ছবিতে নামলে উনি কিছু বলবেন না?
বলবেন আবার কী? উনিই তো নামতে বললেন। কুষ্ঠীতে লেখা আছে যে, হি হি হি—
বেশ বেশ, বোধনাকে আশ্বাস দিয়ে হৈমন্তী বললো, আমি তোমার জন্যে খুব চেষ্টা করবো।
তবে আর আমার ষ্টার হওয়া আটকায় কে? একটা চান্স পেলে মাইরি বলছি আমি প্রাণ দিয়ে অভিনয় করবো হৈমন্তীদি—
একদিন সন্ধ্যে বেলা আমাদের বাড়িতে এসো, ফিলিমের বড়ো বড়ো লোকদের সংগে তোমার আলাপ করিয়ে দেবো।

আজই সংগে করে নিয়ে চলুন না, আর যে দেরি সয় না, কবে যে কাগজে ছবি বেরুবে—

বেশ আজই চলো, কখন ফিরবো জানি না কিন্তু, তোমার কোনো অসুবিধা হবে না তো ?

অসুবিধা আবার কি ? হি হি হি, হঠাৎ হৈমন্তীকে জড়িয়ে ধরে বোধনা বললো, আমার চোদ্দপুরুষের ভাগ্য যে তোমার সংগে এক গাড়িতে যেতে পারবো—

হৈমন্তী অপ্রস্তুত হয়ে বোধনার বাঁধন ছাড়াতে ছাড়াতে বললো, আঃ ছাড়ো ছাড়ো, তুমি দেখছি বড়ো ছেলেমানুষ।

হি হি হি, ছেলেমানুষ সেজে থাকি, গত আষাঢ়ে বয়স বাইশ পেরিয়ে গেছে।

বিয়ে করে ছবিতে নামলে আরও ভালো হতো না বোধনা ?

দূর, কারোর সেবা করার ঝক্কি পোয়াতে পারবো না মাইরি, হি হি হি, এই বেশ আছি, হৈমন্তীর কানের কাছে মুখ এনে বোধনা বললো, একবার ফিলিমের ষ্টার হলে কত—কেল পায়ে পড়ে গোঙাবে আর আমি সব ক'টাকে বোকা বানিয়ে শুধু হাসবো হি হি হি, কুষ্ঠীতে সব কথা লেখা আছে মাইরি। আমার রাক্ষস গণ—

বোধনার কথা শুনে হৈমন্তীর হাসি পেলো। বাইশ বছর বয়স হলেও সে মনে মনে একেবারে ছেলেমানুষ। যাহোক, তার জন্যে চৈতন্য আর হেরম্বকে বলতেই হবে। কেন না বোধনা প্রথম মানুষ যে হৈমন্তীকে মুরুব্বি পাকড়ালো। কাজ পাইয়ে দেবার জন্যে এর আগে এমন করে কেউ তাকে অনুরোধ করে নি। এ ষ্টুডিওতে সত্যিই যে হৈমন্তীর প্রবল প্রতাপ সে কথা প্রমাণ করবার জন্যে যেমন করে হোক বোধনাকে প্রিমিয়ার পিকচার্সের ছবিতে নামবার ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। হৈমন্তী ঠিক করলো আজ সন্ধ্যায় তার বাড়িতে বোধনার সামনেই সে ওদের সংগে এ বিষয়ে কথা বলবে, যেন মেয়েটা তাড়াতাড়ি একটা চান্স পায়।

তবে বোধনাকে অনেক কিছু শেখাতে হবে। কথা শুনে মনে হয় মেয়েটা লেখা পড়া একেবারেই জানে না। তা না জানুক ক্ষতি নেই, হৈমন্তী নিজেই বা কতটুকু জানে! কিন্তু ওর কথা বলবার ধরন বড়ো অমার্জিত। ওসব

সংশোধন করতে হবে। কুষ্টী, মাইরি, হি হি হি—এসব অমার্জিত ভঙ্গি ছাড়াতে হবে। হৈমন্তী কিছুদিন আগে থেকে একটা ছাত্রীর অভাব বোধ করছিলো। আজকাল হেরম্ব চৈতন্যকে দেখে তার প্রায়ই গুরুগিরি করবার সাধ জাগে। এখন বোধনাকে পেয়ে তার সে অভাব মিটলো। একে সহজে ছাড়া হবে না। মানুষ চিনতে হৈমন্তীর আজকাল খুব বেশি দেরি হয় না, বোধনাকে দেখেই সে বুঝতে পেরেছে যে একে যা শেখাবে তাই শিখবে, যা বোঝাবে তাই বুঝবে। মানে হৈমন্তীকে অমান্য করবার মতো বুদ্ধি হাজার ঘষা মাজা করলেও এর কোনোদিনও হবে না।

হৈমন্তী দেখতে পেলো মিনতি হেরম্ব আর চৈতন্য তাদের দিকে এগিয়ে আসছে; কি কথা বলছে মিনতি এতক্ষণ ওদের সংগে? আবার কি পুরোনো প্রেম ঝালাই করবার মতলবে আছে নাকি?

যাক তাহলে শেষ অবধি আজও স্যুটিং হলো না। আজ হৈমন্তীর-ভালো ভালো শট নেবার কথা ছিলো। অনেকক্ষণ থেকে মেক আপ করে সে বসে আছে। কিন্তু প্রথমেই যা মাথা গরম হয়ে গেল চৈতন্যর যে আজ আর কাজ করবার মুড রইলো না। এমন মাথা গরম চৈতন্যর প্রায়ই হয়। সেদিন আর কাজকর্ম কিছুই হয় না, হৈ হৈ করে কাটে। প্রডিউসার অনেকদিন চুপ করে ছিলেন, এখন খরচ বড়ো বেশি গায়ে লাগছে বলে সম্প্রতি মুখ খুলেছেন। এই কিছুদিন আগে চৈতন্য আর হেরম্বকে ডেকে বেশ কড়াভাবে বলেছেন যে, একটি ছবির জন্যে ষাট দিনের বেশি কারোর স্যুটিং করা চলবে না। চৈতন্য একটি ছবির জন্যে একশো—একশো পঁচিশ দিন কিংবা আরও বেশি লাগাচ্ছে এর জন্যে তিনি মোটেই সন্তুষ্ট নন। কথা শুনে চৈতন্য হাউ হাউ করে কি বলতে চাচ্ছিলো কিন্তু হেরম্ব তাকে হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে এসে বললো, উনি কিছুই ভুল বলেন নি, খুব সাবধান, খারাপ সময় আসছে। যদি কিছু করতে চাও তাহলে "অপবাদ" তাড়াতাড়ি শেষ করে বাহাদুরী নাও। মুখে বাজি মাৎ করে প্রডিউসারের কাছে আর আমাদের সুবিধা হবে না—কাজেই খুব সাবধান!

হেরম্ব বাবু, সিগ্রেটের নতুন প্যাকেট খুলতে খুলতে চৈতন্য চিৎকার করে উঠলো, হোয়াই ডু ইউ কেয়ার সো মাচ্ ফর এ ম্যান লাইক হিম?

আরে বাপু, কেয়ার না করে উপায় আছে নাকি ? বাজারের অবস্থা তো জানো দাদা আছো নিজের কল্পনার রাজ্যে—

আপনার এই ধরনের কথাগুলো আমার ভালো লাগে না হেরম্ব বাবু। ডোণ্ট ইউ নো হাউ উই মেটার ইন দি ইণ্ডাষ্ট্রি অ্যাট দি মোমেণ্ট ?

মাথা চুলকে হেরম্ব দত্ত বললো, আস্তে আস্তে, ওসব কথা চেঁচিয়ে বলো না, প্রডিউসারের কানে গেলে চাকরি যাবে—

দুত্তোর চাকরি ! আপনার ভাবনাটা কি শুনি ? লাখটাকা দিয়ে সেদিন বাড়ি কিনলেন, প্রত্যেক মাসে ভাল ভাল সোনা কিনছেন—

আরে চুপ চুপ, কি যা-তা বলো, পাছে চৈতন্য ধার চেয়ে বসে এই ভয়ে ঘাবড়ে গিয়ে হেরম্ব বললো, কোথায় পয়সা ! যা বাজার পড়েছে, কেমন করে এত বড়ো সংসার চালাবো তাই ভাবছি—

বিরক্ত হয়ে চৈতন্য বললো, আজে বাজে ভাবনা নিয়ে আপনি একটু বেশি মাথা ঘামান—

তাই তো ভালো, হেরম্ব দত্ত হেসে বললো, তোমার মতো বাউণ্ডুলে হয়ে কাটালে আমার চলে না। বিয়ে থা করেছি, বড়ো বড়ো ছেলে আছে, ঘর সংসার করতে হয় তো—

সে তো সবাই করে। কিন্তু আপনি লোককে বড়ো বেশি ছোটো মনে করেন। আমরা কি যে সে লোক নাকি যে ওই মিস্তিরিদের মতো প্রডিউসারের ভয়ে মুখ বুজে থাকবো ?

তা নয়, তবে বিজয় সেন—

ও লোকটার নাম করবেন না, তাকে আপনি বড়ো বেশি ইমপর্টেন্স দেন হেরম্ব বাবু—

প্রডিউসারকে ও হাত করে নিলো যে ? তোমার তো ছাই বোল চালই সার, এখনও কিছুই করতে পারলে না।

ওয়েট এণ্ড সী, প্রচুর সময় না নিয়ে আমি কোনো কাজ করি না। "অপবাদ" শেষ হলে আমিও দেখবো প্রডিউসারকে বিজয় ব্লাডি কেমন হাতে ধরে রাখে।

মুচকি হেসে হেরম্ব বললো, শেষ করবার লক্ষণ তো কিছুই দেখাচ্ছো না, আগে "অপবাদ" শেষ কর, তারপর কথা হবে।

আমি হুট হাট যা-তা কাজ করে একটা চিপ্ ষ্টান্ট্ দিতে চাই না—
কিন্তু কিছুই যে দিচ্ছো না বাপু। ছবিটা যাতে সত্যি ভালো ভাবে শেষ হয় তার চেষ্টা করো, ওই যে, তাকিয়ে দেখ বিজয় সেন কী পরিশ্রম করছে—
মুখ দেখতে চাই না লোকটার, বিজয় সেনের নাম শুনে চৈতন্য রেগে সেখান থেকে চলে গেল।

আজকাল বিজয় সেনের সত্যি যেন নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। সে মনে করে যে কাজে ফাঁকি দিলে তার নিজেরই ক্ষতি। আজ ছায়াচিত্র শিল্পের এই দারুন দুঃসময়ে যখন তাকে সাহায্য করবার কেউ নেই তখন একাই প্রাণপণে খাটতে হবে। বিজয় সেন এই শিল্পের বর্তমান স্থূলভ রূপ পাল্টে দিতে চায়। কিন্তু এই শিল্পে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ কম। তাকে অনেক কষ্টে নিজের আদর্শ বজায় রাখতে হচ্ছে। যদি দ্বিতীয় ছবি ভালো না চলে তাহলে সে কি করবে জানে না। কেউ হয়তো আর তাকে দিয়ে ছবি করাতে চাইবে না। তবে বিজয় সেনের নিজের ওপর কেমন একটা অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস আছে। সে জানে তার কোনো ছবি দর্শক সাধারণের বিচারে একেবারে বাতিল হয়ে যাবে না। তার সমসাময়িক চিত্র-পরিচালকরা, দর্শকরা কি চায়, তারা কি ভালোবাসে তা নিয়ে বড়ো বেশি মাথা ঘামায় আর চেষ্টা করে কেমন করে তাদের খুশী করা যায়। কটা নাচ থাকলে তারা বারবার দেখতে আসবে, নায়িকা বুকের কাপড় কতখানি সরালে পরিচালকের প্রশংসা করবে আর কেমন গল্প তারা ভালোবাসতে পারে—এই ভাবনায় অন্যান্য পরিচালকরা ছবি করবার সময় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বোধহয় একমাত্র বিজয় সেনের ভাবনা একেবারে অন্যরকম। দর্শকরা কেমন ছবি ভালোবাসে সেকথা সে খুব বেশি ভাবে না, সে ভাবে কোন ধরনের ছবি তাদের ভালো লাগা উচিত। দর্শকদের বর্তমান রুচির কথা সে জানে আর ভাবে কেমন করে তাদের রুচি বদলে দেয়া যায়। অনেকে তাকে বলে, আপনি ওইসব নানা রকম ছবি করতে পারেন কিন্তু লোকে তা না নিলে কী করবেন ?
বিজয় সেনকে এমন অনেক কথা নানা লোকের মুখে শুনতে হয়। কিন্তু "সংগ্রামের পরে" মুক্তি পাবার পর সে আর তাদের কথা গ্রাহ্য করে না। আজকাল সে বিশ্বাস করে যে ভালো জিনিস পেলে লোকে তা নেবেই।

রুচির সংগে তাল মিলিয়ে সুলভ জিনিস দেবার ঘৃণ্য চেষ্টা না করে সারা দিনরাত পরিশ্রম করে যদি দর্শকের রুচি ফেরাবার চেষ্টা করা যায় তাহলে সার্থক হয় একজন বুদ্ধিমান পরিচালকের পরিশ্রম।

কিন্তু মাঝখানে অনেকটা খাদ। একাজ একেবারেই সোজা নয়। "সংগ্রামের পরে" ছবি করবার আগে তাকে চোরের মতো প্রডিউসারের দেখা পাবার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছে। ষ্টুডিওতে বিজয় সেন তখন ক্ষিতীন ঘোষের সহকারী। কাজেই হঠাৎ স্বাধীনভাবে ছবি পরিচালনা করার ভার পাওয়া তার পক্ষে সোজা নয়। কিন্তু কপাল ভালো ছিল তার। ক্ষিতিন ঘোষ পি. পি. ছেড়ে অন্য কোম্পানীতে বেশি মাইনের চাকরি নিয়ে চলে যায়। প্রথমে বিজয় সেন ভেবেছিলো তারও চাকরি নিয়ে এবার বোধহয় টানাটানি হবে। কেন না যার অধীনে সে কাজ করতো, বেশি টাকার লোভে সে অন্য জায়গায় চলে গেছে, একথা মনে করে প্রডিউসার হয়তো তার ওপর অসন্তুষ্ট হতে পারেন। কিন্তু শেষ অবধি তা হলো না। একদিন প্রডিউসার তাকে ডেকে বললেন, এবার একটা গল্প ঠিক করে ফ্লোরে নামুন. আপনার ওপর আমার অনেক আশা মিষ্টার সেন। আপনি নিজে এবার একটা ছবি তৈরী করুন। কথা শুনে আনন্দে বিজয় সেনের দিশা হারিয়ে যাবার উপক্রম হলো। একমাত্র এই কারণের জন্যে সে পি. পি-তে পড়ে আছে। প্রডিউসারের মতো লোক হয় না। তিনি জানেন, কার মধ্যে কি আছে এবং যথাসময়ে যোগ্য লোকের ওপর কঠিন দায়িত্ব দিয়ে বসেন।

কিন্তু এ খবর প্রকাশিত হবার সংগে সংগে সারা ষ্টুডিওতে একটা বিশ্রী রকম হৈ হৈ পড়ে গেল। আরও অনেকে বিজয় সেনের চেয়ে অনেক আগে থেকে সহকারীর কাজ করছে কিন্তু তাদের কেন সুযোগ দিলেন না প্রডিউসার। চতুর্দিকে কলরব গুঞ্জন, নানা কথা শোনা গেল।

হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, চৈতন্য গড়াই হেসে বললো, প্রডিউসার ইজ ক্রেজি। ইজ ইনট্ হি হেরম্ব বাবু ?

হেরম্ব দত্ত গভীর জলের মাছ। চৈতন্যর মতো দুমদাম বেফাঁস কথা বলা তার অভ্যাস নয়। সে স্বাভাবিক স্বরে বললো, তাঁর ষ্টুডিও, তিনি যা খুশি তাই করবেন, তা'তে তোমার আমার কী ?

না না, মানে পি. পি-র যাতে নাম খারাপ না হয় সেটা আমাদের দেখা দরকার—

সেটা প্রডিউসার বুঝবেন।

তিনি অনেক সময় অনেক কিছু বোঝেন না, হেরম্ব দত্তকে আর কথা বলবার অবসর না দিয়ে চৈতন্য সটান বিজয় সেনকে খুঁজে বের করলো।

এই যে, আই আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড ছাট ইউ আর গোয়িং ট ডাইরেক্ট এ পিকচার—

বিজয় সেন মাথা নেড়ে বললো, হ্যাঁ।

মানে, ইফ ইউ ওযান্ট টু প্রডিউস এ গুড পিকচার—

বাধা দিয়ে বিজয় সেন বললো, আমার গল্প একেবারে অন্য রকম আর আমি কারোর উপদেশ পছন্দ করি না—

কিন্তু আমি আপনার চেয়ে অনেক সিনিয়ার—

আপনি শুধু বয়সেই আমার চেয়ে বড়ো আর কিছু তো নয়—

লুক হিয়ার মিষ্টার সেন—

আমি এখন ব্যস্ত আর আপনি এভাবে যখন তখন এসে আমাকে যা-তা কথা বলবার চেষ্টা করবেন না। আপনারা এতদিন যা করেছেন, এখন যা করছেন, ভবিষ্যতে যা করবেন ভাবছেন—আমার সেসব কিছুই ভালো লাগে না।

বিজয় সেনের কথা শুনে চৈতন্য অবাক হয়ে গিয়েছিলো। সে ভাবতে পারে নি তার মুখের ওপর এমন কথা এ ষ্টুডিওর কেউ বলতে পারে। চিৎকার করে সে কি বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু তাকিয়ে দেখলো বিজয় সেন সেখান থেকে চলে গেছে।

কাজেই "সংগ্রামের পরে" আরম্ভ হবার অনেক আগে থেকেই বিজয় সেন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলো যে তাদের সংগে তার কোনো কিছুর সামান্য মিল নেই।

বস্তুত, চৈতন্য হেরম্ব কিংবা তাদের মত পরিচালকবৃন্দের ওপর বিজয় সেনের বিজাতীয় ঘৃণা ছিলো। এরা ছায়াচিত্র শিল্পের যতো ক্ষতি করা সম্ভব ততো ক্ষতি করেছে। শিক্ষার এত বড়ো মাধ্যম নিয়ে ছেলেখেলা করেছে। শুধু তাই নয়, আরও দুঃখের কথা হলো এই যে, এদের দেখে লোকে এই শিল্পের অন্যান্য লোককেও বিচার করে।

অথচ এরা কেউই শিল্পী মন নিয়ে এই শিল্পের কাজে যোগ দেয় নি। এখানে কাজ করতে আসবার আগে এদের উদ্দেশ্য ছিলো অন্য। এদের শুধু ফুর্তি করে দিন কাটাবার ইচ্ছে ছিলো। পরে অবশ্য তারা এই শিল্পকে ভালো বেসেছিলো—ছায়াচিত্রকে উন্নতি করবার জন্য নয়, মেয়েদের সংগ খুব সহজে পাওয়া যায় বলে। তাই তাদের সংগে খাঁটি বাংলার কী, ভারতবর্ষের সমাজের কোনে যোগ ছিলো না আর সেই কারণে তাদের ছবি হতো অবাস্তব অবিশ্বাস্য হাস্যকর। তাদের ছবি দেখতে দেখতে জনসাধারণ ধরে নিয়েছিলো, ফিলিম এই রকমই হয় আর ফিলিমের গল্প বললেই লোকে ভাবতো, কয়েকটা গান থাকবে, আজে বাজে হৈ হল্লা থাকবে, সময়ে-অসময়ে হঠাৎ নায়ক-নায়িকারা বড়ো বড়ো কথা বলবে। বাংলা ছবিও যে সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে হতে পারে সেকথা লোকে ভাবতে পারতো না।

এইসব ভাবনা নিরন্তর বিজয় সেনকে পীড়া দিতো। কিন্তু কিছু করবার উপায় ছিলো না তার। ছায়াচিত্র শিল্পে খুব সম্প্রতি সে কাজ করতে ঢুকেছে, কে তাকে পরিচালনার গুরুভার এককথায় দেবে। ক্ষিতীন ঘোষ, যানে যার সহকারী হয়ে বিজয় সেন কাজ করতো, সেও ওদের দলের লোক। বিজয় সেনের ভাবনা কিছুতেই তার মাথায় ঢুকতো না। আর না বললেও চলে যে সে বুঝতে পেরেছিলো ক্ষিতীন ঘোষ তার ভাবনা ধরতে পারলেও কোনো ফল হতো না কেন না ওরা সকলেই এক ধাতুতে গড়া। বলা বাহুল্য, অত্যন্ত অস্বস্তিতে বিজয় সেনের দিন কাটছিলো।

তবু হীন পরিবেশে থেকেও সে চেয়েছিলো ছায়াচিত্রের মুক্তি। যেমন করে হোক সাধারণের ধারণা বদলে দিতে হবে। লোকে একদিন নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে যে ছায়াছিত্রের সংগে তাদেরও নাড়ীর যোগ আছে। এই শক্তিমান মাধ্যমকে প্রাণপণে কাজে লাগাবে বিজয় সেন। সে একদিন প্রমাণ করে দেবে যে ছায়াচিত্র মানুষের কত কাজে লাগতে পারে। বর্তমান সমাজের আসল ছবি দর্শকের সামনে তুলে ধরে তাদের যদি শোষণ বঞ্চনা আর নীচুস্তরের নিরীহ মানুষের জ্বালা যন্ত্রণার ইতিহাস দেখানো যায় তাহ'লে দেশের লোক বুঝতে পারবে যে রূপালি পর্দার সাহায্যে কত সহজে মানুষকে সমাজ-সচেতন করে দেয়া যায়।

তাই সুযোগ হবার পর বিজয় সেন তার মনের মতো ছবি তোলা শুরু করেছিলো আর আস্তে আস্তে তার অনেক ভুল ধারণা ভেঙে গেল। কঠিন ধাক্কা খেলো সে। আর কেউ তাকে সাহায্য না করুক, সে ভেবেছিলো অন্তত নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাকে মনপ্রাণ দিয়ে সাহায্য করবে। কিন্তু তারা কাহিনী শুনে মুখ বেঁকিয়ে হেসে বলেছিলো, অমন ভূমিকায় আমরা অভিনয় করবো কেমন করে? আপনি নতুন কাউকে দেখুন।

অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও আজ যেন অন্য সমাজের মানুষ। বাস্তব সমাজের মানুষের কথা ভাবতে তাদের লজ্জা করে। তাই ছবিতে অভিনয় করবার সময় তারা মোটর চালাতে ভালোবাসে, স্যুট পরে ডিনার খায়, সুইমিং কস্টুম পরে নায়িকার সংগে লেকে সাঁতার কাটতে পেলে খুশী হয়। বিজয় সেন আশ্চর্য হয়ে ভাবে যে যারা শিল্পী বলে নিজেদের পরিচয় দেয় সেই অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও আজ ভুলে গেছে যে ছবির নায়ক ট্রামে বাসে চড়তে পারে, তার স্ত্রী উপোস করে দিন কাটাতে পারে কিংবা দারিদ্র্যের জ্বালায় তাদেরও জ্বলতে হয়।

"সংগ্রামের পরে" করবার আগে বিজয় সেন পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে নিলো। যখন সে বুঝতে পারলো যে কারোর কাছ থেকে কোনো রকম সাহায্য পাওয়া যাবে না, তখন সে শুধু নিজের মনের জোরের ওপর ভরসা করে একেবারে নতুন দল নিয়ে কাজ আরম্ভ করলো।

অস্বস্তি ভয় উত্তেজনা আর বিরূপ সমালোচনার মধ্যে দিয়ে প্রথম ছবির কাজ শেষ করলো বিজয় সেন। সব চেয়ে আনন্দের কথা এই যে, আশাতিরিক্ত পুরস্কার পেলো সে আপামর জনসাধারণের কাছ থেকে। তবু আরও অনেক কথা বলা বাকী আছে তার।

"নন্দন চরে" লোককে সে বাংলার শ্বাশত বাণী জানাবার চেষ্টা করবে জেলেদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে দিয়ে। নদী মেখলা বাংলা দেশ। অথচ বিজয় সেন আশ্চর্য হয়ে ভাবে কোনো বাংলা ছবিতে আজও কোনো পরিচালক নদীর আশে-পাশে যারা পর্ণ কুটীর বেঁধে বাস করে সেই সব ভাঙা-চোরা মানুষ দেখাবার চেষ্টা করা দূরের কথা, তাদের কথা ভেবে দেখবারও অবসর পায় নি।

মনে মনে একবার হাসলো বিজয় সেন। একেবারে শুরুতে এ লাইনের যে

মাতব্বররা তার ক্ষতি করবার চেষ্টা করেছিলো তাদের প্রতিশোধ দেবার সামান্য চেষ্টাও করবে না বিজয় সেন; কিন্তু সে নিশ্চিত জানে, ছায়াশিল্পে যে সমাজ-সচেতনতার যুগ অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে তার তীব্র আলোয় এদের চোখ ঝলসে যাবে—এরা পালাতে পথ পাবে না। তারা সরে যাবে, মরে যাবে, খেতে না পেয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে শেষ হ'য়ে যাবে। অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো না বলে যে সব মূর্খ অশিক্ষিত লম্পটরা ছায়াচিত্র শিল্পের এত বড়ো অধঃপতন এনেছে, সমাজ তাদের কঠিন শাস্তি দেবেই। এত বড়ো মাধ্যম নিয়ে যারা এতদিন শুধু নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে সমাজে বিষ ছড়িয়ে এসেছে, পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো সমাজ কোনোদিনও তাদের ক্ষমা করে নি। বাংলা ছায়াচিত্র শিল্পে আজ নতুন যুগ এসে গেল। সে-যুগে তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

কিন্তু বাংলা দেশে এই নতুন যুগের সংকেত সর্ব প্রথম বহন করে আনলো কে? বিজয় সেনের সারা শরীরে যেন উত্তেজনার ঢেউ বয়ে যায়।

থ্রী-ডাইমেনসেন

হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে তুলতুল বক্সির স্বামী ব্যারিষ্টার অম্বর বক্সির সাড়ে সাতশো টাকার ফ্ল্যাট। সংসারে মূল্যবান সরঞ্জামের অভাব নেই। ভ্যানগার্ড সেলুন গাড়ি, রেফ্রিজারেটার, ঘরে ঘরে কার্পেট, সব চেয়ে দামী রেডিওগ্রাম, দুটো গ্রেটডেন কুকুর, বয় বেয়ারা বাবুর্চি ড্রাইভার—মোট কথা বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় কোথাও অভাবের ছায়ামাত্র নেই।

কিন্তু তবু খরচে টান পড়ে মাঝে মাঝে। অম্বর বক্সির যতোই রোজগার হোক, ঠিক সেই পরিমাণে খরচের হারও বেড়ে যায়। এত বড়ো সংসারের খরচ অনেক। তাছাড়া ঘরে বাইরে পার্টি ডিনার ককটেইল নাইটক্লাবের চাঁদা—এসব তো আছেই।

স্বামীকে একটু বেশি ভালো লাগে তুলতুলের। ছোটো ব্যাপার নিয়ে সে কোনোদিনও গোলমাল করে না। স্ত্রী কার-দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো কিংবা এক্সটেসি ক্লাবে ওল্ড স্কচের ঘোরে কার ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকালো—এসব ছোটোখাটো ব্যাপার অম্বর বক্সির চোখে পড়ে না। আর চোখে পড়লেও সে মনে করে, বয়সের ধর্ম তো এমনি হবেই, এই তো জীবন। সে তখন দিল্লী থেকে নতুন আসা অনীতা মিত্রের দিকে তাকিয়ে ভাবে, একে নিয়ে একদিন দমদমে শিবেন বটব্যালের বাগান বাড়িতে মুনলাইট পিকনিক করলে মন্দ হয় না। আসলে আগে বক্সির চোখ ছিলো মীনা হালদারের ওপর। কিন্তু ওখানে শিবেন জমি প্রস্তুত করে নিয়েছে, কাজেই আর সুবিধা হবে না। দামী সিগারে টান মেরে অনেকক্ষণ এক্সটেসি ক্লাবে গিয়ে চুপ করে সে বসে থাকে। আর নানা কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মেজাজ বিগড়ে যায়।

অম্বর বক্সির চেহারা খুব ভালো নয়। নাকটা তার শরীরের সমস্ত সৌন্দর্য মাটি করে দিয়েছে। ইহুদীদের মতো চোখা লম্বা নাক। মাথার সামনের দিকে টাক

পড়তে আরম্ভ করেছে। আর সব চেয়ে বড় অসুবিধা হলো যে তাকে বয়সের চেয়ে অনেক বেশি বড়ো দেখায়। তাই তার কাছে চট করে কেউ ঘেঁষতে চায় না। সব ইয়ং লেডিরা ছেলে ছোকরাদের ঘিরে সোহাগ করবার চেষ্টা করে। সেসব দেখে এক কোণায় একা বসে মনে মনে জ্বলে যায় অম্বর বক্সি। যারা তাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দেখে কাছে এসে প্রায় গায়ে ঢলে পড়ে জিজ্ঞেস করে, হ্যালো, ফিলিং লোনলি? তাদের মুখে বিয়ারের গন্ধ, তাদের অঙ্গভঙ্গি শ্লথ, তারা পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু। তাদের সহ্য করতে পারে না হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের ধনী ব্যারিষ্টার।

কিন্তু তুলতুলের কোনো অসুবিধা হয় না। নানা বয়সের নানা ধরনের লোক তাকে ঘিরে বসে থাকে। তার চেহারা খুব ভালো। আশ্চর্য টানা টানা চোখ, ফর্সা রঙ, যৌবনের দীপ্তি অঙ্গ-ফুটে বেরোয়। ভক্তদের হাসি বিলোতে তুলতুল বক্সি অদ্বিতীয়া। এপাশে কোনো বড়ো ষ্টেটের ছোটো কুমার, ওপাশে নাম করা কোম্পানীর বড়ো সাহেব, সামনে বুড়ো সিভিলিয়ান, পেছনে নেভেল কিংবা মিলিটারি অফিসার—এদের নিয়ে তুলতুল বক্সি এক্সটেসি ক্লাব মাতিয়ে রাখে। বাঁ হাতে ষ্টেট এক্সপ্রেস ৯৯৯, ডান হাতে ড্রাই জিনের গ্লাশ। তুলতুলের মনে হয়, এমনি করেই যেন জীবনের প্রত্যেকটি দিন কেটে যায়। নিত্য নতুন লোকের সংগে আলাপ হয়, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ভবিষ্যতে বাইরে কোথাও দেখা হবার বন্দোবস্ত হয়ে যায়। অবশ্য ডাক্তার মহিম উকিল না থাকলে এই স্বামি-স্ত্রী—দু'জনেরই বাইরে বন্ধুবান্ধবের সংগে দেখা করবার খুব অসুবিধা হতো। কারণ জনসাধারণ এদের চেনে। কাজেই বন্ধু নিয়ে গড়ের মাঠে মদ খেয়ে গড়াগড়ি করলে এদের চলে না। এদের যেতে হয় সাধারণের দর্শনের বাইরে। এরা যায় চিড়িয়াখানার কাছে ডাক্তার মহিম উকিলের বাড়ি। যারা সমাজের বড়ো হয়ে ঘন ঘন শেয়াল কুকুরের মতো ছোটো কাজ করে, ডাক্তার মহিম উকিলকে আমল না দিয়ে তাদের উপায় নেই। খবর গোপন রাখবার ব্যাপারে ডাক্তার উকিলের জুড়ি মেলা ভার। তাই এক্সটেসি ক্লাবের সভ্যদের সংগে তার গলায় গলায় ভাব। শুধু অম্বর তুলতুল নয়, মীনা, শিবেন, ঠক্কর, অনীতা—অকাজ করতে যাদের প্রবল বাসনা অথচ দুর্ণামের ভয়, তাদের জন্যে এই সুনামখ্যাত মহিম উকিল।

অন্যান্য দিনের চেয়ে শনিবার রাত্তিরে এক্সটেসি ক্লাবে সব চেয়ে বেশি ভিড় হয়।
শেরি পোর্ট শ্যাম্পেন জিন হুইস্কির বোতল মিনিটে মিনিটে শেষ হয়।
অনেকক্ষণ ধরে নাচের সংগে সংগে প্রলাপ বকা চলে।
আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে বহু লোক সেদিন শুধু ডাক্তার মহিম উকিলের দেখা পাবার জন্যে এখানে আসে। আর ডাক্তার উকিল অন্য যে কোনোদিন এক্সটেসি ক্লাবে আসুক বা না আসুক, শনিবার সন্ধ্যায় আসবেই। সেদিনও এসেছিলো।
মহিম উকিলের যারা শত্রু, তার ওপর তাদের জাতক্রোধ। কেন না তারা কিছুতেই ভেবে পায় না যে কেন একটা বাজে ডাক্তারের কথায় সিভিলিয়ান থেকে আরম্ভ ক'রে সমাজের আরও অনেক বড়ো বড়ো মাথা ওঠে বসে। তার বাড়িতে ঘন ঘন হানা দেয়, তাকে খাতির ক'রে গাড়িতে তুলে এখানে ওখানে নিয়ে যায় আর তার মুখের একটি মাত্র কথায় যাকে তাকে বড়ো- বড়ো চাকরি দিয়ে দেয়। মহিম উকিলের কেন এত প্রতাপ, কেন সমাজের কেষ্ট-বিষ্টুরা তার হাত ধরা সেকথা যে-শত্রুদের অজ্ঞাত, যদি তারা কোনো রকমে একদিন শনিবার রাত্তিরে এক্সটেসি ক্লাবে আসতে পারতো।' তাহলে সে-রহস্য তাদের কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যেতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেইসব লোক এক্সটেসি ক্লাবের ধারে কাছে ঘেঁসতে পারে না। তারা মধ্যবিত্ত। মহিম উকিল তাদের ঈর্ষার পাত্র হতে পারে বটে, কিন্তু তারা তার কৃপার পাত্র।
যাহোক সে শনিবার মহিম উকিল একটু দেরি করে ক্লাবে এলো। বাইরে অন্য কাজ ছিলো তার। কাজ মানে পরের উপকার করা আর কি! তারও আবার মানে আছে। মধ্যবিত্ত পুরুষের উপকার ডাক্তার মহিম উকিল কখনও করে না। কেন না তাদের উপকার করে কোনো লাভ নেই, তাহলে শেষ অবধি সমস্ত ভার তার নিজের ঘাড়ে পড়লেও পড়তে পারে। মেয়েদের বেলায় অবশ্য তার কোনো নিয়ম কানুন নেই। প্রোলেটারিয়েট মিডলক্লাশ বুর্জোয়া পোটি বুর্জোয়া—চেহারা ভালো হলেই হলো। কোনো সামাজিক প্রতিপত্তিওয়ালা লোকের সংগে যদি তারা ঘর করতে চায়, কিংবা ছবিতে নামবার আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে ডাক্তার দুই হাত বাড়িয়ে তাদের উপকার

করবার জন্যে এগিয়ে যায়। নিজের বাড়িতে জায়গা দেয় তারপর সুবিধা মতো যথাস্থানে চালান করে। চৈতন্য হেরম্ব, ও লাইনের এমন আরও অনেকে তার হাতের লোক। ডাক্তার নিজে অবশ্য ব্যাচেলার। কিন্তু সে যে বিয়ে না করে বাড়ি বসে যোগ অভ্যাস করে সে কথা মনে করলে ভুল হবে। তার বাড়ি একেবারে ফাঁকা। তার তিন কুলে কেউ নেই। তাই সে পরের উপকার করে আনন্দ পায়। বাড়ি কলগুঞ্জনে ভরে ওঠে। ফাঁকা ঘরগুলোর সদ্ব্যবহার করে যায় কত বড়ো বড়ো অফিসার, কত উঁচু ঘরের ঘরণী দিনের পর দিন রাতের পর রাত। অথচ আশ্চর্য চাপা স্বভাবের মানুষ ডাক্তার উকিল। কাউকে কারোর গোপন কথা কখনও জানায় না। এমন কতোবার হয়েছে যে স্বামী সকালে অন্য মেয়ে নিয়ে মহিম উকিলের ঘরের সদ্ব্যবহার করে গেল, দুপুরে সেই ঘরেই স্ত্রী অন্য বন্ধু নিয়ে এসে বিকেল অবধি কাটিয়ে গেল। কেউই কারোর কথা জানলো না। তাইতো মহিম উকিলকে সমাজের মাথারা আর বড়ো ঘরের ঘরণীরা অতো ভালোবাসে। এমন নিরাসক্ত পরপোকারী পুরুষ আজকাল সত্যি বড়ো একটা দেখা যায় না।

আসলে কিন্তু ঠিক নিরাসক্ত বলতে যা বোঝায় ডাক্তার উকিল মোটেই তা নয়। ফিলিমে নামবার জন্যে যে মধ্যবিত্ত মেয়েরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে, মহিম উকিল তাদের আশ্রয় দেয় এবং যথাসময়ে হেরম্ব কিংবা চৈতন্যকে খবর দেয়। যে মেয়ে তার বাড়িতে এসে রইলো তারও তো আত্মসম্মান বোধ আছে, সে একজনের বাড়িতে শুধু শুধু অমনি থাকবে কেন। কিন্তু ভাড়া দেবার ক্ষমতা নেই তার, কাজেই সে অন্যভাবে কর দেয়। মন্দ লোকে এ নিয়ে ডাক্তার মহিম উকিলের নামে বলে বেড়ায়। কানে এলেও ওসব চুনোপুঁটির কথা নিয়ে ডাক্তার মাথা ঘামায় না, সমাজের রুই কাতলা নিয়ে তার কারবার। যার তার কথা ধরলে চলবে কেন।

আজ সন্ধ্যায় মহিম উকিলের তেমনি একটা কাজ পড়েছিলো বলে এক্সটেসিতে আসতে রাত এগারোটা হলো। যাক শেষ অবধি মিসেস মল্লিককে বম্বের ট্রেনে তুলে সে নিশ্চিন্ত হলো। এখন সে তাজমহল হোটেলে থেকে যা খুশি করুক, ফিলিমে নামুক কিংবা মালাবার হিলে উঠুক, তার আর কোনো দায়িত্ব নেই। মিসেস মল্লিক অনেকদিন তার বাড়িতে ছিলো। প্রদ্যোৎ মল্লিক

রেলওয়ের বড়ো চাকুরে। তার স্ত্রীর খেয়াল হলো ছবিতে নামবে। স্বামীর সংগে বেশ কিছুদিন আগে থেকে খটাখটি চলছিলো, এবার লাঠালাঠি আরম্ভ হলো। দারুন গোলমাল। বাড়িতে কাক চিল বসতে পায় না। অগতির গতি ডাক্তার মহিম উকিল। মিসেস মল্লিক খবর না দিলেও সে আসতো। যে পরিবারে গোলমাল, সুযোগ বুঝে ঠিক সেখানে সে সব সময় হাজির থাকে। মহিম উকিলের সংগে মাত্র একদিন ফুসফাস কথা হবার পরই মিসেস মল্লিক চিড়িয়াখানার পাশে তার বাড়িতে এক কাপড়ে শূন্য হাতে এসে হাজির। বলে, ছবিতে নামবো। অমন স্বামীর টাকা ছুঁতে আমার ঘেন্না করে ডাক্তার উকিল। এখনও কি নবাবী আমল আছে যে লোকে স্ত্রীকে হারেমে রাখবে। বলে, এখানে যেওনা, ওখানে যেওনা, এ করো না, ও করো না। আমি যেন ওর কেনা বাঁদী।

বেশ তো, দামী কফির কাপ মিসেস মল্লিকের সামনে এগিয়ে দিয়ে মহিম উকিল বললো, ফিলিমে নামবেন তা আর এমন কথা কি, দিমু অখন সব ব্যবস্থা কইর‍্যা। হেরম্ব বাবু চৈতন্য বাবুকে একদিন আসতে কই, কি কন অ্যাঁ?

সাদা হোল্ডারে আস্তে টান মেরে প্লেয়ার্স সিগ্রেটের ধোঁয়া ছেড়ে মিসেস মল্লিক বললো, আমি বম্বে যাবো, এখানে আজকাল বড়ো বাজে ছেলেমেয়ে ছবিতে নামে, ওদের সংগে আমি কাজ করতে পারবো না।

তাও কইর‍্যা দিমু, কবে যাইতে চান?

যত শিগগির হয়, প্রদ্যোৎ কখন কি করে বলা যায় না, বাট আই অ্যাম নট আফ্রেড অব হিম---

বাধা দিয়ে মহিম উকিল বললো, তা' হইলেও সাবধানের মার নাই, কখন মল্লিক সাহেব গণ্ডগোল বাধান ঠিক কী।

ইউ আর পারফেক্টলি রাইট ডাক্তার উকিল। তাই আমি একটু তাড়াতাড়ি বম্বে যেতে চাই।

উইড়্যা যাবেন, না ট্রেনে যাবেন?

ট্রেনেই ভালো।

দেশ-বিদেশে ডাক্তার উকিলের চেলা চামুণ্ডা ছড়িয়ে আছে। কয়েকদিনের

মধ্যেই তার বম্বের প্রতিনিধির সংগে সে সব বন্দোবস্ত করে ফেললো। অবশ্য ফিলিমের কোনো চুক্তি কলকাতায় বসে হলো না। তবে আশ্বাস পাওয়া গেল যে মিসেস মল্লিক যেন নিশ্চয়ই তাজমহল হোটেলে ওঠেন। কারণ ঠাট বজায় রাখতে না পারলে ওখানকার ফিলিমের বড়ো বড়ো লোককে আয়ত্ত করা শক্ত! অবশ্য মিসেস মল্লিককে একথা না বললেও চলতো কারণ শুধু ঠাট বজায় রেখে সে এতো বড়োটি হয়েছে। আসলে বম্বে যাবার জন্যে তার এতো আগ্রহ প্রকাশ করবার মূল কারণ হলো অন্য। সেখানকার গবর্ণমেন্টের এক বড়ো চাকুরের সংগে মিসেস মল্লিকের এর মধ্যেই একটু অঘটন ঘটে গেছে। সে-ই আসলে সেখানে ডাকছে তাকে। কিন্তু তাকে আগে থেকে কোনো অসুবিধায় ফেলতে চায় না মিসেস মল্লিক। বম্বে গিয়ে স্বাধীন হয়ে তারপর দেখা যাবে কি হয়। শুধু শুধু একটি ভালো লোককে কষ্ট দিয়ে লাভ কি। মহিম উকিলের কাছে প্রথমে সে অবশ্য ইচ্ছে করেই এসেছে কারণ পরোপকার করবার জন্যে ডাক্তার যেন পৃথিবীতে এসেছে। আহা এমন লোক ঘরে ঘরে জন্মালে মিসেস মল্লিকের মতো অসহায় ভালো মানুষ মেয়েরা খুব সহজে পার হয়ে যেতে পারে।

খুব বেশিদিন নয়, মাত্র দু'দিন দু' রাত মিসেস মল্লিক মহিম উকিলের বাড়িতে ছিলো। আজ রাত্তিরে সে বম্বের ট্রেন ধরেছে। তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে নিজের দু' একটি ছোটো খাটো কাজ সেরে মহিম উকিল এক্সটেসি ক্লাবে এলো। ট্রেন ছাড়বার ঠিক আগের মুহূর্তে মিসেস মল্লিক মহিম উকিলকে চুম্বন করে বললো, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ, আই অ্যাম সো গ্রেটফুল টু ইউ— তার কথা কিন্তু মহিম উকিলের কানে যায় নি। সে ভাবছিলো যে মিসেস মল্লিক শেষ অবধি যখন তার এতো কাছে এলো তখন দু'দিন আগে এলে কি ক্ষতি হতো। তাহলে বৃথা কেটে যাওয়া দু' রাত্তির প্রচুর উষ্ণতার মধ্যে শেষ হতো। মন ভার করে ডাক্তার মহিম উকিল সে-শনিবার একটু বেশি রাত্তিরে এক্সটেসি ক্লাবে গেল। কিন্তু সেখানে মন ভার করে থাকে কার সাধ্য! শনিবার রাত্তিরে এক্সটেসি ক্লাবে একেবারে নরক গুলজার। অন্যান্য দিনের মতো আজও গালে হাত দিয়ে অম্বর বক্সি এক কোণায় বসে আছে। তার চেয়ে অনেক দূরে পাশাপাশি বসে আছে তুলতুল আর নেভির

কমাণ্ডার পট্টনায়ক। তাদের হাতে জিনের ছোটো গ্লাশ। লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোনো বয়স্ক বড়ো চাকুরে বিক্রম দত্ত রায়। চুলে অল্প অল্প পাক ধরেছে কিন্তু শরীরের আর কোথাও বার্দ্ধক্যের চিহ্ন নেই। মীনা হালদারকে সংগে নিয়ে শিবেন বটব্যালও এসেছে আর মেজর ঠক্করের সংগে যেন গায়ে গায়ে মিশে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনীতা।

ডাক্তার মহিম উকিল একবার আড়চোখে সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে এক-ধাবে নিজের বিশেষ জায়গায় গিয়ে চুপ করে বসে পড়লো। সে কিছুক্ষণ একা বসে ভাবতে চেয়েছিলো। কেন না এরা প্রত্যেকে তাকে দেখতে পেলে আর এক মিনিটও একা বসে থাকবার অবসর পাওয়া যাবে না। কিন্তু মহিম উকিল বেশিক্ষণ আড়ালে থাকতে পারলো না। এদের বাদ দিয়ে তাব চলতে পারে কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে এদের চলে না। ক্লান্ত হলেও সেকথা ভেবে মহিম উকিলের হাসি পাচ্ছিলো। আর দূর থেকে শেয়ালের মতো মনে হচ্ছিল তাঁকে। এক্সটেসি ক্লাবে যারা আসে তাদের কারোর ঘরের খবর জানতে বাকী নেই তার। তার ঘরেই তো কত নতুন বাসর হলো, কত ঘর ভাঙবার সূচনা হলো, ধূলি হলো কত প্রেম।

হ্যাল্লো ডক্টর, শিবেন বটব্যাল মীনা হালদারের কোমর ধরে একেবারে ওর সামনে এসে পড়লো।

আরে আসেন আসেন—বসেন, উঠে দাঁড়িয়ে মীনার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো মহিম উকিল।

মীনা হেসে বললো, না বসবো না, ওই যে শ্লো ফক্সট্রটের বাজনা বাজছে, কোমর বেঁকিয়ে ওরা ফ্লোরে চলে গেল।

ডাক্তার মহিম উকিল আর বসলো না। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। শ্লো ফক্সট্রটের বাজনা, আর হালকা হাওয়ায় ভেসে আসা নানা মদের গন্ধে তার মাথা রিমঝিম করতে লাগলো। এক্সটেসি ক্লাবে মহিম উকিল যেন সব সময় নিজেকে খুঁজে পায়।

আই ওয়াজ লুকিং ফর ইউ ডক্টর, অম্বর বক্সির স্বর শুনে দাঁড়িয়ে পড়লো মহিম উকিল।

আরে বক্সি সাহেব যে, মেমসা'ব কই?

সী ইজ ডান্সিং, মহিম উকিলের মুখের দিকে তাকিয়ে পাইপে দীর্ঘ টান মেরে মুচকি হেসে বক্সি বললো, হাউএভার, আপনার সংগে আমার একটু জরুরী কথা ছিলো—

বক্সির পাশের চেয়ারে ব'সে পড়ে মহিম উকিল বললো, বলেন, আপনার কোনো কাজে লাগলে আমার জীবন সার্থক হইয়া যাইবো।

এক মুখ পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে অম্বর বক্সি বললো, কাল দুপুরে আই শ্যাল বি ইওর গেষ্ট ফর এ ফিউ আওয়ার্স?

বেশ বেশ।

আবার ধোঁয়া ছেড়ে বক্সি বললো, মিসেস মিত্রও যাবেন।

নিশ্চয় নিশ্চয়, মহিম একথা আগেই বুঝতে পেরেছিলো। তবু সেকথা অম্বর বক্সিকে না জানিয়ে বললো, ক'টায় যাইবেন স্যার?

সে বিট্যুইন টু এণ্ড টু থার্টি—

ব্যাস ব্যাস, আর কিছু কইতে হইবো না।

ঘণ্টা দু'একের বেশি কিন্তু কিছুতেই থাকতে পারবো না।

ঠিক আছে স্যার, মনে মনে মহিম উকিল ভাবলো, ধন্য মেয়ে অনীতা, ওর মার নেই কিছুতে। দিল্লীর বড়ো অফিসারের ঘর ছেড়ে চলে এলো ক'লকাতায়—এখন সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে বড়ো আফিসার। ওদিকে মেজর ঠকর, এদিকে অম্বর বক্সি, তাছাড়া ছুটকো ছাটকা আরও কতো আছে তার হিসেব রাখতে গেলে ভালো চার্টার্ড অ্যাকাউনটেণ্ট চাই।

কতকগুলো বড়ো বড়ো গোলমালের ব্যপার যে শিগগিরই ঘটবে সে-বিষয়ে ডাক্তার মহিম উকিল একেবারে নিশ্চিন্ত। মীনা হালদার শরৎ হালদারের ঘর ছেড়ে শিবেন বটব্যালের ঘর করবে, অনীতা ঠকরকে বিদায় করে অম্বর বক্সিকে নিয়ে মাতবে। আর তুলতুল? তার সম্পর্কে মহিম উকিল একটা কথা শুনেছে বটে কিন্তু সেকথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। যাহোক ব্যপার জানতে খুব বেশি দেরি হবে না মহিমের। তার ঘরে যুগলে অন্তত একবার না এলে বাস্তবে ঘর বদল করা এদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন।

হঠাৎ মথা তুলে সামনে তাকিয়ে মহিম উকিল বেশ চমকে উঠলো। হৈমন্তীকে সহসা চিনতে বেশ কিছু দেরি হলো তার। কী অপরূপ

রূপ! এমন করে কে ওকে সাজতে শেখালো। দু'দিন আগে ওর চেহারা দেখে মহিম উকিল কিছুতেই বুঝতে পারে নি যে ইচ্ছে করলে হৈমন্তী এমন আশ্চর্য সুন্দর করে সাজতে পারে। এখন যে আর কারোর দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে না। হৈমন্তীর এপাশে চৈতন্য আর ওপাশে হেরম্ব। ওরা আস্তে আস্তে সটান মহিম উকিলের সামনে এসে পড়লো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হৈমন্তীর হাতে হাত দিয়ে মহিম উকিল বললো, আসেন আসেন, বসেন, আছেন কেমন? একদিন মুর্গি খাওয়াইবেন কইলেন, কই তাতো খাওয়াইলেন না—

মৃদু হেসে হৈমন্তী বললো, একদিন গিয়ে আপনিও তো আর গেলেন না, এবার যেদিন যাবেন সেদিন খাওয়াবো।

বেশ বেশ, দুচার দিনের মধ্যে ঠিক যামু দেখবেন।

হৈমন্তী হেসে বললো, দেখা যাবে।

চৈতন্য আর হেরম্বকে দেখতে পেয়ে একে একে ওদের ঘিরে দাঁড়ালো অনীতা, মীনা, তুলতুল, পেছনে পেছনে শিবেন আর অম্বরও এলো। হৈমন্তী এর আগে কখনও এক্সটেসি ক্লাবে আসে নি, তাই প্রচুর কৌতূহল নিয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

খুশী হয়ে সে দেখলো তার দিকে তাকিয়ে আছে অসংখ্য চোখ, প্রত্যেকের মুখ নীরব প্রশংসায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এখানকার এক একটি মানুষ যেন ঐশ্বর্যের মূর্ত প্রতীক। এরা সকলে খুব বড় চাকুরে, সমাজের মাথা। দেশে গণ্যমান্য লোক বলে এরা দশজনের শ্রদ্ধা পায়। হৈমন্তী আগ্রহের সংগে এপাশে ওপাশে তাকিয়ে দেখলো শুধু। সে তার স্বামী কৈলাসের মত বোকা নয়, তাই তার মুখে এতোটুকু বিস্ময় ফুটে উঠলো না। ভান করলো যেন এমন সে কতো দেখেছে। তারপর মীনা তুলতুল আর অনীতাকে জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছেন? কই গেলেন না তো আমার বাড়িতে একদিনও?

অনীতা হেসে উত্তর দিলো, তেমন করে ডাকেন নি তো ভাই—

হৈমন্তীও সংগে সংগে উত্তর দিলো, কেমন করে ডাকবো শিখিয়ে দিন—

মিষ্টার গড়াই কী বলেন? হৈমন্তীকে শিখিয়ে দিন কেমন করে ডাকতে হয়?

চৈতন্যর কানে বোধ হয় অনীতার কথা গেল না। সে তখন তুলতুলকে বোঝাচ্ছে বার্ণাড শ'র "গুড কিং চার্লস গোল্ডেন ডেইজ" একটা অপূর্ব বই।

মীনা বললো, আমাদেরও আপনার বাড়ি গিয়ে অনেকক্ষণ গল্প করবার খুব ইচ্ছে।

কাল আসবেন?

ওয়েল্ শিবেন?

থ্যাঙ্ক ইউ, নিশ্চয়ই যাবো।

হৈমন্তী সুযোগ বুঝে একে একে সকলকে কাল রাত্তিরে তার বাড়িতে ডিনারের নেমন্তন্ন করলো। মীনা, তুলতুল, অনীতা, শিবেন, অম্বর আর আরও একজন, তার নাম বিক্রম দত্ত রায়। লোকটি অত্যন্ত লাজুক। বয়স্ক বিপত্নীক। কথাবার্তা কম বলে। কিন্তু প্রচুর অর্থবান। তা না হলে এক্সটেসি ক্লাবের সভ্য হবে কেমন করে।

হৈমন্তীর চোখে কিছুই এড়ায় না। তাইতো দিনে দিনে চৈতন্য আর হেরম্বর ওপর তার শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। এখানকার সব সুন্দরীরা ওদের দু'জনকে নিয়ে এমন করে মেতে ওঠে কেন।

বিক্রম দত্ত রায় পাইপ নামিয়ে বললো, বাংলা ছবির খুব উন্নতি হচ্ছে, আই লাইক দেম ভেরি মাচ দিজ ডেইজ—

হাঃ হাঃ হাঃ, চৈতন্য তুলতুলের ঘাড়ে যেন নিজের অজ্ঞাতে একটা হাত রেখে বললো, ক্রেডিট গোজ টু দিজ ইয়ং লেডিজ মিষ্টার ডাট রয়।

হোয়াট আই নো, হৈমন্তীর দিকে তাকিয়ে বিক্রম দত্ত রায় অকারণে একবার হাসলো শুধু।

হেরম্ব নিঃশব্দে যেন এক্সটেসি ক্লাবের সমস্ত মেয়েদের গ্রাস করে নিতে চায়, কাকে ফেলে কাকে রাখবে ভেবে পায় না। কী করে ওদের সংগে আলাপ জমানো যায়। চৈতন্যর শরণ না নিলে তার উপায় নেই। বাঁকা দৃষ্টিতে সে একবার মেজর ঠক্করের দিকে তাকিয়ে নিলো। অনীতা মিত্রকে সে যেন কিনে রেখেছে। লোকটাকে হেরম্ব দত্তর একটা স্কাউণ্ড্রেল বলে মনে হয়। বাড়িতে থাকতে দিয়েছে বলে যেন মাথা কিনেছে। এমন একজন অসহায় মেয়ের সর্বনাশ মানুষ কেমন করে করতে পারে সেকথা সে

ভেবে পায় না। মিলিটারিতে গেলে লোকগুলো বোধহয় এমনি অমানুষ হয়ে যায়।

হেরম্ব খুব আস্তে অনীতাকে জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছেন মিসেস মিত্র?

খু-উ-ব ভালো, আপনি?

নট ব্যাড।

আপনার সংগে আমার একটা দরকারী কথা ছিলো মিষ্টার দত্ত?

বলুন?

চলুন ওই টেবিলে গিযে বসি?

কথা শুনে হেরম্ব একটু ইতস্তত করলো। ওই টেবিলে গিয়ে বসা মানেই কিছু খরচ হবে। অনীতা নিশ্চয়ই জিন হুইস্কি রাম, একটার পর একটা অর্ডার দিযে যাবে। অনীতার জন্যে দু'চার পয়সা খরচ করতে হেরম্বর আপত্তি নেই, শুধু পয়সা জলে গেলেই তার দুঃখ হয়।

তবু এমন সুযোগ আর জীবনে আসবে না ভেবে সে বললো, চলুন ওই টেবিলে গিয়ে আপনার কথা শুনি?

চেয়ারে বসেই অনীতা বললো, ফিলিং ভেরি থার্ষ্টি মিষ্টার ডাট, উড ইউ মাইণ্ড জিন অ্যাণ্ড লাইম?

নট অ্যাট অল, বাধ্য হয়ে হেরম্বকে অর্ডার দিতে হলো।

এমনি অনেকবার অনেক রকম অর্ডার দেবার পর হেরম্বকে অনীতা যা বললো তার সারাংশ হলো এই যে মেজর ঠক্করের সংগে তার আর সদ্ভাব নেই। যার সংগে সদ্ভাব নেই তার বাড়িতে সে থাকবে কেমন ক'রে। তাই তাকে যত শিগগির হয় বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই সব কাজ তো আর সংগে সংগে মানুষ করতে পারে না। তাই অনীতাও এই মুহূর্তে ঠক্করের বাড়ি ছাড়তে পারছে না। কাজেই অবিলম্বে সে ছবিতে নামতে চায়। কিন্তু পারিবারিক অশান্তির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে তার যত শিগগির হয় দশ হাজার টাকা চাই।

সব শুনে গালে হাত দিয়ে হেরম্ব কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। দশ হাজার টাকা যদি সে অনীতাকে পাইয়ে না দিতে পারে তাহলে তার আর আলিপুরে যাওয়া চলবে না। কিন্তু টাকাটা সে দেবে কোত্থেকে? পকেট থেকে নিশ্চয়ই

নয়। আর প্রডিউসারকেও চট করে বলা চলবে না কারণ "অপবাদ" শেষ হতে এখনও অনেক দেরি। কাজেই চৈতন্য ছাড়া উপায় নেই। সে ঠিক একটা ভালো ব্যবস্থা করে দেবে, মানে সাপও মরবে অথচ লাঠিও ভাঙবে না। ইসারায় হেরম্ব চৈতন্যকে সেই টেবিলে আসতে বললো। তারপর তাকে জানালো যে মিসেস মিত্র ছবিতে নামতে চান আর নানা কারণে খুব তাড়াতাড়ি তার দশ হাজার টাকা দরকার।

সিওর সিওর, হাঃ হাঃ হ্যাঃ, ইউ আর ভেরি পোলাইট মিসেস মিত্র, আই থট ইউ উড বি আস্কিং ফর মিলিয়ানস্—

অনীতার তখন বেশ নেশা ধরেছে, সে চৈতন্যর একটা হাত শক্ত ক'রে ধরে গায়ে গা ঠেকিয়ে বললো, প্লিজ অ্যারেঞ্জ, আই'অ্যাম ব্যাডলি ইন নীড অব মানি—

চৈতন্য অনীতার গায়ে একটু চাপ দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কবে চান?

যত শিগগির হয়।

রাইট, আমি প্রডিউসারের সংগে দু'একদিনের মধ্যেই কথা বলবো।

হি হি, মিষ্টার গড়াই ঠিক পাবো তো?

হাঃ হাঃ হাঃ, আমি বললে প্রডিউসার দশহাজার কেন, দশলক্ষ টাকা এক কথায় দিয়ে দেন, ওই ষ্টুডিওর এতো নাম আমারই জন্যে হয়েছে কিনা, "মাই ডার্লিং" ছবিতে কোম্পানী যা পয়সা পেয়েছে যে পাঁচ বছর লোকসান হলেও কিছু ক্ষতি হবে না। আমি যতোদিন আছি ততোদিন নিশ্চয়ই লোকসান হবে না। অ্যাওয়েইট "অপবাদ" হাঃ হাঃ হাঃ—

তুলতুলের মুখে গল্পটা শুনেছি বটে।

পরের ছবিতেই আমি আপনাকে চান্স দেবো, মিসেস হালদারও নামবেন।

হি হি হি, বাট বিওয়্যার অব মিষ্টার হালদার, শুনেছি ফিল্মের নাম শুনলে তিনি নাকি জ্বলে ওঠেন।

কথায় কথায় কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা পেলে নিশ্চয়ই আর জ্বলে উঠবেন না।

কিছুই বলা যায় না, হি ইজ অ্যান আনপ্লেজেণ্ট গারস্থান।

লেট আস ওয়েট অ্যাণ্ড সি, হাঃ হাঃ হাঃ—

কথাবার্তা পাকা হয়ে যাবার পর অনীতা টলতে টলতে এসে অম্বর বক্সির পাশে ধপ করে বসে পড়লো। আশ্চর্য, অম্বর তখনও সেই চেয়ারে বসে পাইপ মুখে যেন ধ্যান করছে। ডাক্তার মহিম উকিল শিবেন আর মীনার সংগে গল্প করছে। হৈমন্তীর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছে বিক্রম দত্ত রায়। অনীতা উঠে যাবার পরও চৈতন্য আর হেরম্ব চুপ করে পাশাপাশি বসে আছে।

ওদিকে ফক্স ট্রট সবে শেষ হয়েছে। একটা আধুনিক মাড়োয়ারীর নেশা ধরেছে। সে ফ্লোরের ওপর বসে প্রাণপণে হল্লা করছে। আর তার দিকে তাকিয়ে মেয়েরা খিলখিল করে হাসছে। কেউ কেউ তাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে রসিকতা করছে।

হেরম্বর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চৈতন্য জিজ্ঞেস করলো, কি ভাবছেন হেরম্ব বাবু?

ভাবছি, ভাঙা গলায় হেরম্ব বললো, এখন কি উপায় হবে। তুমি তো লম্বা চওড়া কথা বলে খালাস। দু'একদিনের মধ্যে দশহাজার টাকা দিতে না পারলে আমার আর অলিপুরে যাওয়া চলবে না জানো?

ড্যাম ইওর আলিপুর, হেরম্বর প্রায় কানের কাছে মুখ এনে চৈতন্য বললো, লুক, হাউ ডু ইউ লাইক দ্যাট পাঞ্জাবী গার্ল?

আঃ বাজে কথা রাখো, কি করবে বল?

কিছু ভাববেন না, ভার যখন নিয়েছি তখন আমি সব ম্যানেজ করে দেবো—

বাধা দিয়ে হেরম্ব বললো, কিন্তু এ তোমার হৈমন্তী নয় যে যা বোঝাবে তাই বুঝবে, টাকা দিতে না পারলে চতুর্দিকে যা ইচ্ছে তাই বলে বেড়াবে আর তখন আমাদের এখানে আসা বন্ধ হবে, এলেও কেউ ফিরে তাকাবে না।

আপনি একটু বেশি ব্যস্ত হচ্ছেন হেরম্ব বাবু, থাকনা দু'একটা দিন। একটু ভেবে দেখি কী করতে পারি। আর এখানকার সম্বন্ধে ওসব কিছু ভয় করবেন না আপনি। এরা কেউ কারোর কাছে কিছু বলাবলি করে না। এই মেয়েরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে হিংসে করে। যে যার স্বার্থ নিয়ে থাকে তাই এদের মধ্যে ভয়ানক রেশারেশি।

হেরম্ব দত্ত হাঁ করে বললো, আপনভোলা সরল সেজে তুমি তো দিব্যি হালচাল বুঝে ফেলেছো দেখছি। এত সব জানলে কী করে বাপু ?

হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, আরে মিসেস বক্সি যে ?

চৈতন্যকে ইসারায় ডেকে তুলতুল বললো, চেক পেয়েছি, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ !

কী আর পেয়েছেন, ওটা পাঠাতে আমারই লজ্জা করছিলো, যাহোক পরের ছবিতে কী করতে পারি দেখি।

না না যথেষ্ট পেয়েছি, গর্বের হাসি হেসে তুলতুল বললো, মিষ্টার বক্সির এক মাসের রোজগারের চেয়ে বেশি।

ইউ উইল অর্ন মিলিয়নস্ মিসেস বক্সি।

আপনার কথা যেন সত্যি হয়।

হবেই, "অপবাদ" রিলিজ হলেই হবে।

আবার কবে আসবেন আমাদের ওখানে ?

যেদিন বলবেন, এনি টাইম ইজ মাই টাইম।

কাল সারাদিন আমি ফ্রী, কাম অ্যাণ্ড হ্যাভ ইওর লাঞ্চ উইথ আস্, তারপর ডাক্তার মহিম উকিলের ওখানে গিয়ে সারাদিন কাটিয়ে রাত্তিরে হৈমন্তীর ওখানে ডিনারে যাওয়া যাবে ?

চৈতন্য এত সৌভাগ্য আশা করেনি। অতো বড়ো ব্যারিষ্টারের সুন্দরী স্ত্রী সেধে তার সংগে মহিম উকিলের বাড়ি সময় কাটাতে যাবে একথা তার পক্ষে কল্পনা করা সহজ নয়।

তাই সে লাফিয়ে উঠে বললো, ধন্যবাদ, থ্যাঙ্ক ইউ, শুক্রিয়া মিসেস বক্সি। হেরম্ব বাবু, সিগ্রেট ! আমি সকাল দশটায়—

তুলতুল ঘাড় বেঁকিয়ে বললো, মেক ইট ওয়ান প্লিজ।

অলরাইট, অলরাইট, আমি ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হবো—ডাক্তার উকিল শিগগির, ভয়ানক জরুরী দরকার, কাম রাউণ্ড দি কর্ণার, চৈতন্য মহিম উকিলের ঘাড় ধরে হিড় হিড় করে তাকে এক নির্জন কোণে টেনে নিয়ে চললো।

উঁহুহু, একটু আস্তে ধরেন লাগে, ব্যাপার কি ? একেবারে পুরুষ্টু পাঁঠার মত লাফান যে, অ্যাঁ ?

শোনো ডাক্তার, কাল ঘর চাই ?

ওরে বাবা, ক'টায় ?

সারা দিন।

উঁহু, হইবো না।

হতেই হবে, আই স্যাল মেক ইউ কিং! থাউস্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়ান গ্ল্যামার গার্লস অব ইণ্ডিয়ান ফিল্মস্ তোমাকে ঘিরে থাকবে।

সই হইবো না গড়াই সাহেব।

তাহ'লে কি চাও বল ? কাল আমার ঘর চাই। কাকে নিয়ে যাবো শুনলে ডিগবাজি খাবে ডাক্তার।

ডাক্তার উকিল শুকনো হেসে বললো, কি যে কন গড়াই সাহেব, অনেক বাজি দেখছি জীবনে কিন্তু ডিগবাজি খাই নাই কখনও। তবে হ্যাঁ, বাহাদুরী আছে বটে আপনাদের, অসম্ভবেরে সম্ভব করতে পারেন। মাঝে মাঝে পায়ের-ধুলা লইবার সাধ হয়। যাক, আসেন কাল বিকালে—ছ'টার আগে হইলে সাংঘাতিক অসুবিধা হইবো কইয়া দিলাম, পালাইতে পথ পাইবেন না হেঁ হেঁ হেঁ—

তবে ছ'টাই সই, চৈতন্য দাঁতে সিগ্রেট চেপে ধরে বললো, কিন্তু অন্য কেউ যেন না থাকে তখন।

আরে না না, তেমন হইছে কখনও ? অন্য কেউ থাকলে আর কষ্ট কইর‍্যা আপনারা যাইবেন কেন ?

হেরম্ব সবই দেখলো, সবই শুনলো। সিগ্রেট খাবার ইচ্ছে হলো কিন্তু পকেটে হাত ঢুকিয়ে চৈতন্য কখন প্যাকেট তুলে নিয়ে গেছে বলে খাওয়া হলো না। গালে হাত দিয়ে বসে হেরম্ব বুঝি চৈতন্যর সৌভাগ্যের কথাই ভাবছিলো। নিজে ছেলেবেলায় বিয়ে করেছে বলে দুঃখ হলো হেরম্বর। এই কারণে অবশ্য খুব বেশি অসুবিধা হয় না তার। তবু চৈতন্যর চেয়ে অনেক পিছিয়ে থাকতে হয়। বিয়ে ওলা শুনলে এখানকার মেয়েরা তেমন সহজ ভাবে মিশতে পারে না। বিয়ে করে ঘর করবার জন্যে নয়, তারা ধরে নেয়, সংসারী লোক নাকি অনেক ভেবে চিন্তে বুঝে শুনে খরচ করে। আর স্ত্রীও হয়েছে এমনি যে তাকে সমাজে বের করা যায় না। সেকালের ফিলিম ডিরেক্টারকে আর কোন লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করতো। তাই হেরম্ব স্ত্রীর জন্যে অন্যকে আহবান

করতে পারে না, নিজেও অন্য মেয়ের পেছনে মুক্ত হস্তে খরচ করতে পারে না, শুধু ড্যাবাড্যাবা চোখ মেলে চৈতন্যর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। অনীতা মিত্রকে নিয়ে সে যদি ঘর করতে পারতো। আহা! তা'হলে দশ বছর বয়স কমে যেতো তার। কিন্তু কোথায় অনীতা মিত্র! সে তখন অম্বর বক্সির কোলের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করছে, আর উই ইন দি জ্যু? ওঃ ডক্টর, অ্যানাদার জিন্ অ্যাণ্ড লাইম প্লিজ!

ওদিকে মীনা হালদার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সবশুদ্ধ দু'শো ষোলো মিনিট নেচেছে সে। গলা শুকিয়ে এসেছে তার। তাই টেবিলের গ্লাশ বারবার শূন্য হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মীনা হালদার অনীতা মিত্র নয়; সে আবোল তাবোল বকে না, হঠাৎ নেশার ঘোরে কারোর গায়ে ঢলে'ও পড়ে না। শিবেন বটব্যালের চোখে চোখ রেখে সে শুধু ভবিষ্যতের কল্পনা করে। অনেক সহ্য করেছে সে। কিন্তু আর—নয়। এবার তাকে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে যেমন করে হোক শরৎ হালদারের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এতোদিন নানা অত্যাচার সে সহ্য করেছে, কারণ উপায় ছিলো না। কিন্তু এখন মীনা নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছে। সে ছবি থেকে যে টাকা রোজগার করেছে শরৎ হালদার হয়তো সারা জীবনেও ততো টাকা জমাতে পারবে না। তাই এখন তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

ওয়েল শিবেন, পুরানো স্কচের গ্লাশে আস্তে চুমুক দিয়ে মীনা বললো, হোয়াট হ্যাভ ইউ ডিসাইডেড?

গোল মুখো শিবেন একটু জড়ানো স্বরে বললো, তুমি যা বলবে আমি তা করতে রাজী।

জানি, কিন্তু কি করবো বলে দিতে পারো?

যা'তে শান্তি পাওয়া যায় তার চেষ্টা করবে।

তাহ'লে তো আমাকে এখনি ওর বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয়?

তাই চলে এসো তুমি।

কিন্তু তাহ'লে যে তোমার বিপদ হবে, ও তোমার নামে কেস্ করবে—

আই কেয়ার এ ড্যাম—

মীনা আর কথা বললো না। বুঝতে পারলো শিবেনের বেশ নেশা ধরেছে।

এখন কিছু বোঝাতে গেলে কোনো ফল হবে না, পাগলের মত চেঁচাবে শুধু। কিন্তু মীনা উপায় ঠিক করে ফেলেছে। যত শিগগির হয় শরতের কাছ থেকে ডিভোর্স নিয়ে এই শিবেনকে সে বিয়ে করবে। তার মত মানুষ হয় না। মীনাকে যদি কেউ বুঝে থাকে তাহলে সে শিবেন। এতদিন শরৎ তার সমস্ত সত্তা হরণ করে নিয়েছিলো, তাকে মেরে ফেলতে বসেছিলো। কিন্তু শিবেনের সংস্পর্শে এসে মীনা বুঝলো যে সে আজও তার সমস্ত যৌবন নিয়ে বেঁচে আছে—আরও অনেকদিন বেঁচে থাকবে। কাজেই যে স্বামীকে সে আর ভালো বাসে না, যার কাছ থেকে সামান্য সহানুভূতি আশা করতে পারে না, শুধু শুধু লোক দেখানোর জন্যে তার সংগে ঘর করে কী ফল। তা করে নিজেকে ধ্বংস করতে চায় না মীনা, সে নতুন করে বাঁচতে চায়। আজ বোধ হয় ফিরে গিয়ে স্বামীর সংগে তার কথা হবে না। কিছু বলা যায় না, শরৎ হয়তো জেগেও থাকতে পারে, তাহলে আজই আবার কুকুর বেড়ালের মত ঝগড়া বাধবে। মীনা ভেবে পায় না একজন পুরুষ একজন মেয়ের কাছে কেমন করে নিজেকে এতোখানি ছোটো করতে পারে। শরৎ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে মীনা তাকে একেবারেই ভালোবাসে না, তবু কেন সে তাকে ছেড়ে দেয় না, কেন জোর করে ধরে রাখতে চায়, কেন স্বামীত্বের অধিকার নিয়ে মাথা ঘামায়। হাজার অত্যাচার করলেও মীনা তার কথা আর জীবনে কোনোদিন শুনবে না। এখন তার আত্মবিশ্বাস এসে গেছে। সে সম্পূর্ণ নিজের উপার্জনে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। তার ওপর শরতের আসল রাগ বোধ হয় এই কারণেই।

আগে মীনা যন্ত্রের মতো স্বামীর আজ্ঞা পালন করতো, তাকে না বলে কোথাও যেতো না, তার নিজের কোনো বন্ধু বান্ধব ছিলো না। সে হয় তো সারা জীবন এমনি করেই কাটিয়ে দিতো। কিন্তু তার এ জীবন যান্ত্রিক করে তুললো শরৎ নিজে। সে যেন জোর করে তাকে বুঝিয়ে দিলো শরতের পরিচয়ে তার পরিচয়, তার অর্থে মীনার পুষ্টি। শরৎকে বাদ দিয়ে মীনা কিছু নয়।

যেদিন মীনা স্বামীর এই মনোভাব বুঝতে পারলো সেদিন. তার মনে শুধু জমে উঠলো নিদারুণ অভিমান। কিন্তু কে দেবে অভিমানের মূল্য। শরৎ অকস্মাৎ যেন আরও কঠোর হয়ে উঠলো। মীনার বাপের বাড়ির অবস্থা খুব ভালো নয়। তাই শরৎ মনে করে যে সে তাকে পর্ণ কুটীর থেকে প্রাসাদে

এনে বসিয়েছে। তার ব্যবহারে স্ত্রীকে সব সময় সে একথা মনে করিয়ে দেয়। দীর্ঘজীবি হোক চিত্রশিল্প। তার কল্যাণে সে আজ শরৎকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে তার চেয়েও বেশি রোজগারের ক্ষমতা মীনার আছে। কাজেই এখন সে আর স্বামীকে গ্রাহ্য করে না। সময়ে অসময়ে নিজের বন্ধুবান্ধবকে আমন্ত্রণ জানায়। শরৎ অভদ্রতা করে, ইতরের মত ব্যবহার করে, বাইরের লোকের সামনেও তাকে অপমান করে কিন্তু তাতে মীনার কিছু যায় আসে না, সে পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেছে। লোকে তার নিন্দে করে না, তার স্বামীকে অমানুষ বলে ধরে নেয়। তাই মীনা আরও বেপরোয়া হয়ে গেছে। টাকার জোর তারও আছে, আর ভাবনা কী। এখন যুদ্ধ ভালো ক'রে চলুক। সে-ও স্বামীর সংগে গোলমাল করে যত তাড়াতাড়ি হয় মুক্তি পেতে চায়। শরৎ বাড়ি থাকতে বললে থাকে না, শরতের বন্ধু বান্ধব এলে ইচ্ছে করেই বেরিয়ে যায়। কিংবা তার নিজের বন্ধুদের একই দিনে নেমন্তন্ন করে বসে। শরৎ ঠিক জব্দ হয় তখন। রাগে মনে মনে গজরায় কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না। পরে কিছু বললেও মীনা গ্রাহ্য করে না। সংগে সংগে শুনিয়ে দেয়, তোমার বন্ধু বান্ধব আছে আমার নেই? কথা শুনে শরৎ যা মুখে আসে তাই বলে মীনাকে অভদ্রের মত গালাগাল করে। মীনাও ছেড়ে কথা বলে না। এমনি করেই কাটছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। কিন্তু আর সহ্য করতে পারছে না মীনা। ক্লান্তিতে তার সমস্ত দেহ মন যেন ভেঙে পড়ছে।

ওঃ শিবেন, টেইক মি আউট অব দিস্ হেল্, মীনা শিবেন বটব্যালের কাঁধে মাথা এলিয়ে দিলো।

নেশার ঘোরে শিবেন উত্তর দিলো, হাউ ডু ইউ মিন? উই আর ইন হেভেন, আর্নট উই?

ওদিকে হৈমন্তী এখানকার হালচাল বুঝে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে আর দত্তরায় বোধ হয় একজন মধ্যবিত্ত বাঙালী মেয়ের মনে কী করে রেখাপাত করা যায় সেকথা ভেবে গলদঘর্ম হচ্ছে।

ইয়ে, মানে আপনি, বাংলা বলতে বিক্রমের রীতিমত কষ্ট হয়, কী কী ফিল্মে অ্যাকটিং করেছেন?

মৃদু হেসে হৈমন্তী বললো, আমার প্রথম ছবি, 'মাই ডার্লিং'।

আমি দেখেছি, খুব ভালো লেগেছে।

ধন্যবাদ।

তারপর আপনি কোন ছবিতে অ্যাকটিং করবেন?

এখন "অপবাদ" এর স্যুটিং হচ্ছে।

আই সী, আমাদের মিসেস বক্সিও আছেন তা'তে?

হাঁ।

বেশ বেশ, আই লাইক দি টাইটল—

ইউ উইল অল সো লাইক দি ফিল্ম মিষ্টার ভাট-রায়, হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, পেছনে নিঃশব্দে কখন চৈতন্য গড়াই এসে দাঁড়িয়েছে ওরা কেউ টের পায়নি।

সারটেনলি আই উইল—

দত্ত রায়কে বাধা দিয়ে চৈতন্য বলে চললো, দি মেইন থীম অব দি ষ্টোরি ইজ বেস্ড্ অন শেভিয়ান কনসেপসন, আই থাঙ্ক আই স্যাল সারপাশ শ—

দত্ত রায় চৈতন্য গড়াই এর মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথার মানে বোঝবার চেষ্টা করে শুধু বললো, আই সী।

চৈতন্য আরও কিছুক্ষণ হয়তো "অপবাদ"এর লম্বা ফিরিস্তি দিতো কিন্তু দূরে একটা গোলমাল শুনে ছুটে গেল। এক মাড়োয়ারী নাকি তুলতুলের সংগে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে।

বিক্রম দত্তরায়ও উঠে গেল। হৈমন্তী কোথাও গেল না। সে সেই চেয়ারে নিঃশব্দে একা বসে রইলো। সে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো হয়ে গেছে। কবে সে ওদের মতো করে নিজেকে তৈরী করতে পারবে? এমনি আনন্দের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেবে? এদের সমাজে সকলে চেনে, বাইরের লোকের কাছে ওদের অনেক দাম। কিন্তু কী প্রচণ্ড তারুণ্যের জোয়ারে এরা মেতে থাকে! বিক্রম দত্তরায়, অম্বর বক্সি, শিবেন বটব্যাল, মেজর ঠকর—এদের সকলের নাম দেশ সুদ্ধ লোক জানে। হৈমন্তীর সৌভাগ্য যে সে তাদের সংগে সমানে মিশতে পেরেছে। ওরাও সমস্ত ভুলে হৈমন্তীর সংগে মধুর স্নেহের ব্যবহার করেছে। এত কাছে টেনে নিয়েছে যে তার নিজেকে তাদের একজন মনে করতে এতোটুকুও বাধে না।

মেয়েদের দিকে আরও ভালো করে লক্ষ্য করে হৈমন্তী ভাবলো তার বেশভূষায়

এখনও কিছু ক্রটী আছে। তাকে প্রথমে চুল কাটতে হবে, এদের সকলের বব্ করা চুল। এতো গয়না পরা চলবে না, বাঁ হাতে রিষ্টওয়াচ আর ডান হাতে শুধু একটা বালা কিংবা গালার চুড়ি পরে তাকে ভবিষ্যতে এখানে আসতে হবে। আর জর্জেটের থান কিনতে হবে কয়েকটা। এই সব করতে পারলে তার বেশভূষার আর কোনো খুঁত থাকবে না। কিন্তু মদ? না না ওটা বোধ হয় কিছুতেই চলবে না। কিন্তু কেন নয়? ওই তো তুলতুল, অনীতা, মীনু, এদের তো আঙুল কাঁপছে না একবারও, এরা তো মিনিটে মিনিটে শূন্য করে দিচ্ছে গেলাসের পর গেলাস। তাহলে হৈমন্তীই বা পারবে না কেন? সে কী মনে মনে এখনও ওদের চেয়ে পিছিয়ে আছে? না না, কোনো রকম কুসংস্কার তাকে আর আচ্ছন্ন করতে পারবে না, উচ্ছল জীবনের প্রচণ্ড জোয়ারে তাল মেলাতে সে আর এতোটুকু দ্বিধা করবে না। চৈতন্যর সংগে একবার পরামর্শ করে দেখতে হবে সে কি বলে। সে ছাড়া আর কে আছে হৈমন্তীর। কিন্তু, কোথায় চৈতন্য? দূরে তুলতুলের হাত ধরে তাকে কি যেন বোঝাচ্ছে।
চৈতন্যর দিকে তাকিয়ে গর্বে বুক ভরে গেল তার। বড়ো ঘরের রূপসীরা যার সঙ্গ পাবার জন্যে ব্যাকুল তাকে একেবারে আপনার করে মনের নিভৃতে ধরে রেখেছে হৈমন্তী।

তুলতুলের মাথা ঝিম ঝিম করছে আর অম্বর বক্সির ঘুমে চোখ ঢুলে আসছে। নিজেদের মোটরে ওরা ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরছে। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই দিনের বেলা নানা কাজে সমান ব্যস্ত থাকে, কথাবার্তা বলবার সময় কম হয়। তার জন্যে দুঃখ করবে না কেউ, যদি কাজের কথা থাকে তাহলে রাত্তিরে ঘুমোবার আগে সেরে নেয়। অন্য কথার দরকার কি! অন্য কথা ফুরিয়ে গেছে। ক্লাব থেকে বাড়ি ফেরবার সময় ভোর রাত্রে আজও শুধু টুকরো টুকরো দরকারী কথা হলো।
তুলতুলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে নিজেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রেখে অম্বর বক্সি জিজ্ঞেস করলো, ক্লাবের সাবস্‌ক্রিপসন আর সমস্ত খরচ এমাসেও ঠিক দিতে পারবে তো?
তুলতুল আস্তে উত্তর দিলো, আই থিঙ্ক সো।'

দৃঢ়স্বরে অম্বর বললো, ইউ মাষ্ট! তা না হলে ছবিতে নেমে কতগুলো বোকাদের সংগে ঘুরে আর কি লাভ হলো।

মৃদুস্বরে তুলতুল বললো, চৈতন্য ইজ এ নাইস ম্যান। আজ আমাকে আরও কয়েকটা অফারের কথা বললো।

কত টাকার অফার?

টাকা পয়সার কথা কিছু হয়নি।

অম্বর বক্সি শেয়ালের মতো দৃষ্টি নিয়ে বললো, তোমাকে ওরা যা অফার দেবে, আমি তার ডবল করিয়ে দিতে পারি—

বাট হাউ? তুলতুলের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

মানে, লোকগুলো হলো বোকার দল, চৈতন্য দ্যাট চ্যাটার বক্স উঃ, হি গেটস্ অন মাই নার্ভস্—

আহা ওরকম করে বোলো না।

মুচকি হেসে অম্বর বক্সি বললো, আই নো, ইউ হ্যাভ টেকন এ সর্ট অব ফ্যান্সি অন হিম—

ডোন্ট টক ননসেন্স, অফার ডবল করবে কী করে তাই বল?

মানে, লোকগুলোর ওয়ার্থ কিছু নেই, কাজ গুছোবার জন্যে অ্যাট র‍্যানডম ওরা মিথ্যে কথা বলে, কমপ্লেক্সে ভোগে বলে আমাদের মত পাঁচজনের সংগে মিশতে পারলে ধন্য হয়ে যায়—

আঃ, ইউ আর টকিং ননসেন্স অম্বর!

অম্বর বক্সি ঘাবড়ে গিয়ে বললো, ওদের মধ্যে যে তোমাকে পাঁচ হাজারের কনট্রাক্ট দিলো, তাকে একদিন ডিনারে ডাকো, আমিও আর পাঁচজনকে বলবো, গোটা দুই আই-সী-এস, অ্যাম্বেসেডার ডেজিগনেট এই রকম আর কী।

অবাক হয়ে তুলতুল বললো, কিন্তু তাতে কি হবে?

ওই বোকাগুলো আমাদের হাতে রাখবার জন্যে তোমার কনট্রাক্টের টাকা ডবল করে দেবে—

যাঃ—

লেট আস টেক এ চান্স। আমাদের সংগে ঘনিষ্ঠতা করবার জন্যে ওরা এখন

সব করতে পারে। বাই দি ওয়ে, একটু থেমে অম্বর বললো, ছাট অ্যাকট্রেস, কী ওর নাম, হৈমন্তী সীমস্ টু বি কোয়াইট প্যালে উইথ দেম ?
তুলতুল বললো, হ্যাঁ ওদের খুব বন্ধু।
কাজ গুছোবার জন্যে ওদের হাতের কাছে সব সময় একজন মেয়েমানুষ থাকা দরকার, আই থিঙ্ক ছাট অ্যাকট্রেস ইজ ছাট সর্ট অব ওয়েপন।
হোয়াট ডু ইউ মীন ?
ঈষৎ জড়ানো স্বরে অম্বর বক্সি বললো, কোনো প্রডিউসার, কোনো কড়া লোককে হাত করে কাজ গুছোতে হলে মেয়ে ছাড়া হয় না। তাই ফিল্মের লোকরা যেখানে শক্ত ঠাঁই সেখানে সব সময় একটা মেয়েকে নিয়ে যায়। পাওনাদার বিদায় করতে হলে ওর মত সহজ উপায় আর নেই। মিড়লক্লাশ লোকদের একটু কমপ্লেক্স আছে তো, অ্যাকট্রেস-ট্যাকট্রেসরা যদি ওদের গায়ে মাথায় হাত বুলোয় কিংবা পাঁচ জায়গায় বলে বেড়ায়, আমি ওকে চিনি, কিংবা আমার সংগে ওর একটু ইয়ে আছে—
বিরক্ত হয়ে তুলতুল চিৎকার করে বললো, ইউ আর ড্রাঙ্ক অম্বর—
মে বি, বাট ক্লাবের চাঁদা আর খরচ তোমাকে চালাতে হবে, যদি কোনো মাসে বাকি পড়ে তাহলে ওই বোকাগুলোর নামে আমি কেস ফাইল করবো— চ্যাটার বক্স—বার্ণাড শ—হাঃ হাঃ হাঃ—পুওর শ' !

মেজর ঠকরের গলার স্বর রীতিমত মোটা। অভদ্র ভাষায় বলা যায়, হেঁড়ে গলা। তার ড্রাইভার থাকলেও রাত বিরাতে অনীতাকে পাশে নিয়ে সে সব সময় নিজেই ড্রাইভ করে। আজও করছিলো।
ডান হাতে আলগোছে ষ্টীয়ারিং ধরে বাঁ হাত অনীতার ঘাড়ের ওপর রেখে গলার স্বর যথাসম্ভব মধুর করবার চেষ্টা করে মেজর ঠকর বললো, আই অ্যাম ভেরি প্লিজড টু সি ছাট ইউ হ্যাভ ফাউণ্ড এ লট অব ফ্রেণ্ডস্!
অনীতা উত্তর দিলো না। কেননা সে জানতো ঠকর এরপর কী কথা বলবে। আজকাল ওদের আর ভালো বনিবনা হচ্ছে না। মেজরেরও বোধ হয় অন্য বন্ধু জুটেছে। পাঞ্জাবী মেয়েদের তো অভাব নেই এক্সটেন্সিতে। তারা কেউ নিশ্চয়ই তার ঘাড়ে ভর করতে চায়। অনীতা বেশ অনেকদিন আগেই

আকারে ইঙ্গিতে বুঝেছে যে ঠক্করের বাড়িতে তার আর খুব বেশিদিন থাকা চলবেনা। অন্য কেউ এসে তার স্থান দখল করবে। যেদিন প্রথম বুঝতে পারলো সেদিন থেকেই সে নিজের অন্য ব্যবস্থা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু ছবিতে নামা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তার যা সামান্য সম্পত্তি আছে তা ভেঙে অবশ্য সে বছর খানেক বসে খেতে পারে। কিন্তু তারপর? না, একটা বাড়ি তার সব চেয়ে আগে করে রাখা দরকার। এই বুদ্ধি মাস ছ'য়েক আগে হলে ঠকরকে দিয়েই সে কাজ উদ্ধার করিয়ে নিতে পারতো।

তার ভাবনায় বাধা দিয়ে আবার ঠক্করের কর্কশ কণ্ঠস্বর বাজলো, মা বাবা আসছে কলকাতায়—

কবে?

মাসখানেকের মধ্যে, ওরা আলিপুরেই থাকবে—

অনীতা দৃঢ়স্বরে বললো, তার আগে আমি তোমার বাড়ি ছেড়ে দেবো।

ওঃ নো নো, লজ্জা পেয়ে অনীতাকে আদর করে মেজর ঠক্কর বললো, আই ডোণ্ট মীন দ্যাট—

আই কোয়ায়েট আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড হোয়াট ইউ মীন।

এসব নিয়ে ঠক্করের সংগে অনীতা বেশি আলোচনা করতে চায় না। কিন্তু তার পুরো পাওনাও মিটিয়ে নিতে চায়। একথা ঠিক যে তার ওপর নির্ভর করে অনীতা স্বামীর নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে আসেনি। কমলাক্ষকে তার শেষের দিকে একেবারে অসহ্য মনে হতো। সংসারের বাঁধা-ধরা নিয়ম মেনে চলবার জন্যে সে জন্মগ্রহণ করেনি। সে নিজের ওপর নির্ভর করেই বেরিয়ে আসে আর তখন ঠক্কর যেচে তাকে সাহায্য করতে চায়। ঠক্করের চেহারা চাল চলন ব্যবহার সবই অনীতার ভালো লেগেছিলো। তার বাড়িতে এসে ওঠবার পর তার মনে হলো ঠক্কর সত্যিকারের পুরুষ। কিন্তু তবু তাকে বিয়ে করবার কল্পনা সে কোনদিনও করেনি। বিয়েতে তার আর আস্থা নেই। সে চেয়েছিলো মুক্ত স্বাধীন জীবন। স্বামীর কথায় ওঠা বসা, পার্টির লৌকিকতা মেনে চলা, হাসি না পেলেও হাসা—এসব করে করে তার ব্যক্তিত্ব যেন একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিলো।

কমলাক্ষ মিত্রের ঘর ছেড়ে বাইরে পা দিয়ে প্রথম তার মনে হলো সে একেবারে স্বাধীন। তাই আশ্রয় হারাবার কথা হলে সে মোটেও বিচলিত হয় না শুধু ভবিষ্যৎ কর্তব্য স্থির করে নেবার জন্যে সামান্য গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণের জন্যে চিন্তা করে মাত্র।

মেজর ঠকরের বাড়ি তাকে অবিলম্বে ছাড়তে হবে। সে একমাসের সময় দিলেও অনীতা এ অপমানের পর সেখানে শান্তিতে নিশ্বাস নিতে পারবে না। অন্য কারোর সাহায্য নিতে তার আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। এবার সে একেবারে একা থাকবে। ছবিতে নেমে যা পাবে তাতে সে আরামে থাকতে পারবে। সিনেমার কথা মনে হবার সংগে সংগে অনীতার মনে ভেসে ওঠে হেরম্ব দত্তের কথা। ঠিক এই ধরণের মানুষ সে আগে কখনও দেখেনি। যে সমাজে সে এতোদিন বাস করে এসেছে সেখানে এমন মানুষের দেখা মেলে না। তাই ওদের সংগে ঘনিষ্ঠতা করতে কেমন যেন বেধে যায়, ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে ইচ্ছে করে। দেখা যাক কী হয়। দশহাজার টাকা হাতে পেলে হয়তো অনীতার মনের এই দ্বন্দ্ব ঘুচে যাবে। হেরম্ব দত্তর চোখের দৃষ্টি তার বড়ো ভালো লাগে, সে-চোখে সব সময় যেন সমবেদনা ফুটে থাকে।

আর একটি লোক বিক্রম দত্ত রায়। অনীতার পক্ষে বর্তমানে সবচেয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভর। কিন্তু তার কথা এখন ভাবতে ইচ্ছে করে না অনীতার। বিক্রম দত্ত রায়ের বয়স অনেক। আর সে কিছুতেই ভেবে পায় না অম্বর বক্সি তাকে নিয়ে এত মাতামাতি করছে কেন। প্রায়ই তাকে কাছে ডাকে, আদর করবার চেষ্টা করে, বাইরে নিয়ে যেতে চায়। সংগে সংগে তুলতুলের কথা মনে হতেই অনীতার সমস্ত শরীর জ্বলে যায়। অনীতা স্বামী ছেড়ে এসেছে বলে সে যেন তাকে বেশ কৃপার চোখে দেখে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে তুলতুলের গর্ব সে ভেঙে দেবে। তাহলে তার স্বামীকে নিয়ে ঘর করবে সে। কাল ডাক্তার মহিম উকিলের বাড়িতে অম্বর বক্সির সংগে অনীতা এইসব আলোচনা করবে। বড়ো রূপের অহঙ্কার তুলতুলের। কিন্তু কার কাছে অহঙ্কার করে সে? অনীতা তুলতুলের চেয়ে কোন অংশে কম।

মেজর ঠকর খুব জোরে ইলেকট্রিক হর্ণ বাজালো। অনীতা চমকে দেখে আলিপুরের বাড়ির গেটের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়েছে।

চৌরঙ্গী টেরেসে মীনা হালদারকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করে তার হাতে জোরে চাপ দিয়ে শিবেন বটব্যাল বললো, গুড বাই ডার্লিং, কাল হৈমন্তী চৌধুরীর ডিনার—

গুড বাই, এক মিনিট কী ভেবে মীনা বললো রাস্তাটার নাম চৌরঙ্গী টেরেস, কিন্তু আমার বাড়িতে ঢোকবার সময় কী মনে হয় জানো ?

কী ডার্লিং ?

চৌরঙ্গী টেরার, টলতে টলতে করুণ চোখে নিতান্ত অনিচ্ছায় মীনা বাড়ি ঢুকলো। সে ভেবেছিলো আজ আর কোনো গোলমাল হবে না, শরৎ নিশ্চয় ঘুমিয়ে থাকবে। কিন্তু শোবার ঘরে ঢুকতেই তার ভুল ভাঙলো। শরৎ হালদার ঘুমোয় নি, ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়ে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে কী একটা ইংরেজী পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছে।

মীনাকে দেখেই পত্রিকা দূরে ছুঁড়ে ফেলে শরৎ হালদার কর্কশ স্বরে চিৎকার করে উঠলো, হোয়ার হ্যাভ ইউ বীন সো লং ?

এক্সটেসিতে পার্টি ছিলো।

বাট আই ইনভাইটেড সো মেনি গেষ্টস্, খেয়াল ছিলো না ?

মীনাও চিৎকার করে উঠলো, দে আর ইউর ফ্রেণ্ডস নট মাইন—

সাট আপ, ইউ আর এ প্রষ্টিটিউট, আই উইস আই কুড স্যুট ইওর ম্যান ব্লাডি শিবেন বটব্যাল—

যা খুশি করো, বাট আই অ্যাম টায়ার্ড, দয়া করে আমাকে একটু ঘুমোতে দাও !

হঠাৎ মীনার একটা হাত সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরে আরও জোরে বললো শরৎ হালদার, সেই রাস্কেলের সংগে ঘুমোতে পারো নি ?

ওঃ শরৎ ইউ আর এ বীষ্ট !

আমি তোমাকে খুন করবো।

মীনা হাঁপাতে থাকে। উত্তর দিতে পারে না। ওর সমস্ত শরীরে ভয়ের অদ্ভুত শিহরণ খেলে যায়। ও বোধ হয় টলে পড়ে যাবে। শক্ত করে ড্রেসিং টেবিল চেপে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে শুধু বলে, তুমি কি কিছুতেই আমাকে মুক্তি দেবে না ?

না না না, আমি যতোদিন বেঁচে আছি ততোদিন ইচ্ছে মত মজা করতে তুমি কিছুতেই পারবে না।

কিন্তু আমার তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না দেখতে পাচ্ছো না? এই তো ভোরবেলা বাড়ি ফিরলাম তবু কেন তুমি শিবেনের নামে অ্যাডালটারি চার্জ আনছো না?

ও রাস্কেলের পেছনে আমি গুণ্ডা লাগাবো।

যা খুশি করো, কিন্তু আমাকে তুমি মুক্তি দাও, আর যদি না দাও তাহলে আমি একদিন যেদিকে দু'চোখ যায় পালিয়ে যাবো!

তাই যাও। কিন্তু আই ওয়ার্ণ ইউ আমার এখানে প্রষ্টিটিউটের মত থাকা চলবে না—

হঠাৎ গর্জন করে মীনা বললো, সাট আপ! আমার সামনে এমন ভাষা ব্যবহার করতে লজ্জা করে না তোমার? কে তুমি? কে চেনে তোমাকে?

একটু ঘাবড়ে গিয়ে শরৎ হালদার বললো, এটা তোমার ষ্টুডিও নয়, অ্যাকটিং করতে হয় ষ্টুডিওতে গিয়ে করো—

আমার যা খুশি আমি তাই করবো। দেখি তুমি কী করতে পারো। আমি এই বাড়িকেই ষ্টুডিও করে তুলবো। আমার টাকা নেবে আবার চোখও রাঙাবে, কুড ইউ এভার ড্রিম অব মিলিয়ানস? মীনা হাতের কাছের ছাইদান ছুঁড়ে মারলো শরৎ হালদারের দিকে। তারপর ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হেরম্ব দত্তর ঝড়ঝড়ে ওপেল গাড়ি যথাসময় হৈমন্তীকে টালিগঞ্জে তার বাড়ির কাছে নামিয়ে দিলো। চৈতন্য জানালো যে সে শিগগিরই এসে রাত্তিরের নেমন্তন্নের ব্যাপারে তাকে সাহায্য করবে। খুব বেশি ব্যস্ত হবার দরকার নেই, খাটো বাবুর কাছ থেকে কচি পাঁঠার ভালো মাংস সে সংগে করে নিয়ে আসবে। হাসতে হাসতে হৈমন্তী পা টিপে টিপে এসে খিড়কির দরজার চাবি ঘোরালো। ফিরতে রাত হলে আজকাল সে এমনি চাবি সংগে নিয়ে যায়। হৈমন্তী নিজের সৌভাগ্যের কথা মনে করে হাসছিলো। চৈতন্যর মত মানুষ কি না সব সময় তার ভাবনা ভাবে। কাকে সে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবে সেকথাও ভোলে না। এমন মানুষকে কেমন করে যোগ্য প্রতিদান দেবে হৈমন্তী?

নিজের ঘরে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কানের টাব খুলতে খুলতে অকারণে সব ভুলে হৈমন্তী কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

আজ কাদের দেখলো সে? কে তাকে এদেরই একজন করে তুললো? সে চৈতন্য, সে যে তারই চৈতন্য। আনন্দে হৈমন্তীর সমস্ত দেহমন যেন কেঁপে উঠলো। এত খুশি সে রাখবে কোথায়।

তার ঘরের আলোর একটি রেখা গিয়ে পড়েছে কৈলাসের ঘরে। সেই রেখায় হঠাৎ কৈলাসের দিকে হৈমন্তীর চোখ পড়লো। সে দেখলো পাশের ঘরে বাবলু খোকনকে দু' পাশে নিয়ে কৈলাস অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

স্বামীর মুখ দেখবার সংগে সংগে হৈমন্তীর সমস্ত আনন্দ যেন মুহূর্তে উবে গেল। ঘিন ঘিন করে উঠলো তার শরীর, টিকটিকির গায়ে হাত পড়লে মানুষের মনের অবস্থা যেমন হয়, হৈমন্তীর যেন ঠিক সেই অবস্থা হলো। চোখ বন্ধ করে তাড়াতাড়ি সে সেই দরজা ভেজিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

রাত আর নেই তখন ভোর হয়ে এসেছে। হোস্ পাইপ নিয়ে রাস্তায় লোক বেরিয়ে পড়েছে। জলের শব্দ দূর থেকে কাছে ভেসে আসছে। রাত্রির যতো আবর্জনা ধুয়ে যাবে যেন।

ক্লোজ আপ

বোধনা হৈমন্তীর পাশে পাশে এখন ছায়ার মত ফেরে। হৈমন্তীদি তার জন্যে অনেক করেছে। কিছু কিছু ইংরেজী শিখিয়েছে, কাঁটা চামচের ব্যবহার শিখিয়েছে, তা ছাড়া আদব কায়দা আর কোথায় কী বলতে হয়—এসব সম্পর্কে অসীম স্নেহে তাকে গড়ে পিটে নিয়েছে। তাই বোধনা এখন হৈমন্তীকে ছাড়া এক পা'ও চলতে চায় না। তার অবশ্য এখনও কোথাও চাকরি হয়নি, কিন্তু বিচলিত হবার কিছু নেই, শিগগিরই সে ভালো চান্স পাবে। চৈতন্য আর-হেরম্ব বাবু যখন কথা দিয়েছে তখন আর ভাবনা কী। বোধনাও খুব তাড়াতাড়ি সব বুঝে নিয়েছে। হুলো বাবুর কথায় সে আর বিশ্বাস করে না; কথায় কথায় মাইরি বলে না, আগের মত যেখানে সেখানে হি হি করে হেসে আবোল তাবোল বকে না। ব্যারিষ্টার, আই সী এস কিংবা বড়ো বড়ো চাকুরে যারা এক্সটেসি ক্লাবে যায়, তাদের নাম বোধনার মুখে ঘন ঘন উচ্চারিত হয়। হৈমন্তীর দেখাদেখি একদিন পার্ক ষ্ট্রীটের এক দোকান থেকে সেও চুল বব্ করে এলো। ব্যাস্ বোধনাকে আর দেখতে হবে না, এখন ছবিতে একটা চান্স পেলে সে দশজনকে দেখিয়ে দেবে তার ক্ষমতা কত।

অবসর সময়ে মাঝে মাঝে হৈমন্তীর সংগে সে মনের কথা বলে, ফিলিম লাইনের অনেক মেয়ে, জানো হৈমন্তীদি, ফ্ল্যাটারি করে বেড়ায়—

সে কি রে?

আমি কিন্তু ফ্ল্যাটারি একেবারেই পছন্দ করি না, আমি একজনকে নিয়ে থাকতে ভালোবাসি।

বোধনার কথার আসল অর্থ হৈমন্তী এতোক্ষণ পর বুঝতে পারলো। কিন্তু সে হাসলো না।

সহানুভূতির স্বরে বোধনাকে বললো, মানে সম্বন্ধে সিওর না হলে কখনও

ইংরেজী বলবি না, ওতে বাইরের লোকে হাসাহাসি করে। তারপর এখন চুল বব্ করেছিস, মুখে ভুল ইংরেজী একেবারেই মানায় না।

চোখ বড়ো করে বোধনা জিজ্ঞেস করলো, কী ভুল করলাম ?

ওটা ফ্ল্যাটারি নয় ফ্লার্টিং—বুঝলি ?

না কি ? আহা ওই হলো।

আর একটা কথা, কোয়ালিটি কিংবা ম্যাগনোলিয়ায় যখন আমাদের সংগে খেতে যাস তখন ওরকম রাক্ষসের মত গুব গুব করে খাবি না, দেখিস না তুলতুল অনীতা ওরা কত কম খায় ?

কী করবো, ওসব খাবার দেখলে ক্ষিধেয় পেট যে জ্বলে যায়। আমাদের বাড়িতে তো পেঁয়াজ রসুন ঢোকে না, সুক্তো, শাক আর বড়া খেয়ে খেয়ে জিব যে পচে গেল—

আমি সব বুঝি, বাধা দিয়ে হৈমন্তী বললো, কিন্তু এখন সব আধুনিক বড়ো ঘরের ছেলেমেয়েদের সংগে তোর আলাপ হবে, কতো রাজা মহারাজা বার বার নেমন্তন্ন করবে—

না কি ? হি হি হি, কবে রাজা মহারাজার বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে যাবো মাইরী—

আবার মাইরী ? হৈমন্তী গর্জে উঠলো।

বোধনা সংগে সংগে বললো, সরি, আই বেগ ইওর পার্ডেন!

কথাবার্তা বলবার সময় খুব সাবধানে বলবি, তানা হলে শুধু তোর একার নয়, আমার, হেরম্ববাবুর, তোর চিতুদা'র নাম একেবারে ডুববে। ওদের ওইসব বড়ো ঘরের ছেলেমেয়েরা দেবতার মতো পুজো করে।

আমি সব বুঝি কিন্তু শুধু ক্ষিধের সময় কিছু খেয়াল থাকে না, বাড়িতে ভালো খেতে পাই না কিনা—

সেকথা বাইরের লোককে জানাবার কী দরকার ? গরিব হওয়ার মত লজ্জার আর কিছু নেই।

কিন্তু গরিব না হলে ছবিতে নামবো কেন ? মোটা টাকা পেয়ে দু'টো ভালো-মন্দ খাবো পরবো বলেই না—

থাম থাম, হৈমন্তী সন্ত্রস্ত হয়ে চারপাশে তাকিয়ে বললো, তুই দেখছি

দিবি সব মাটি করে। বোকার মত এসব কথা খবরদার কারোর কাছে বলবি না।

তবে কি বলবো?

নাঃ, তোকে নিয়ে আমি আর পারলাম না, হৈমন্তী হেসে বললো, গরিব মেয়েরা কী চুল বব্ করে?

হ্যাঁ করে। হুলো বাবু একবার একটা রেফ্যুজি মেয়েকে চুল বব্ করিয়ে ছবিতে চান্স দিয়েছিলো। সে মেয়েটির একটিও পয়সা ছিলো না, হুলো বাবু তাকে সব খরচ দেয়। তারপর চালাক হয়ে কোন মাড়োয়ারীর সংগে সে পালিয়ে যায়। তখনই তো হুলো বাবুর সংগে আমার আলাপ হলো। আর সে সেই মেয়েটির ওপর রেগে গিয়ে আমাকে চান্স দিতে চাইলো।

গম্ভীর হয়ে হৈমন্তী বললো, এসব বাজে কথা লোকজনের সামনে কখনও বলবি না বোকা কোথাকার। এখন যা বলছি মন দিয়ে শোন, আর কখনও যেন এমন ভুল না হয়—

বাধ্য মেয়ের মত উৎসুক চোখে বোধনা বললো, বল শুনি?

তুই যে টাকার জন্যে ছবিতে নামতে যাচ্ছিস একথা যেন বাইরের একটি লোকও জানতে না পারে। তুই সব ছেড়ে ছবির দিকে ঝুঁকেছিস চিত্রশিল্পের উন্নতি করবার জন্যে—

ও বাবা, ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে বোধনা বললো, এসব কথা লোকে বিশ্বাস করবে? ওরা বড়ো চালাক, সকলের হাঁড়ির খবর রাখে কিন্তু হৈমন্তী দি—

অতো কথা তোকে ভাবতে হবে না, যা বলছি চুপ করে শোন। শুধু টাকার জন্যে লোকে ছবিতে নামে না, একটু থেমে হৈমন্তী বললো, মীনা তুলতুল অনীতা, এরা কি গরিব?

তা বটে।

তোকে যদি একবার গরিব বলে ফিলিমের লোকেরা ধরতে পারে তাহলেই তোর হয়ে গেল, কিছুতেই তুই আর বেশি টাকা পাবি না।

কেন? কেন? এই রে, ওরা বোধ হয় আমাকে গরিব বলে টের পেয়েছে হৈমন্তীদি, হেরম্ব বাবু চিতুদা এরা তো সবই জানে।

আহা ওরা তো আমাদের ঘরের লোক, হৈমন্তী স্নেহের হাসি হেসে বললো,

আসলে ওরা এতো টাকা দেখেছে যে ওসব গরিব বড়োলোক নিয়ে মাথা ঘামায় না, গুণ থাকলেই হলো—

রসিকতা করে বোধনা বললো, মানে মেয়েমানুষ হলেই হলো আর কি, হি হি হি—

ছিঃ ছিঃ, এসব অমার্জিত ভাষা কখনও ব্যবহার করবি না।

আমি জানি, তোমার সংগে ঠাট্টা করছিলাম।

গরিব বলে বুঝতে পারলে বেশি টাকা পাবি না এই জন্যে বলছি যে ওরা তাহলে ধরে নেবে তুই যা টাকা পাবি তাতেই ধন্য হয়ে যাবি। কিন্তু ধর, তোর যদি বড় বাড়ি থাকে, কুকুর বাবুর্চি বেয়ারা এই সব থাকে তাহলে ওরাও তোকে অল্প টাকা দিতে লজ্জা পাবে—

কিন্তু ওসব এখন কোথায় পাই বল তো? বাবা তো পুরুত?

ও বাড়িতে বেশিদিন তোর থাকা চলবে না। কিছু টাকা করে আলাদা ফ্ল্যাট নিবি।

আমি তো তোমার সংগেও থাকতে পারি?

তা পারিস কথাটা তাড়াতাড়ি এড়িয়ে গিয়ে হৈমন্তী বললো, কিন্তু কোথায় থাকবি না থাকবি সেকথা পরে হবে, আগে ছবিতে তো নাম, এখন যেখানে আছিস সেখানেই থাক, শুধু বুঝে শুনে চলবি। যদি সকলের সংগে ভালো রেস্তোরাঁয় খেতে যাস তাহলে প্রচণ্ড খিদে থাকলেও বেশি কিছু খাবি না। কী খাবেন জিজ্ঞেস করলে বলবি, এই একটু স্যুপ আর গোটা দুই স্যাণ্ডউইচেস। তারপর সাধাসাধি করলে এটা ওটা নিবি কিন্তু খাবি খুব আস্তে আস্তে যেন খেতে তোর একটুও ইচ্ছে নেই—

চিতুদা তো বাপু গবাগব যা পায় তাই উড়িয়ে দেয়, ওর বেলা দোষ হয় না কেন?

রেগে উঠে হৈমন্তী বললো, কথায় কথায় নিজের সংগে চিতুর তুলনা করবি না। চৈতন্যকে সকলে ছেলেমানুষের মত সরল মনে করে। তাছাড়া ওর টাকা আছে, ও লোককে লক্ষ টাকা পাইয়ে দিতে পারে। ওরা বড়লোক, যা করে তাই মানায়, কেউ কোনো দোষ ধরে না। কিন্তু তুই অমন করে খেলে সকলে ভাববে বাড়িতে খেতে পাস না, বুঝলি?—

গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বোধনা বললো, বুঝেছি। কী খাবো বললে স্যাণ্ডউইচ আর স্যুপ—

দূর বোকা, হৈমন্তী হেসে বললো, স্যুপ আর স্যাণ্ডউইচ।

ঠিক মনে রাখবো, তুমি দেখো হি হি হি—

হৈমন্তী যখন বোধনাকে এমনি দীর্ঘ কঠিন উপদেশ দিচ্ছিলো তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। শেষ গোধূলির মৃদু অন্ধকারে আস্তে আস্তে পৃথিবী ভরে যাচ্ছে। ঠিক সেই সময় বাইরে হেরম্ব বাবুর গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। একটু পরে চৈতন্য আর হেরম্ব এসে ঘরে ঢুকলো।

কোট দূরে ছুঁড়ে ফেলে চৈতন্য বললো, হ্যাল্লো বোধনা, ইউ লুক ওয়াণ্ডারফুল দিস ইভনিং!

ঠোঁট ফুলিয়ে বোধনা বললো, খালি মুখে বলেন, কই এখনও চান্স তো দিলেন না একটা?

হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, আর দেরি হবে না, এবার একটা বিরাট গল্প করবো তা'তে তুমি নিশ্চয়ই চান্স পাবে।

হৈমন্তী চোখে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, নতুন গল্পের কথা ভেবেছো বুঝি? কই আমাকে কিছু বলো নি তো?

এই এখন তোমার এখানে আসবার সময় রাস্তায় ভাবলাম।

তাই না কি? কী গল্প বলো না একটু শুনি?

অতো ভাবিনি, মাই ডার্লিং রিলিজ হবার পরই ভাবতে আরম্ভ করবো, গল্পের নাম হবে, তিন বহিন—মীনা তুলতুল আর অনীতা—

আঘাত পেয়ে হৈমন্তী বললো, এ ছবিতে বুঝি আমি থাকবো না?

নিশ্চয়ই, হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, তোমাকে বাদ দিয়ে আই কান্ট থিঙ্ক অব এনিথিং. গল্পটা পরে ভালো করে ভাববো।

ওগো বোধনা, ভাঙা গলায় হেরম্ব ডাকলো, হাতটা একটু টিপে দেবে এসো. হেরম্ব এসেই পাঞ্জাবী খুলে সটান খাটে শুয়ে পড়েছে।

আজ হেরম্ব দস্তুর বড় পরিশ্রম গেছে। অনীতা ষ্টুডিওতে এসেছিলো। তাকে প্রতাপ দেখাবার জন্যে মোটা শরীর নিয়ে ষ্টুডিওর চারদিকে ছুটোছুটি করতে হয়েছে। অনীতার কনট্রাক্ট হয়ে গেল, পাঁচ হাজার টাকার চেক প্রডিউসারের

কাছ থেকে আদায় করে তাকে দেয়া হয়েছে। সত্যি বাহাদুরী আছে বটে চৈতন্যর। সে না থাকলে হেরম্ব কিছুতেই অনীতার জন্যে আগাম টাকা আদায় করতে পারতো না। প্রডিউসার আজ কাল আর আগের মত কথায় কথায় চট করে টাকা বের করতে চায় না। এইজন্যে অবশ্য দায়ী ওই বিজয় সেন। সে এতো কম টাকায় ছবি করছে যে তিনি টাকা চাইলেই তার উদাহরণ দিয়ে বলেন, আগে কাজ হোক, পরে পেমেন্ট হবে, মিষ্টার সেন তো তাই করতে আরম্ভ করেছেন—

আজ চৈতন্যর সামনে তিনি আবার এই কথা বলেছিলেন। ব্যাস যেই না বলা চৈতন্য একেবারে তুবড়ির মত জ্বলে উঠলো। স্থান কাল পাত্র ভুলে সে চিৎকার করে প্রডিউসারকে বললো, উই ডু নট এক্সপেক্ট সাচ রিমার্কস কনসিডারিং আওয়ার ষ্টেটাস অ্যাণ্ড পোজিশ্যান ইন দি কোম্পানী। একটা চুনো পুঁটি ঠুক ঠুক করে চোরের মত কোথায় কী করছে তার জন্যে হোয়াট দি হেল ডু উই কেয়ার? একটা জাষ্ট সো সো ছবি করে কী বাহাদুরীটা করলো সে? উই হ্যাভ মেড ফিফটি হিট পিকচার্স। হোয়াই ডোণ্ট ইউ কাউণ্ট দেম? অল রাইট, আমাদের কথায় যদি চেক লিখতে আপনার ভরসা না হয়, কিপ দেম ফর দ্যাট ব্লক হেডেড বিজয় সেন। উই শ্যাল গেট আউট অব দিস রেচেড ষ্টুডিও এণ্ড জয়েন আগরওয়াল—

ব্যপার দেখে প্রডিউসার আর কোনো কথা বললেন না। পাঁচ হাজার টাকার চেক লিখে হেরম্ব দত্তর হাতে দিতে দিতে শুধু বললেন, নো মোর অ্যাডভান্স পেমেণ্ট ইন ফিউচার প্লিজ—

আবার চৈতন্য বললো, অলরাইট, উই উইল বি লুকিং ফর রেফুজি গার্লস দেন। বড় ঘরের মেয়েদের নামিয়ে যদি আপনি কোম্পানীর প্রেষ্টিজ বাড়াতে না চান তাহলে আমাদের কিছু বলবার নেই। •

প্রডিউসার গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেলেন। হেরম্ব আজ স্পষ্ট বুঝতে পারলো ভবিষ্যতে সত্যি তার কাছে থেকে এমন করে টাকা আদায় করা যাবে না। একটু ভয়ও হলো তার। চাকরি গেলে সর্বনাশ হবে। বাজার খারাপ। বাইরে বেরিয়ে কোনো কিছু করবার সম্ভাবনা নেই। যুগের হাওয়া হঠাৎ যেন ঘুরে গেছে। তাদের কেউ নেয় না, বিশ্বাসও করে না। চৈতন্য

চেঁচামেচি করলেও হেরম্ব দত্ত জানে তাদের করা ছবি কোম্পানীর নামেই চলে। তাদের নাম না থেকে যদি অন্য কারোর নাম থাকতো তাহলেও সমান চলতো।

কিন্তু যাহোক অতো কথা এখন ভেবে লাভ নেই। যা হবার তা হবেই। তবে প্রডিউসারকে চটালে কিছুতেই চলবে না। আজকের ব্যাপারটার জন্যে হেরম্ব দত্তর মন বেশ খারাপ হয়ে গেল। ঠিক আছে, কাল একসময় চৈতন্যর আড়ালে স্যার স্যার করে প্রডিউসারের মন ভিজিয়ে দিলেই চলবে।

কিন্তু পাঁচ হাজার টাকায় হেরম্ব দত্তর কাজ হবে না। অথচ প্রডিউসারকে আবার টাকার কথা কিছুতেই বলা চলবে না। কী করা যায়? হেরম্বর বেশ ভাবনা হলো। অনীতাকে যেমন করে হোক দশ হাজার টাকা দিতেই হবে। তা না হলে মান থাকবে না। ঠক্করের খপ্পর থেকে ওকে উদ্ধার করে আনতে পারলে হেরম্ব দত্ত নিশ্চিন্ত হয়।

ওহে চৈতন্য, হৈমন্তীর বাড়ি আসবার আগে হেরম্ব বললো, আর পাঁচ হাজারের কি হবে?

কিসের পাঁচ হাজার? কত টাকার চেক দিলো?

পাঁচ হাজারের।

হোয়াট! দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা—

আহাহা ধড়ফড় করো না, যাক গে যা দেবার দিয়েছেন, এখন বাকী পাঁচহাজার অঙ্ক কোথা থেকে জোগাড় করা যায় তাই বল?

তাহলে ওই পাঁচ হাজারই দিন না অনীতাকে, পুরোপুরি হাতে না আসবার আগে যা চায় তাই দেয়া কি ঠিক হবে?

না বাপু, দিতেই হবে, এ তোমার হৈমন্তী বোধনা নয় যে যা বোঝাবে তাই বুঝবে, এদের ডাইনে বাঁয়ে বড়ো-বড়ো অফিসার, ওসব পার্ট পেমেন্ট করলে কিন্তু ডিরেক্টারকে আর একেবারেই পাত্তা দেবে না—

ভেবে দেখি কি করতে পারি।

ঘাবড়ে গিয়ে হেরম্ব বললো, এ যাত্রা বাঁচাও চৈতন্য, তোমাকে বহুবার বহু টাকা দিয়েছি। এখন কি আর ভাববার সময় আছে? পাঁচ হাজার টাকার চেকটা তো কাল দিতেই হবে, আজ রাত্তিরে টাকার জোগাড় না করলেই নয়।

অতো কথায় কাজ কি, নিজের পকেট থেকে দিয়ে দিন না বাপু?

সব সময় ঠাট্টা করো না, আমার আবার টাকা কোথায়? দেড় হাজার টাকার বেশি সংসারের খরচ, মান রাখবার জন্যে পুরানো গাড়িটা রেখেছি, তোমার কাছে পাই—

থাক থাক আর ফিরিস্তি দিতে হবে না, হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, আপনার স্বভাব ঠিক মিডল ক্লাস লোকদের মত হয়ে যাচ্ছে, চলুন হৈমন্তীর বাড়ি, দেখি কি করতে পারি।

একটু বিরক্ত হয়ে হেরম্ব দত্ত বললো, সব সময় রসিকতা ভালো লাগে না, দেখছো মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। হৈমন্তী টাকা পাবে কোথায়?

হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, রসিকতা নয় হেরম্ব বাবু, আই অ্যাম অল ওয়েজ সীরিয়স, ঠিক বার্ণাড শ'র মত, তাই আপনারা আমাকে বুঝতে পারেন না, হাল্কা সুরে আমি গভীর কথা বলি—

বাজে কথা রেখে পাঁচ হাজার টাকা আজকের মধ্যে কেমন করে যোগাড় হবে তাই বল?

তবে শুনুন, দাঁতে সিগ্রেট চেপে চৈতন্য বললো, সেই ভুঁড়িওয়ালা মাড়োয়ারী আগরওয়াল সত্যি একটা ছবি করতে চায়, হৈমন্তীকেও চায়। প্রায়ই আমার কাছে ঘোরাঘুরি করে, চলুন আজ রাত্তিরে ওর কাছ থেকে পাঁচ হাজার অ্যাডভান্স নিয়ে আসি?

বাঃ, অমনি ভাবনার সংগে সংগে কোথাও কিছু নেই হুট করে টাকা এসে গেল, কি যে যাতা বল ছেলেমানুষের মতো—আর তুমিই বা ছবি করবে কি করে? নিজেদের ছবি করতে ইহকাল পরকাল লাগিয়ে দাও—

আহাহা, সে সব কথা ভাববার কি দরকার? লোকটার কাছ থেকে টাকা আদায় করে আগে আপনার উপকার তো করি, একটু ভেবে চৈতন্য বললো, টাকা আমি নেবো না, হৈমন্তী নেবে। আগরওয়ালকে বলবো, এখন টাকা না দিলে পরে এই অ্যাকট্রেসকে আর কিছুতেই পাওয়া যাবে না, এইসব বোলচাল আর কি, তারপর হৈমন্তীর কাছ থেকে টাকাটা ধার নিয়ে আমি আপনাকে দিয়ে দেবো।

যতো সব উদ্ভট কল্পনা, এ তোমার প্রিমিয়ারের দিলদরিয়া প্রডিউসার নয়। মাড়োয়ারীর বাচ্চার কাছ থেকে কাঁচা টাকা আদায় করা অতো সোজা নয়—

সেই জন্যেই তো হৈমন্তীকে নিয়ে যাচ্ছি। মেয়েমানুষের কাছে সব বাচ্চা কাঁচা হয়ে যায়। হৈমন্তীকে আগে থেকে একটু টিপে দিলেই চলবে।

কিন্তু সে কি রাজি হবে?

সে বিষয় আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তাকে আমি যা বলবো সব সময় সে তাই করবার জন্যে প্রস্তুত। তাকে আগরওয়ালের কাছে নিয়ে যাবো, টাকা আদায় করবো, ধার নেবো, তারপর আপনাকে সেই টাকা দিয়ে কর্তব্য শেষ করে নিশ্চিন্ত হবো।

এই ঠিক করে ওরা দু'জন সন্ধ্যেবেলা হৈমন্তীর বাড়ি এলো। এ পাড়ায় হৈমন্তীর বাড়ি থাকায় ওদের সকলের খুব সুবিধা হয়েছে। এখানে লৌকিকতা করবার দরকার নেই, যখন তখন যাকে খুশি নিয়ে এসে গল্প করবার কোনো বাধা নেই, কেউ আপত্তি করবে না; বরং খুশি হবে, ধন্য হবে। এখানে ক্ষিধে পেলে খাওয়া চলে। হৈমন্তী রাঁধে চমৎকার, যত্ন করে খাওয়াতে জানে। ঘুম পেলে যতোক্ষণ খুশি ঘুমোনো চলে। চৈতন্য ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করতে চায় না, যাকে পায় তার সংগে ঘন্টার পর ঘন্টা বক বক করতে ভালোবাসে। কিন্তু হেরম্ব বাজে বকতে ভালোবাসে না তাই সে যখন এখানে আসে তখন চৈতন্য আর হৈমন্তীকে গল্প করবার অবসর দিয়ে সটান খাটের ওপর পড়ে গরর গরর করে নাক ডাকে। একা এলে হৈমন্তীকে দিয়ে গা টিপিয়ে একটু আরাম পাবার চেষ্টা করে। আজ হৈমন্তী আর চৈতন্য কাজের কথা বলবে আর সেখানে বোধনা থাকলে হয়তো চৈতন্য আসল কথা ভুলে আবোল তাবোল বকতে আরম্ভ করবে তাই সে তাড়াতাড়ি বোধনাকে গা টেপবার জন্যে সরিয়ে নিয়ে এলো। পুরুতের মেয়ে, বেশ ভালো সেবা যত্ন করতে পারে, হেরম্ব এর আগেও তার প্রমাণ পেয়েছে।

ডাক শুনে বোধনা ছুটে এসে হেরম্ব দত্তর বুকের ওপর পড়ে বললো, হীড়ুদা তো আমাকে আজকাল ভুলেই গেছেন!

বোধনার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে হেরম্ব বললো, তোমাকে যে ভোলে তার প্রাণ বলে কিছু নেই, সে পাষাণ, কত বড়ো একটা রসিকতা করেছে মনে করে হেরম্ব বেশ জোরে হেসে উঠলো।

এতোই যদি ভালোবাসেন, পটপট করে হেরম্বর আঙুল মটকে বোধনা বললো,

দিন না 'অপবাদে' চান্স, এখনও তো ছবি শেষ হতে অনেক বাকী আছে, আপনি ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন।

মুচকি হেসে হেরম্ব বোধনার গাল টিপে মুখ দিয়ে আদর করবার শব্দ করে বললো, অপবাদ ? না না না, এ হতেই পারে না, অপবাদের তালিকায় তোমার নাম কিছুতে উঠতে পারে না, তুমি একটি পবিত্র ফুল !

কিন্তু কবে চান্স পাবো ?

হেরম্ব দত্ত তার কথার উত্তর দেবার আগে হৈমন্তী বললো, চল বোধনা, পরাটাগুলো নিয়ে আসি, জানো চিতু আজ তোমাদের পরাটা খাওয়াবো, আমরা দু'জনে মিলে নিজের হাতে বাড়িতে করেছি।

পাশ ফিরে ভাঙা গলায় হেরম্ব বললো, বাঃ বাঃ !

হৈমন্তীর কথা শুনে ওদের সকলকে শুনিয়ে বেশ জোরে বোধনা বললো, আমি কিন্তু ওসব কিছুই খেতে পারবো না, শুধু একটু স্যুপ আর গোটা দুই স্যাণ্ডোইচ—

সে কী ? ওসবও হয়েছে নাকি ? হৈমন্তী সীমস্ টু বি ভেরি হসপিটেবল, হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, কিসের স্যাণ্ডউইচেস খাবে বোধনা, হ্যাম, কাব অর্ টম্যাটো ?

কিছু বুঝতে না পেরে বোধনা বললো, স্যাণ্ডোইচ হি হি হি— হৈমন্তী দেখলো বোধনা গোড়াতেই এক বিভ্রাট বাধিয়েছে। ওকে বলে দেয়া হয়নি যে স্যাণ্ডউইচ অনেক রকমের হয়। কিন্তু এখন এদের সামনে স্যুপ স্যাণ্ডউইচের কথা তোলবার কী দরকার ছিলো ? যাহোক ভেতরে গিয়ে তাকে বোঝাবার জন্যে তার হাত ধরে টানতে টানতে হৈমন্তী তাড়াতাড়ি বললো, চল চল পরাটাগুলো আমরাই নিয়ে আসি নাহলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—

হৈমন্তী ভেতরে গেল আর এলো। পেছনে এলো কৈলাস আর সুশীলা ঝি। ওদের হাতে গরম পরাটার প্লেট আর দামী ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম।

হ্যাল্লো মিষ্টার চৌধুরী, কৈলাসকে দেখে হেসে হেরম্ব বললো, কোথায় থাকেন আজকাল ? আপনাকে যে আর দেখতেই পাই না ?

হেঁ হেঁ, মাথা চুলকে কৈলাস বললো, আপনারা কাজের কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তাই বিরক্ত করি না—

কারো অনুরোধের অপেক্ষা না রেখে রাক্ষসের মত সপাসপ গরম পরাটার

টুকরো মুখে দিতে দিতে চৈতন্য বললো, মিষ্টার চৌধুরী বোধ হয় এখন হোম অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, এফিসেন্ট হোম সেক্রেটারী, হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, —হৈমন্তী আমাকে একটু স্যালেড দাও, ভেরি ডিলিশাস ইনডীড!

কৈলাস ভেতরে যাবার পর খেতে খেতেই চৈতন্য কাজের কথা পাড়লো, আমাদের সংগে একটু বেরোতে হবে হৈমন্তী?

এদের সংগে বেরোবার জন্যে হৈমন্তী তো সব সময় পা বাড়িয়েই আছে। চৈতন্যের কথা শুনে সে বললো, বেশ, আমি তৈরী।

মানিকতলা স্কোয়ারের কাছাকাছি আগরওয়ালের কাছে যাবো।

বেশ বেশ।

পাঁচহাজার টাকার চেক তোমার নামে ওকে দিয়ে লেখাবো, টাকাটা কিন্তু আমাকে কিছুদিনের জন্যে ধার দিতে হবে?

ধার? হেসে হৈমন্তী বললো, ধার বল কেন চিতু? তুমি না থাকলে কে আমার নামে চেক লিখতো? হৈমন্তীর আরও বলতে ইচ্ছে করলো, আমার সব কিছুই তো তোমার, কিন্তু কী ভেবে আর সকলের সামনে সেকথা সে বলতে পারলো না, অর্থভরা চোখে চৈতন্যর দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো শুধু।

হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, শুনুন হেরম্ব বাবু, হৈমন্তী ইজ এ গ্রেটফুল পারসন, ইস ইন্‌ট্ সী?

হেরম্ব সব শুনে আনন্দে গদগদ হয়ে ধড়ফড় করে খাটের ওপর উঠে বসে ভাঙা গলায় বললো, হৈমন্তীর মত এমন উঁচু মনের মেয়ে আমি কখনও দেখিনি—

হৈমন্তীর বুক ভরে উঠলো। এদের মত লোকের কাছ থেকে এমন প্রশংসা ক'জন পায়!

হেরম্বর পায়ে সুড়সুড়ি দিতে দিতে হঠাৎ বোধনা জিজ্ঞেস করলো, আর কুকুর—টুকুর কামড়ায় নি তো হীড়ুদা? হেরম্ব বললো, না না, তবে এখনও বেশ ব্যথা আছে, উঃহু, কেন মনে করিয়ে দিলে বোধনা? দিন কয়েক আগে উহুহু করতে করতেএসে হৈমন্তীর খাটে ধড়াস ক'রে শুয়ে প'ড়ে হেরম্ব বোধনাকে খুবসাব ধানে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে বলেছিলো। অনীতার অ্যালসেশন্ ওকে দিয়েছিলো কামড় বসিয়ে। সে এক করুণ অবস্থা হেরম্বর। সে যন্ত্রণায় মরছে

কিন্তু মুখে 'নটি ডগ্' ব'লে কুকুরকে আদর করবার চেষ্টা করতে হচ্ছে। আর ওদিকে অনীতা তখন তার যন্ত্রণা গ্রাহ্য না ক'রে তার ভালো জাতের কুকুরের গুণাবলীর বর্ণনা এক সুরে ক'রে যাচ্ছে, সে কি মিষ্টার দত্ত? এ তো কখনও কাউকে কামড়ায় না, ভেরি পোলাইট ডগ। আপনি নিশ্চয়ই ক্রস্ করবার চেষ্টা করেছিলেন—

চা খাওয়া হয়ে গেলে বোধনাকে বিদায় ক'রে ওরা তিনজন বেরিয়ে পড়লো আগরওয়ালের বাড়ির দিকে।

সেদিন "অপবাদে"র একটা বড়ো স্যুটিং ছিলো। হৈমন্তীকে স্ল্যাকস্ পরে অনেকক্ষণ তুলতুলের সংগে দশ হাজার টাকা খরচ করে তৈরী করা সেটে দৌড়োদৌড়ি করতে হবে। তাই সকাল সকাল স্নান সেরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সে প্রসাধন করছিলো। আয়নায় মুগ্ধ হয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে রইলো সে আর মনে মনে নিজেকেই নিজে বাহাবা দিলো।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আয়নায় কৈলাসের ছায়া দেখে বিরক্তিতে তার মন ভরে গেল। এমন রূপ উপভোগ করবার জন্যে নিষ্ঠুর ভগবান একটা আপাংক্তেয় নিকৃষ্ট জীবকে কেন তার জীবনের সংগে বেঁধে দিলেন। মুখ না ফিরিয়ে নীরস স্বরে হৈমন্তী জিজ্ঞেস করলো, কি চাও তুমি এখন এখানে?

হেঁ হেঁ, বেরোবার আগে মনে করে কিছু টাকা দিয়ে যেও।

আরও বিরক্ত হয়ে হৈমন্তী বললো, কিসের টাকা?

খরচের।

এই তো পরশু দিন টাকা দিলাম। এর মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল? কি কর তুমি টাকা নিয়ে? নিজের রোজগার নয় বলে যা ইচ্ছে তাই করে টাকা উড়োতে খুব ভালো লাগে, না?

আমি আবার কখন উড়োলাম? পরশু তুমি তো মাত্র পনেরো টাকা দিয়ে বললে, চারশো টাকা আজ দেবে—

ষ্টুডিও থেকে না ফিরলে বলতে পারছিনা আজ টাকা দিতে পারবো কি না।

মাথা চুলকে কৈলাস বললো, বাড়িওলা আজ বিকেলে আসবে, কিছু টাকা ওকে না দিলেই নয়—

আদেশের স্বরে হৈমন্তী বললো, পরে আসতে বলো।

দু মাসের বাকি পড়েছে—

চিৎকার করে হৈমন্তী বললো, পড়ুক। তুমি কী কোনো কাজে লাগবে না? এক পয়সা রোজগার করবার ক্ষমতা নেই, বাড়িওলাকে ভালো কথায় বুঝিয়ে দুদিন সবুর করতে বলতেও পারো না?

অনেকদিন তো ফিরিয়ে দিয়েছি, তাছাড়া গয়লার টাকাও দেয়া হয় নি—

ঈডিয়ট, নিজে রোজ রোজ মাংস না খেয়ে আর কোট প্যান্টের অর্ডার না দিয়ে বাবলু খোকনের দুধের দাম জোগাতে পারো নি?

ধরা গলায় কৈলাস বললো, আমি মাংস খেতে চাই না, তুমিই তো জোর কর খেতে, স্যুটও তো তুমি—

থাক হয়েছে, হঠাৎ নরম হয়ে হৈমন্তী বললো, দেখি কী করতে পারি, হেরম্ব দত্তর গাড়ির হর্ণ শুনে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ষ্টুডিওতে এসে হৈমন্তী দেখলো তুলতুল আর চৈতন্য তার আগেই এসে গেছে। আর তুলতুলের ছবি নিতে অনেক চিত্রসম্পাদকও এসেছে। অতো বড়ো ঘরের বিদুষী বউ ঘনিষ্ঠভাবে চিত্রশিল্পের সংগে জড়িয়ে গেল এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কী থাকতে পারে।

কিন্তু আজ ষ্টুডিওতে হৈমন্তী ঠিক তেমন করে মেতে উঠতে পারছিলোনা। কৈলাসকে কঠিন কথা শুনিয়া এসেছে বলে তার মন বিষন্ন হয়ে আছে। সকলের সব দায়িত্ব যেন তাকে একা বহন করতে হবে। কিন্তু কাকে দোষ দেবে হৈমন্তী? অমন ভালোমানুষ স্বামীকে? কে চায় কৈলাসকে? সে বাড়ি থেকে চলে গেল হৈমন্তী যেন বেঁচে যায়। আবার পরমুহূর্তেই তার মনে হয়) আহা থাক, যাবে কোথায় বেচারী! দোষ কারোরই নয়, দোষ তার নিজের মাথার। কৈলাসকে দেখলেই তার রক্ত যেন গরম হয়ে যায়। কিন্তু কয়েকদিন থেকে সত্যি হৈমন্তীর মাথার ঠিক নেই। সেকথা বোঝবার মত বুদ্ধি কী কৈলাসের আছে। যতোক্ষণ সে বাড়িতে থাকে ততক্ষণ খালি টাকা দাও, টাকা দাও! টাকা কোথা থেকে দেবে হৈমন্তী? সে কী টাকা তৈরী

করবার কল? সে টাকা না দিতে পারলে সংসার কিছুতেই চলে না কেন? হৈমন্তীর যদি আজ শরীর খারাপ হয়, সে যদি অনেকদিন পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে তাহলে কী করবে কৈলাস? তখনও কী তার রোগশয্যায় এসে করুণ মুখে শুধু সংসারের দাবী পেশ করবে?

বেরোবার সময় কৈলাসকে আশ্বাস দিয়ে এলেও হৈমন্তী জানতো আজ ষ্টুডিও থেকে টাকা পাবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। আগাম টাকা চৈতন্য তাকে অনেকদিন আগে বাড়ি বয়ে দিয়ে এসেছে, বাকী টাকা ছবি মুক্তি পাবার পর পাওয়া যাবে। এতো তাড়াতাড়ি তার সব টাকা শেষ হয়ে যাবে সেকথা হৈমন্তী ভাবে নি। কিন্তু কৈলাস তো ভাবলে পারতো। লোকটার এতোটুকুও বুদ্ধি নেই। কিন্তু ভেবেই বা কী করতে পারতো কৈলাস? খরচ কিছুতেই কমানো যেতো না। এমনিতেই যথেষ্ট কম খরচ করে তারা থাকে। এখনও গাড়ি কেনে নি, কুকুর পোষে নি, রেফ্রিজারেটার আনে নি। আর কত খারাপ ভাবে থাকা যায়? তুলতুলের দিকে তাকিয়ে হৈমন্তীর কান্না পেলো। এসব তুচ্ছ ব্যপার নিয়ে ওকে তো মাথা ঘামাতে হয় না। এখানকার সকলেই জানে ওর টাকার কোনো দরকার নেই, পয়সার জন্যে তুলতুল বক্সি ছবি করতে আসে নি। তাই ওকে টাকা দিতে পারলে লোকে ধন্য হয়ে যায়। পাওনার অনেক বেশি দিয়েও ভাবে বুঝি কম দেয়া হলো।

হৈমন্তী কিছুতেই নিজের বর্তমান অভাবের কথা এখানকার একটি লোককেও জানাতে পারবে না, চৈতন্য আর হেরম্ব বাবুকে তো নয়ই। অনেকদিন আগে যদি বা বলা যেতো, এখন টাকার অভাবের কথা মুখ ফুটে সে আর উচ্চারণ করতে পারবে না। এখন সে এদের সব বন্ধুবান্ধবকে দেখেছে, যারা দামী দামী শাড়ি পরে বড়ো বড়ো হোটেলে খায়, যাদের স্বামীর আয়ের অন্ত নেই। তাদের কথা মনে করে নিজের অভাবের কথাও এদের ভুলিয়ে দিতে চায় হৈমন্তী। তা সে যেমন করেই হোক না কেন। তাকে এখন অন্যদের সংগে সমানে তাল রাখতে হবে। বাবলু খোকনের দুধ কমিয়ে দিতে হয় তাও স্বীকার। কিছুতেই কারোর কাছে আর সে হার মানবে না।

নতুন চুক্তির জন্যে তার কাছে যে লোক না আসে এমন নয়। কিন্তু তাদের সংগে দেখা না করে আজকাল হৈমন্তী বিদায় করে দেয়। চৈতন্য হেরম্ব যেখানে নেই সেখানে সে প্রাণ গেলেও কাজ করতে পারবে না। আরও একটা কথা সে বুঝতে পেরেছে যে ওরাও চায়না হৈমন্তী তাদের বাদ দিয়ে অন্য কোথাও অন্য কোনো কাজ করে। কেননা সে এখন এ লাইনের রথী মহারথীদের ছায়ায় আছে, সেখান থেকে শুধু টাকার জন্যে আজে বাজে লোকের সংগে ছোটো খাটো ছবিতে কাজ করলে শুধু শুধু নিজেকে সুলভ করা হবে। বিপুল সম্ভাবনা সার্থক করবার যে সুযোগ সে পেয়েছে তা নষ্ট করবার মত মুর্খ মেয়ে হৈমন্তী নয়। তার চেয়ে মুখ বুজে কিছুদিন কষ্ট সহ্য করা অনেক ভালো। শিল্পীর জীবনে সব সময় সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে এমন কথা নেই।

নাঃ, লেখকগুলোর জ্বালায় আর পারা গেল না, হৈমন্তীর পাশে দাঁড়িয়ে, সিগ্রেটের একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে চৈতন্য বললো, আই উইস আই কুড টিচ্ দি ব্ল্যাক রাইটারস্ হাউ টু রাইট ষ্টোরিজ।

কী হলো চিতু?

এতো বড়ো সাহস যে আমাকে তর্ক করে বোঝাতে চায় কী করলে ড্রামার টুইষ্ট বেশি হবে। কে ছবির জন্যে লেখক চায়? বোকার দল যতো সব। খাতা নিয়ে বাড়িতে ছুটোছুটি করে প্রাণ বের করে ছাড়তো—

চৈতন্যর পক্ষ নিয়ে সায় দিয়ে হৈমন্তী বললো, যা পাওনা চুকিয়ে দিয়ে ওকে বিদায় করে দাও না বাপু। সেটে এসে গোলমালের সৃষ্টি করবার ওর কী দরকার?

বের করে দিয়েছি ষ্টুডিও থেকে। যতো পাবলিসিটি দিচ্ছি ততো মাথায় চড়ে বসছে। বাংলা দেশে আবার লেখক আছে না কি? সিলি ফুলস্ এর দল সব।

হৈমন্তী হেসে বললো, আহা বেচারারা খেতে পায় না। আমার তো লেখক দেখলেই মায়া লাগে।

মায়া করা ভুল। ওদের হাড়ে হাড়ে শয়তানি। ওদের জন্যে রাস্তায় চলবার জো আছে, খালি বস্তা বস্তা রাবিশ, বই প্রেজেন্ট করে বলে, ছবি করুন, খুব

ফিল্ম পসিবিলিটি আছে—যেন কত বোঝে ফিলিমের। তারপর যখন আমাদের দৌলতে ভালো খায় দায় আর নাম হয় তখন বাইরে বুক ফুলিয়ে বলে বেড়ায়, আমার বই ফিলিম হচ্ছে, দেখো, আমার জন্যে কোম্পানীর নাম হলো—আনগ্রেটফুল ফুলস্—

ওদের আর ডেকোনা, এবার থেকে তুমি নিজেই লেখ।

কে ডাকে ওদের ? ওরাই তো ধর্না দিয়ে এসে জোটে। ফিল্ম হলে ওদের মান বাড়ে কিনা, যতো রাজ্যের কুৎসিৎ রোগা রোগা ছেলেমেয়ে নিয়ে আসে স্যুটিং দেখাতে, আমাদের সংগে মেশবার কল্পনা ওরা করতে পারে কখনও ?

যেমন ওদের চেহারা, হৈমন্তী হেসে বললো, তেমন, ওদের বোকা বোকা কথাবার্তা না চিতু ? আমার তো লেখক দেখলেই হাসি পায়। সেদিন কেমন গদ গদ হয়ে আমাকে বললো, আপনার অভিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি—এমন করে আজকাল যে কেউ কথা বলে তা আমার জানা ছিলোনা—

কিন্তু চৈতন্য বোধহয় হৈমন্তীর শেষ কথাগুলো শুনতে পেলোনা। তুলতুলকে দেখতে পেয়ে লাফিয়ে তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। সে চৈতন্যকেই খুঁজছিলো।

আপনার সংগে একটু কথা আছে আমার--

হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ বলুন, কী কথা ? এনিথিং প্রাইভেট ?

না না, একটু থেমে তুলতুল বললো, মানে কাল আমার জন্মদিন। আমার বিশেষ বন্ধুদের মিষ্টার বক্সি একটা পার্টি দিচ্ছেন, যদি সময় পান তাহলে আপনাকেও ছ'টার সময় দয়া করে আসতে হবে মিষ্টার গড়াই। তুলতুলের কথাশুনে চৈতন্যর দিশা হারিয়ে গেল। তার ইচ্ছে হলো অনেকক্ষণ লাফালাফি করে সকলকে খবরটা শোনায়। সেও কিনা অম্বর বক্সির মত ব্যারিষ্টারের স্ত্রীর বিশেষ বন্ধুদের দলে পড়েছে। আর তাকে পায় কে !

থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ মিসেস বক্সি, আই ফীল ফ্ল্যাটার্ড হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—চৈতন্য গড়াইএর হাসি আর কিছুতেই যেন থামতে চায় না।

কিন্তু তুলতুল চলে যেতেই চৈতন্য চোখে অন্ধকার দেখলো। এখন সে করবে কী ? জন্মদিনের ব্যাপার। একটা কিছু দেয়া দরকার। নিশ্চয়ই

অনেক বড়লোকের ভিড় হবে কাল হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে। এমন উপহার তুলতুলকে দিতে হবে যা দেখলে তাক লেগে যাবে সকলের। তুলতুলের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করবার এমন সুযোগ আর হয়তো জীবনে আসবে না। কাজেই যেমন করে হোক চৈতন্যকে একহাজার টাকা জোগাড় করতে হবে। কিন্তু এতো অল্প সময়ের মধ্যে টাকা সে পাবে কোথায়? কারোর কথাই তার এই মুহূর্তে মনে পড়লো না। তুলতুল যদি দু'একদিন আগে খবর দিতো তাহলে সে আগরওয়ালের চেক ভাঙিয়ে একহাজার টাকা নিজের কাছে রেখে বাকী চার হাজার হেরম্বকে দিতো। হেরম্ব অনীতাকে চেক দিয়ে দিয়েছে। এখন কিছুতেই সে চৈতন্যকে নিজের পকেট থেকে একটি পয়সাও দেবে না। খাটো বাবুও আজকাল চালাক হয়ে তাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। দেখা হলেই খরচের লম্বা ফিরিস্তি দেখিয়ে কাঁদুনি গায়। ওকে টাকার দরকারের কথা জানালেই জিজ্ঞেস করবে, কেন? কী দরকার? ছা'পোষা লোকের মত এই ধারনের নানা প্রশ্ন। ওসব মিডল ক্লাশ লোকের কথা শুনতে চৈতন্যর আর ভালো লাগে না। যেমন করে হোক কালকের মধ্যে পুরো এক হাজার টাকা তার চাই। কিন্তু কোথায় টাকা? কার কাছে যাবে সে? প্রডিউসারের মুখ দেখতে তার ইচ্ছে করে না। আর দেখেও কিছু লাভ নেই। টাকার কথা বললেই কোন উত্তর না দিয়ে তিনি বোধ হয় সংগে সংগে গাড়ি হাঁকিয়ে ষ্টুডিও থেকে বেরিয়ে যাবেন। চৈতন্য বোধহয় প্রথম বার সঞ্চয়ের কথা ভাবলো। সাধারণ সংসারী লোকের মত তার যদি একটু জমাবার অভ্যাস থাকতো তাহলে কিছুতেই আজ এমনি ভাবনায় পড়তে হতো না তাকে। হঠাৎ বিদ্যুতের মত তার মাথায় হৈমন্তীর ভাবনা ঝলসে গেল। ঠিক ঠিক। হৈমন্তী থাকতে তার ভাবনা কী? সে একটি কথাও জিজ্ঞেস করবে না, টাকা চাইলে ধন্য হয়ে টাকা দেবে। এক হাজার টাকা আছে কী তার কাছে? নিশ্চয়ই আছে। অনেক টাকা তো পেয়েছে সে এর মধ্যে। সে মেয়েমানুষ, তার থেকে কিছু কিছু করে জমিয়ে রেখেছে নিশ্চয়ই। চৈতন্য ঠিক করলো, কাল যেমন হেরম্ব দত্তর দরকারে হৈমন্তীর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছে আজ তেমন একহাজার টাকা নগদ নেবে তার নিজের দরকারে। কেনই

বা নেবে না? হৈমন্তীর জন্যে চৈতন্য অনেক করেছে। এখন যখন সময় এসেছে তখন তার জন্যে সেও বা কেন করবে না। তাকে করতেই হবে।

মনে মনে এই ঠিক করে চৈতন্য নিশ্চিন্ত হলো। এখন তাকে পাঁচজন চেনে, হ্যাণ্ডনোট কেটে সুদ দিয়ে টাকা ধার করবার কথা সে আর ভাবতে পারে না। ওসব কথা বাইরে চাপা থাকে না। লোকের কানে গেলে সব দিক পণ্ড হবে। সাঁধারণের ধারনা তার অনেক টাকা, কোথাও এমন ভাবে ধার করেছে শুনলে তার ওপর লোকের ধারনা খারাপ হবে। কেউ আর তাকে বিশ্বাস করতে চাইবে না। আর বিশেষ করে ঠিক এই সময় অমন দুর্নাম রটলে সে মহামুস্কিলে পড়বে। এখন কতো বড়ো অফিসারের সংগে তার দহরম মহরম, পরিচয়ের গণ্ডি আরও কতো বেড়ে যাবে, কপাল যখন খুলেছে তখন কত রানী মহারানী ঘর ছেড়ে সিংহাসনের মায়া ত্যাগ করে ছবিতে নামবার জন্যে তারই শরণ নেবে! কাজেই এখন ছোটো খাটো আজে বাজে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে তার চলবে কেন!

সন্ধ্যেবেলা হৈমন্তীর বাড়িতে বসে যথারীতি চা খেতে খেতে চৈতন্য কথা তুললো, তুমি আজকাল কেমন আছো হৈমন্তী?

খুব ভালো, হেসে খুশীতে যেন গলে গিয়ে হৈমন্তী বললো, তুমি কেমন আছো চিতু?

চৈতন্য গম্ভীর হলো। দেশলাইএর ওপর সিগ্রেট ঠুকলো কয়েকবার। তারপর বেশ জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবার ভান করে বললো, ভালো নেই, ভাবনায় ভাবনায় প্রায় শেষ হয়ে যেতে বসেছি—

কেন, কেন? ব্যস্ত হয়ে চৈতন্যর গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে হৈমন্তী জিজ্ঞেস করলো, কী ভাবনা তোমার?

সব কথা সকলকে বলা যায়না হৈমন্তী, চৈতন্য করুণ চোখে ওপরে তাকিয়ে সিগ্রেট খেয়ে যেতে লাগলো।

বাঃ বেশ, অভিমান করলো হৈমন্তী, আমাকেও বলতে পারো না? আমি কী তোমার কেউ নই চিতু?

তোমাকে বলতে পারি না এমন কোনো কথা আমার নেই হৈমন্তী, আজ যে

ভাবনা আমি ভাবছি তা শুনলে আমি জানি তোমার খুব দুঃখ হবে কিন্তু তুমি কিছু করতে পারবে না।

তুমি বল। কী করতে পারবো না পারবো আমি বুঝবো।

আমি যা উপার্জন করি, চৈতন্য বলতে আরম্ভ করলো, তাতে একজন লোক রাজার মত চলতে পারে, তার কোনো ভাবনা থাকবার কথা নয়। কিন্তু আমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন আমার কাছে এতো বেশি চায় আর তাদের সকলকে দিয়ে হঠাৎ এক সময় দেখি নিজের জন্যে একটি পয়সাও নেই—

সমবেদনার স্বরে হৈমন্তী বললো, তুমি বড়ো ভালো লোক চিতু। এতো সরল হলে লোকে শুধু ঠকায়, এবার নিজের কথা একটু ভাবতে আরম্ভ কর—

তুমি তো জানো হৈমন্তী, পরের দুঃখ দেখলে আমার বুক ভেঙে যায়, আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারি না।

হৈমন্তী মৃদুস্বরে বললো, সেকথা আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে!

চৈতন্য বললো, আজ খবর পেলাম আমার এক বন্ধুর ক্যানসার হয়েছে। তার স্ত্রী আমার কাছে এক হাজার টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে। টাকা না পাঠালে তাকে আর বাঁচানো যাবে না—

হৈমন্তী জিজ্ঞেস করলো, কোন বন্ধু তোমার? আমি কী তাকে চিনি?

না না, সে পাঞ্জাবে থাকে। ছেলেবেলায় আমরা এক ইস্কুলে পড়তাম। তার অসুখের কথা শোনবার পর থেকে আমি যে কী অশান্তিতে আছি, তোমাকে বলতে পারবো না হৈমন্তী।

হৈমন্তী হেসে বললো, তোমার মত লোকের পক্ষে এমন ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক, তা কী আর করবে, পাঠিয়ে দাও হাজার টাকা।

চৈতন্য হৈমন্তীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ম্লান হাসবার ভান করলো, পাঠিয়ে দিতে পারলে বড়ো অশান্তির হাত থেকে আমি মুক্তি পেতাম। কিন্তু এ মাসে এতো লোককে সাহায্য করেছি যে আমার কাছে এখন আর কিছুই প্রায় নেই।

প্রডিউসারের কাছ থেকে চাইলে তিনি নিশ্চয়ই এক কথায় তোমাকে হাজার টাকা দিয়ে দেবেন?

হাসলো চৈতন্য, তুমি তো জানো হৈমন্তী প্রাণ যায় তাও স্বীকার তবু আমি কারোর কাছে চাইতে পারি না। হ্যাঁ প্রডিউসারের কাছে পাওনা থাকলে

আমি নিশ্চয়ই চাইতাম, চাইতে হতো না, তিনি খাতির করে নিজেই ডেকে আমাকে দিয়ে ধন্য হতেন—

হৈমন্তী বাধা দিয়ে বললো, তাহলে কী করবে?

সেই ভাবনায় তো ঘুম হচ্ছেনা, টাকা না পাঠানো অবধি আমি ভালো করে খেতে পারছি না হৈমন্তী—

তোমার মত মানুষকে আমি চিনি না?

তাই তো তোমাকে একথা বললাম। আমি জানি আমার দুঃখে তুমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারবে না, একটা উপায় নিশ্চয়ই বের করবে—

আনন্দে হৈমন্তীর দেহ মন দুলে উঠলো, চৈতন্য তার কতো কাছের মানুষ। কার সাধ্য তাকে তার বুকের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। কিন্তু এখন কী করবে সে? হাজার দূরের কথা, তার কাছে বোধ হয় আর দশ টাকাও নেই। জমাবো জমাবো করে এখনও একটি পয়সাও হৈমন্তী ব্যাঙ্কে রাখতে পারে নি। দিনে দিনে শুধু তার খরচ বাড়ছে কিন্তু আয় বাড়ছে না। অবশ্য এসব কথা তার ভাববার সময় নেই। টাকা তার হবেই। "অপবাদ" মুক্তির অপেক্ষায় শুধু তাকে ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে। হৈমন্তীর মাথায় একটা নতুন কথা জাগলো। হ্যাঁ সে তাই করবে। চৈতন্য তাকে অনেক দিয়েছে। আজ সে যখন মুখ ফুটে তাকে নিজের দুঃখের কথা জানিয়েছে তখন তাকে সাহায্য করতেই হবে। কোনো ভাবনা তাকে বাধা দিতে পারবে না।

একটু দাঁড়াও, আস্তে আস্তে উঠে আলমারী খুলে হৈমন্তী এক জোড়া বালা বের করে চৈতন্যর সামনে রেখে বললো, এই নাও, এর দাম হাজার টাকা না হলেও সাত—আট শো টাকা নিশ্চয়ই হবে—

অবাক হয়ে বালা জোড়ার দিকে তাকিয়ে চৈতন্য বললো, এ কী?

আমার মা'র বালা, তোমার পায়ে পড়ি তোমাকে নিতেই হবে—

অসম্ভব! এ তুমি কী বলছো হৈমন্তী? মিষ্টার চৌধুরী—

ওটা আমার সম্পত্তি, শ্বশুর বাড়ির নয়, বালা আবার হবে, কিন্তু তার আগে তোমার মন শান্ত হওয়া দরকার, তা না হলে আমি এক মুহূর্তের জন্যে শান্তি পাবো না, হৈমন্তী চৈতন্যর পকেটে বালা পুরে দিয়ে বললো, ব্যাস এ সম্বন্ধে আর কোনো কথা নয়—

চৈতন্য তখন আর একটা নতুন সিগ্রেট ধরিয়ে বললো, না না, মানে, আফটার অল বালা,—পকেটে বালা পড়বার সংগে সংগে তার মনে একটা কাঁটা খচখচ ক'রে উঠলো যেন। এমন করে মিথ্যা কথা না বললেও চলতো, সত্যি কথা শুনলেও হৈমন্তী যে এমনি করে তার উপকার করতো সে বিশ্বাস চৈতন্যর আছে।

পরদিন আর কোন কাজে চৈতন্যর মন বসলো না। সকাল বেলা ঘুম ভাঙবার পর থেকে সে ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে লাগলো, কখন যে সন্ধ্যে হবে। কোনো রকমে খাওয়া দাওয়া সেরে হৈমন্তীর দেয়া বালা পকেটে নিয়ে প্রায় দু'টোয় সে সটান এসে হাজির হলো এলগিন রোডের মোড়ে লক্ষ্মী বাবুকা সোনা চাঁদিকা দোকানে। যাচাই ক'রে তার দাম হলো আটশো টাকা বারো আনা তিন পয়সা। ওতেই তার কাজ খুব ভালো ভাবে হবে। খুচরো পয়সা পকেটে রেখে চৈতন্য নোটগুলো গুনে দেখলো একবার। তিনশো টাকা আলাদা বুক পকেটে সরিয়ে রেখে পাঁচশো টাকা হাতের কাছে প্যাণ্টের পকেটে রাখলো। পয়সা কড়ি নেই তার হাতে একেবারে, শ'তিনেক টাকা নিজের কাছে থাক। আবার হঠাৎ কখন তুলতুলের জন্যে কী দরকারে লাগবে কে জানে!

লক্ষ্মী বাবুর দোকান থেকে বেরিয়ে চৈতন্য ডালহৌসী স্কোয়ারে হ্যামিলটনের দোকানে এসে ঢুকলো। এখান থেকে হীরের একটা কিছু কেনবার ইচ্ছে তার। তা ছাড়া হ্যামিলটনের নাম লেখা বাক্সটা থাকবে—সেটাও একটা কম কথা নয়। খুঁজে খুঁজে চৈতন্য হীরের এক জোড়া কানের টাব পছন্দ করলো। চারশো পাঁচ টাকা দাম। সেটা ওদের লোকের হাতে দিয়ে সে বললো, বেশ বড়ো দেখে তোমাদের নাম লেখা বাক্সে ভরে দাও।

দাম চুকিয়ে চৈতন্য নিউ মার্কেটে এসে কুড়ি টাকার ফুল কিনলো তারপর উসখুস করতে করতে ঘড়ি দেখলো, চারটে বাজতে তখনও কুড়ি মিনিট বাকী। কিন্তু তার আর এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাবার মত মনের অবস্থা নেই। হীরের টাব তুলতুলের হাতে তুলে দিতে না পারলে সে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। একটু আগে গেলে ক্ষতি কী! তুলতুল তাকে দেখে খুশী হবে নিশ্চয়ই। তার সংগে নিরিবিলিতে কথা বলবার সুযোগ হয়তো ভিড়ের মধ্যে হবে না। তাই একটু আগে যাওয়া ভালো। আরও অনেকের দেয়া উপহারের মধ্যে তার হীরের টাব মিশে গেলে মুস্কিল হবে। তুলতুল বুঝতেই পারবে না

চৈতন্য তার জন্ম দিনে কী দিলো। যতোই বাজুক, এখুনি তাকে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে যেতে হবে। খুশীতে ছটফট করতে করতে চৈতন্য ট্যাক্সি ডাকলো। তারপর ফুল যত্ন করে পাশে রেখে হাতের চাপ দিয়ে পকেটের মধ্যে হ্যামিলটনের হীরের কেস অনুভব করলো একবার। এই ছোটো দু'টো হীরকখণ্ড আর একটু পরেই স্পর্শমণি হয়ে উঠবে। তুলতুল হয়তো এই আশাতিরিক্ত উপহার পেয়ে প্রথমে খুব অবাক হবে। তারপর, চৈতন্য মনে মনে কল্পনা করবার চেষ্টা করলো, উজ্বল হয়ে উঠবে তার চোখ, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার দেখবে সে সেই হীরের টাব। তারপর চৈতন্যর মুখের দিকে বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকবে অনেকক্ষণ, এত দামী জিনিস দিয়েছ বলে ধন্যবাদ দেবার ভাষা হারিয়ে যাবে তার। আর তখন কী করবে চৈতন্য ? যদি সুযোগ হয় তাহ'লে তুলতুলকে তখুনি কানে পরতে বলবে সেই টাব। এমনি নানা কথা ভাবতে ভাবতে চৈতন্য এক সময় দেখলো ট্যাক্সি হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে ঢুকেছে। দারোয়ান গেট খুলে সেলাম করলো। তারপর চৈতন্য ট্যাক্সি থেকে নামতেই বেয়ারা তাকে সসম্ভ্রমে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে বিনীতভাবে কার্ড চাইলো।

হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, দারোয়ানের সামনে একগাল হেসে চৈতন্য বললো, কার্ডকা জরুরৎ নেই হ্যায়, মেমসা'ব কো বোলে গড়াই সা'ব সেলাম দিয়া—

জী হাঁ, বেয়ারা ওপরে চলে গেল। যথাসময়ে ফিরে এসে চৈতন্যকে জানালো, মেমসা'ব শোয়া হ্যায়, আপকো বৈঠনে বোলা।

ঠিক হ্যায়, চৈতন্য সিগ্রেট ধরিয়ে পা টানটান করে কয়েক মিনিটের জন্যে চোখ বুজলো।

কিন্তু তুলতুল আর আসে না। পাঁচটা বাজলো, সাড়ে পাঁচটা হ'লো, ছ'টা বেজে কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল তবু তুলতুল নিচে নামে না। কী ব্যাপার হলো? ঘুমিয়ে পড়লো না কী ও? বেশ হতাশ হয়ে চৈতন্য ভাবছিলো উঠে দাঁড়িয়ে বেয়ারার খোঁজ করবে কী না, এখন আর কেউ নেই। তুলতুলকে নির্জনে উপহার দেবার স্বর্ণসুযোগ চলে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় কী, কিছু করবার নেই তার। এসে যখন পড়েছে তখন চুপচাপ ঠায় তাকে এমনি ভাবেই বসে থাকতে হবে।

হঠাৎ চৈতন্যর মনে পড়লো হৈমন্তীর কথা। তার ঘরের সঙ্গে এ ঘরের কতো

জন্যাৎ। দামী ফার্নিচার, লেসের পর্দা, পুরু কার্পেট। দারিদ্র্য গোপন করবার জন্যে তাকে চেষ্টা করে ঘর সাজাতে হয়নি। হৈমন্তীর কথা ভেবে হঠাৎ মায়া হ'লো চৈতন্যর। সে তাদের বাড়িতে গেলে বেচারী কোথায় বসতে দেবে ভেবে পায় না।

হৈমন্তী তাকে এতোক্ষণ বসিয়ে রাখবার কথা কল্পনা করতে পারতো না। যদি করতো তাহ'লে চিৎকার করে বেরিয়ে আসতো চৈতন্য। জীবনে আর ওর বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতো না। কিন্তু এখানে বসে থাকতে খুব খারাপ লাগছে না তার। কার বাড়ির সাজানো ড্রয়িং রুমে সে বসে আছে সেকথাও ভাবতে হবে তো!

চৈতন্য স্লিপারের আওয়াজ শুনলো। তারপরই পেলো বিলিতি এসেন্সের মৃদু গন্ধ। পর্দা সরিয়ে তুলতুল বক্সি ঘরে ঢুকলো। তাকে দেখতে পেয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো চৈতন্য।

এই যে, হ্যাঃ হ্যাঃ, মেনি হ্যাপি রিটার্ন্স!

থ্যাঙ্ক ইউ, অল্প হেসে তুলতুল বললো, বসুন। আপনি বোধ হয় ভুল শুনেছিলেন মিষ্টার গড়াই, আমি ছ'টার সময় আপনাকে আসতে বলেছিলাম—

মোটেই ভুল শোনেনি চৈতন্য। তবে ইচ্ছে করে আগে এসে গল্পগুজব করবার কথা সে একেবারে চেপে গেল। তুলতুলের কথায় কান না দিয়ে ফুলের তোড়া তার হাতে এগিয়ে দিয়ে পকেট থেকে হ্যামিলটনের বাক্স বের করে বললো, মাই হাম্বল প্রেজেন্ট—

এ কী! ছি ছি ছি, সব ভুলে তুলতুল বললো, বসুন বসুন, ওয়াণ্ডাফুল!

হেঁ হেঁ, কিছু যদি মনে না করেন, মে আই রিকোয়েষ্ট ইউ টু ওয়্যার দেম নাও?

ততোক্ষণে তুলতুল কানের ফুটোয় ঢুকিয়েছে হ্যামিলটনের হীরের টাব, হাউ ডু আই লুক মিষ্টার গড়াই?

ওয়াণ্ডারফুল, খপ করে তুলতুলের একটা হাত শক্ত করে ধরে চৈতন্য বললো, অ্যাজ ইফ দে ওয়্যার স্পেশেলি মেড ফর ইউ!

তুলতুল চৈতন্যর কথার প্রতিধ্বনি করে বললো, ইউ আর ওয়াণ্ডারফুল মিষ্টার গড়াই, তারপর হঠাৎ চৈতন্যকে চুম্বন করে তাড়াতাড়ি তরতর করে সিঁড়ি

বেয়ে ওপরে উঠে গেল ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে কেমন মানিয়েছে দেখতে।

ওদিকে বড়োলোক ব্যারিষ্টারের সুন্দরী স্ত্রীর আকস্মিক মধুর চুম্বন পেয়ে চৈতন্যর মাথা ঘুরে গেছে। ধরাকে সরা মনে হলো তার। যাক্ এতোক্ষণ পর মনে মনে, নিশ্চিন্ত হলো সে। টাকা খরচ করা সার্থক হলো। আর ভাবনা নেই। তার গণনায় বড়ো একটা ভুল হয় না। বাকী ধাপগুলো সে অতি দ্রুত অতিক্রম করে যাবে। তার বাহাদুরীর গল্প হেরম্ব দত্তকে বলবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে। কিন্তু কোথায় হেরম্ব? সে হয়তো এখন অনীতা মিত্তিরের কাছে বসে ভাঙা গলায় প্রেমের কথা বলবার চেষ্টা করছে।

এতোদিন পর এই দুই বন্ধু যেন জাতে উঠলো। অনীতাকে পুরোপুরি ভাবে পেয়ে গেছে হেরম্ব। আর দু' একদিনের মধ্যেই তুলতুলকে পেয়ে যাবে চৈতন্য। তারপর কে কার কড়ি ধারে। ঝড়ঝড়ে ওপেল গাড়িতে শহরের রূপগুণ বিদ্যা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ সঙ্গিনী নিয়ে সারা ক'লকাতা ঘুরে বেড়াবে তারা দু'জন। যে সব মধ্যবিত্ত বোকারা ফিল্মের লোক বলে তাদের হীন চোখে দেখে সে-লোকগুলোর শিক্ষা হবে এবার।

হেরম্ব দত্তর কথা ভাবতে আরও অনেক কথা মনে পড়ে গেল চৈতন্তর। আসলে অনীতার ওপর তার একটু রাগ হয়েছে সম্প্রতি। সে হেরম্বকে যেন গ্রাস করতে বসেছে। হেরম্ব এমনিতেই একটু চালাক, তাকে আরও সাবধানী ক'রে তুলছে অনীতা। মানে যতোদিন অনীতা থাকবে ততোদিন তার কাছ থেকে আর একটি পয়সাও পাবে না চৈতন্ত। নেক্সর ঠক্করের বাড়ি ছেড়ে অনীতা উঠে এসেছে সুইন হো ষ্ট্রীটে। এতে বোঝা যায় তার সমস্ত ভার এখন হেরম্বকে বহন করতে হবে। হাসি মুখে তার সব দায়িত্ব নিয়েছে হেরম্ব। এর মধ্যে চৈতন্ত তার প্রমাণ পেয়েছে। কেননা পরের ছবিতে অনীতাকে নায়িকা করবার কথা হেরম্ব বার বার তাকে বলেছে। কথা শুনে চৈতন্ত মনে মনে ভেবেছে সে কি সম্ভব। এখন তুলতুলকে ছাড়া সে অন্য কাউকে নায়িকা করবার কথা ভাবতে পারে না। অনীতা ভালো ক'রে কথাই বলতে পারে না, সে আবার নায়িকা হবে কি? যতো বাড়াবাড়ি হেরম্বর। তার ওপর মীনা হালদার আছে, পরের ছবিতে তাকেও বাদ দেয়া চলে না। মাঝখান থেকে

উড়ো আপদের মত অনীতা এসে জুটেছে। তার ওপর এতো রাগ হয়তো চৈতন্যর হতো না। কিন্তু একেবারে প্রথমেই দশ হাজার টাকা বাগিয়ে নিয়ে চৈতন্যকে সে বড়ো মুস্কিলে ফেলেছে। সে টাকাটা তুলতুলের পেছনে খরচ করলে তার অগ্রসর হবার পথ আরও সুগম হয়ে যেতো।

যা হোক তুলতুলের জন্মদিনের পার্টির পর সে বেশ ভরা মনে পথে নামলো, পকেটের অবস্থাও খুব খারাপ নয় তার আজ। এখন সোজা হৈমন্তীর ওখানে যেতে হবে। আজ চৈতন্যর নিজের সম্পর্কে আরও বেশি উচ্চ ধারনা হলো। অজস্র বড়ো লোকের সংগে তুলতুল তার হাত ধরে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে বলেছে এবার থেকে তারা চৈতন্যর সব ক'টা ছবি দেখবে। তুলতুল আরও বলেছে, চৈতন্যর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বার্ণাড শ' সম্পর্কে এতো পড়াশুনো নাকি আর কারুরই নেই। সেকথা শুনে সকলে অন্য সব কিছু ছেড়ে চৈতন্যকে নিয়ে পড়লো। এমন সুযোগ হারাবার লোক, চৈতন্য নয়। লম্বা বক্তৃতা দিয়ে সে নিশ্বাস ফেললো।

ও বাড়িতে আজ বেশ কেটেছে চৈতন্যর। মায়ের পেট থেকে পড়বার পর থেকেই সে এমনি আবহাওয়ায় থাকতে চেয়েছে। বড় দেরিতে সুযোগ হলো তার। তাই হৈমন্তীর বাড়ি যেতে হচ্ছে ভেবে তার মন বেশ খারাপ হয়ে গেল। বোকা স্বামী, মধ্যবিত্ত সংসার আর নানা ঘরোয়া কথাবার্তা তার আর ভালো লাগে না। দেশ বিদেশের বড়ো অফিসার, তাদের রঙ মাখা ফর্সা স্ত্রী, রেফ্রিজারেটারে রাখা বোম্বাই আম, ঝলমলে শাড়ি, এলোমেলো কলরব, জিনের গন্ধ আর বিলিতি এসেন্সের সৌরভ—তার মন যেন ভ'রে দেয়, তাকে অনেক বড়ো ক'রে তোলে। আঃ! আজ তাকে দেখে; তার কথাবার্তা শুনে সকলে একেবারে মেতে উঠেছে। অনেকে প্রশ্ন করেছে। চৈতন্যর উত্তর শুনে নিঃসন্দেহে তারা ধ'রে নিয়েছে যে চিত্রজগতে সে ছাড়া আর যারা আছে তারা কেউ কিছু নয়। কিন্তু আম খাবার সময় সেই মিনিষ্টারের স্ত্রী তার মুখের দিকে অমন ক'রে তাকিয়ে ছিলো কেন? রেফ্রিজারেটারে রাখা ঠাণ্ডা আম খেতে খেতে চৈতন্য এমন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো যে সামাজিক নিয়মকানুনের কথা তার একেবারেই খেয়াল ছিলো না। তার জিব একটু বেশি বেরিয়ে পড়েছিলো, হাপুস হুপুস শব্দও করেছিলো হয়তো। পাকা আমের সংগে

মনে মনে সে তখন তুলতুলের তুলনা করছিলো। কাজেই তার সামাজিক আদব কায়দা ঠিক সেই মুহূর্তে খেয়াল থাকবার কথা নয়।

চৈতন্য হৈমন্তীর বাড়িতে যখন ঢুকলো তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। বিস্মিত হয়ে সে দেখলো হেরম্ব দত্ত আর খাটো বাবু সেখানে বসে আছে। অনীতার বাড়িতে না গিয়ে হেরম্ব হঠাৎ হৈমন্তীর বাড়িতে কেন বসে আছে সেকথা বোঝা তার পক্ষে কঠিন হলো। অনীতার আবার টাকার দরকার হলো না কি? আর খাটো বাবুকে দেখে চৈতন্য একটু ভয় পেলো। লোকটা মিঁউ মিঁউ করে টাকার তাগাদা দেবে না তো। কিন্তু চৈতন্য খাটো বাবুকে গ্রাহ্য করে না একেবারে। তিন তাড়ায় ভিজে বেড়ালটাকে থামিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে তার। তবু আজ তুলতুলের বাড়ি থেকে সগু ফিরে কারোর সংগে গোলমাল করবার ইচ্ছে তার নেই। এদের সকলকে সে শুধু নিজের বাহাদুরীর গল্প শোনাতে চায়।

এই যে হ্যাঃ হ্যাঃ, ওঃ আই হ্যাড এ ভেরি নাইস্ টাইম টু ডে, কত বিগ গানস্ এর সংগে আলাপ হলো! আই লাইক্‌ড্ মিসেস খাণ্ডেলওয়ালা ভেরি মাচ—সী ইজ দি ওয়াইফ অব কনভয় একষ্ট্রা অডিনারি মিনিষ্টার পারলামেনটারি—

বাধা দিয়ে হেরম্ব সংশোধন ক'রে দিলো, এনভয় একষ্ট্রা অর্ডিনারি অ্যাণ্ড মিনিষ্টার পেলিপোটেনস্তাবী—

আহা ওই হলো, হার মানবার লোক চৈতন্য নয়, হু এভার ইউ আর, যা দিনকাল, কাকে কখন কোথায় কনভয় নিয়ে যেতে হয় ইউ নেভার নো, তাই বললাম, কনভয় একষ্ট্রা অডিনারী। বিরাট আয়োজন করেছিলো তুলতুল। কী সব ক্রকারী আর চতুর্দিকে ক্লাটার অব বিউটিফুল শাড়িজ, ওঃ কী বলবো, আই অ্যাম রিয়েলি ভেরি হ্যাপী—

হেরম্ব বাবু যাননি কেন? হৈমন্তী জিজ্ঞেস করলো।

শুধু ওঁর বিশেষ বন্ধুদের জন্যে এই পার্টি, হ্যাঃ হ্যাঃ, হেরম্ব বাবুর বিশেষ বন্ধু অন্য লোক—

আঃ থামো চৈতন্য, হেরম্ব নিজের গালে হাত বুলিয়ে বললো, পরের গল্প তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেল। অনীতা ছবিতে নামবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আসলে তুলতুলের পার্টির বর্ণনা শোনবার জন্যে হেরম্বর একটুও উৎসাহ ছিলো

না। সে মনে মনে তুলতুলের ওপর বেশ রেগেছে। অনীতাকে বাদ দেবার কী দরকার ছিলো? তাকে ওরা একটু ছোটো করে দেখে। নিজেরা যেন সব এক একটি সতীর শিরোমণি। আর হেরম্বকে বললে কী ক্ষতি হতো তুলতুলের? বরং হেরম্বর অনেক লাভ হতো। আরও কতো বড়ো ঘরের উন্নতমনা মেয়ের সংগে আলাপের সুযোগ হতো। এই সামান্য উপকার যদি তুলতুল নিজের বুদ্ধিতে না করে তাহলে তাকে নানারূপে লোকের সামনে মেলে ধরবার এতো চেষ্টা করে কী লাভ হেরম্বর। সে ভাবলো দেখা হলে তুলতুলকে মিষ্টি করে দু'কথা শুনিয়ে দেবে।

কী হে চৈতন্য, হেরম্ব আবার বললো, গল্পের কথা কিছু বলছো না যে? এবার কিন্তু অনীতাকে হিরোইন করতেই হবে—

এবার আমি এক অদ্ভুত কাণ্ড করবো হেরম্ব বাবু। তিনজন নায়িকা নিয়ে ছবি করবো, আরও অনেক চরিত্র থাকবে কিন্তু তিনজন মেয়ে হবে প্রধান। আর বাংলা ছবি হলেও আমি ইংরেজী নাম দেবো, থ্রী সিষ্টারস্ ইন্ রু।

সে যা হয় করো কিন্তু অনীতাকে—

শুধু অনীতা কেন, তুলতুল, মীনা আর অনীতা তিনজনেই কাটিয়ে অ্যাকটিং করবে।

হৈমন্তী চাপা স্বরে বললো, আর আমি?

সে কথায় কান না দিয়ে চৈতন্য বললো, আপনি ঘাবড়াবেন না খাটো বাবু, মীনাকে আপনার খপ্পরে এনে ফেললাম বলে—

মাথা নিচু ক'রে কাঁদো কাঁদো স্বরে খাটো বাবু বললো, না বাপু ও সবে আমার দরকার নেই, উঁ উঁ, শিবেন বটব্যালের যা দাপট দেখলে ভয় লাগে। শুধু শুধু পয়সা খরচ ক'রে কী হবে? তার চেয়ে বেশ আছি আমি পাঠার ব্যবসা নিয়ে—

হাঃ হাঃ, রাইট ইউ আর, কিন্তু ইংরেজীটা এই বেলা শিখে নিন খাটো বাবু, না হ'লে নিজেকেও পাঠার মত জীবন কাটাতে হবে।

আঃ ওরকম ক'রে বলো না, হৈমন্তী খাটো বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, আমার তো এঁকে খুব ভালো লাগে।

উঁ উঁ, করুণ চোখে হৈমন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার মিঁউ মিঁউ করে

বললো খাটো বাবু, ওরা আমাকে সব সময় ঠাট্টা করে, কিন্তু আমাকে কারোর পছন্দ না হলে আমি কী করতে পারি উঁ উঁ !

হাঃ হাঃ হাঃ, সকলকে রোষ্ট মাটন খাইয়ে পছন্দ করতে বাধ্য করাতে পারেন খাটো বাবু।

ছাই পারি, তোমাদের কথা শুনে অমন কত পাঠা আমার শুধু শুধু জলে গেছে। সকলেই পাঁঠা পছন্দ করেছে কিন্তু আমার দিকে কেউ ফিরেও তাকায়নি—

খাটো বাবুর বলবার ধরন দেখে সকলে খুব জোরে হেসে উঠলো। তারপর এমন প্রায়ই হতে লাগলো। সময়ে অসময়ে চৈতন্ত আর হেরম্ব হৈমন্তীর বাড়িতে এসে শুধু তুলতুল অনীতা আর ওদের মত আরও পাঁচজনের আলোচনা করে। সেখানে কোন বড়লোকের সংগে আলাপ হলো, কে ম্যাগনোলিয়ায় নিয়ে গিয়েছিলো, কারা কনষ্টিলেশনে বিলেত গেল, কোথায় জাপান থেকে নতুন টি সেট এসেছে, কে গোয়ানিজ বাবুর্চি রাখলো—এমনি সব বড়ো বড়ো কথা।

হৈমন্তী আজও মুখ বুজে সব শোনে আর তার শরীরে শিহরণ জাগে, চোখে নামে স্বপ্নঘোর। সে ভাবে যে কবে তাকে নিয়েও এরা এমনি আলোচনা করবে ? কী আছে তার ? কেন এখনও কিছু হচ্ছে না ? বম্বে তাকে ডাকে, লক্ষ লক্ষ টাকা তার চাই। আর কতোদিন অপেক্ষা করবে হৈমন্তী ? তার আর কিছুতেই ধৈর্য থাকছে না। এমনি অবস্থায় দিন কাটাতে হলে তার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

এদিকে দিনে দিনে তার সংসার অচল হয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই খরচ কুলিয়ে উঠতে পারছে না সে। অথচ আশ্চর্য, কাউকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারবে না সে, কিছু বলবার উপায় নেই।

তবু চৈতন্তকে দেখলে তার সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়। তার জন্মে সে যেন জন্ম জন্ম সব রকম দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে রাজি। আবার একদিন তাকে জোর করে সারা রাত হৈমন্তী আঁটকে রাখলো।

শেষ শরতের রাত যেন অনেক মায়া বুকে নিয়ে এসেছে। আজ কী জানি কেন চৈতন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অকারণে হৈমন্তীর চোখে

শুধু জল জমে উঠেছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, যে মানুষটি তার এতো কাছে সে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে, আরও দূরে সরে যাবে। তাকে কিছুতেই হৈমন্তী ধরে রাখতে পারবেনা। যা থাকলে ধরে রাখতে পারতো তা তার নেই, যখন হবে তখন হয়তো এই মানুষটি তার এতো কাছে থাকবে না। কবে বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হবে হৈমন্তী? এতো পরিশ্রম করছে সে দিনরাত তবু কেন যথেষ্ট অর্থ সমাগম হচ্ছে না তার?

চিতু, আজকাল আমার কথা তোমার আর ততো বেশি মনে পড়ে না, না?

একথা কেন জিজ্ঞেস করছো হৈমন্তী?

আমায় মনে হয়।

একটু ভেবে চৈতন্য বললো, তোমার সংগে আমার সম্পর্কের কথা আমি তো তোমাকে অনেকদিন আগে বুঝিয়ে দিয়েছি?

দুই হাতে মুখ ঢেকে হৈমন্তী বললো, আমি ওসব কথা বুঝিনা, বুঝতে চাই না।

অধৈর্য হয়ে সব নষ্ট করে দিওনা হৈমন্তী।

কিন্তু তুমিই তো দূরে যাচ্ছো।

তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবার সাধ্য আমার নেই সেকথা বোঝ না কেন?

চৈতন্যকে খুব শক্ত করে চেপে ধরে হৈমন্তী বললো, রাতের অন্ধকারে তোমাকে নিবিড় করে পাই কিন্তু দিনের বেলা লোকের মাঝে আজকাল তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে রাখো কেন?

তোমার সম্ভ্রম রক্ষা করবার জন্যে।

না গো না, তা করলে আমার সম্ভ্রম রক্ষা করা হয় না। নিজেকে উপেক্ষিতা মনে হয় আর তুমি আমাকে মর্যাদা দিলে না এই ভেবে কান্না পায়, চৈতন্যর পুরু ঠোঁটে হৈমন্তীর পাতলা ঠোঁট ঠেকলো।

শরতের হাল্কা রাতে বাইরে যেন গলানো রূপো ঝলসে উঠছে। গন্ধ ভেসে আসছে ভরা শিউলির। চৈতন্যর শরীরে বিদ্যুতের স্পর্শ লাগলো। হৈমন্তীর পূর্ণ আত্মসমর্পণ অবহেলা করবার সাধ্য বোধ হয় কোনো মানুষের নেই। কেউ নেই কোথাও। সেই নির্জন অন্ধকার ঘরে শুধু দু'টি প্রাণ-চঞ্চল নরনারী।

কিন্তু অকস্মাৎ নিজের ওপর নিদারুন ঘৃণায় অবসন্ন হয়ে এলো চৈতন্যর সমস্ত শরীর। এমন অদ্ভুত গ্লানি তার দেহ মন আর কোনোদিনও আচ্ছন্ন করে নি। এ কী করলো সে! এখন দিনের আলোয় কেমন করে এ বাড়িতে আসবে? কৈলাসের সামনে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবে কেমন ক'রে? আর কেউ বিশ্বাস না করুক চৈতন্য নিজে তো জানে, শুধু এই জায়গায় সে খাঁটি থাকতে চেয়েছিলো। এমন ভাবনা এর আগে তার সত্যি কখনও হয় নি। তুলতুলের সংগে প্রথম দিন ডাক্তার উকিলের বাড়িতে বসে সে শুধু গল্প করেছে, তারপর অবশ্য অনেক বার গেছে সেখানে। কিন্তু তুলতুলের বেলায় কখনও এমন গ্লানি বোধ হয় নি তার। সে জানে তুলতুল নিজেই মুহূর্তে দেহ মনের সব ময়লা ঝেড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও হৈমন্তী তা পারবে না। তাই তাকে চৈতন্য শ্রদ্ধা করে। চৈতন্যর মত লোক গভীর মনের মেয়েদের কাছে নিজেকে স্বার্থপর বলে প্রমাণ করতে চায় না। তাদের কাছ থেকে সেও সম্মান পেতে চায়। হৈমন্তীকে সে সত্যি শ্রদ্ধা করেছিলো, তার উপকার করতে চেয়েছিলো, বন্ধুর মত তাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলো কিন্তু ভোগ করে স'রে যেতে চায়নি।

এমন সব কথা ভাবতে ভাবতে চৈতন্যর মাথা গরম হয়ে উঠলো। হৈমন্তীর মনে অন্য ধারনা সৃষ্টি করবার কী দরকার ছিলো? কী দরকার ছিলো আজ এখানে থাকবার? অথচ আজ থেকে হৈমন্তী তার সম্পর্কে অন্য কথা ভাববে, মনে করবে সে তার প্রেমিক। এই কথা পাছে ভাবে বলে চৈতন্য আজকাল মনে মনে ওকে এড়িয়ে চলতে চায়। যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। যত রাত্তির হোক, এখুনি তাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। আর অনেকদিন সে আসবে না এখানে। হঠাৎ হৈমন্তীর ওপর রাগ হলো চৈতন্যর। সেই তো নষ্ট করে দিলো সব। এখন শুধু তার কাছ থেকে যা তার প্রাপ্য নয় তা জোর করে আদায় করবার চেষ্টা করবে। একবারও বোঝবার চেষ্টা করবে না যে এমন ক'রে চাইলে চৈতন্যর মত লোক খুব সহজে তার ওপর শ্রদ্ধা হারাতে পারে। জীবনে নতুন কর্মের জোয়ার আনতে হলে হৈমন্তীকে আর তার আকাশ কুসুম কল্পনাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। তার জন্যে অনেক করেছে সে। আর কিছু করতে পারবে না। বড় বেশি

সাহস হৈমন্তীর। তাই সে এমনি করে তার চলার পথে কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকতে চায়। এইবার কোনো মায়া না করে নিষ্ঠুর হাতে কাঁটা তুলে ফেলবে চৈতন্য।

হৈমন্তীর দৃঢ় বন্ধন আলগা করতে করতে সে বললো, আমি বাড়ি যাবো, আমাকে ছেড়ে দাও।

সে কী? এতো রাত্তিরে কোথায় যাবে তুমি?

আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করোনা। আমাকে এখুনি যেতেই হবে আর, একটু থেমে চৈতন্য বললো, আমাকে এমন ভাবে কোনোদিনও থাকতে বলো না।

ভীষণ ভয় পেয়ে করুণ চোখে চৈতন্যর দিকে তাকিয়ে হৈমন্তী জিজ্ঞেস করলো, চিতু, তুমি কী আমার ওপর রেগে গেলে?

বেশ কঠিন স্বরে চৈতন্য বললো, আমাকে কোনো কথা তুমি জিজ্ঞেস করো না—ঠক করে দরজার খিল খোলবার শব্দ হলো। ঘরের বাইরে পা দিয়ে কি ভেবে ঘুরে দাঁড়িয়ে চৈতন্য আবার বললো, যদি টাকা করতে চাও তাহ'লে কারোর ওপর এমন দুর্বলতা রেখে নিজেকে ধ্বংস করো না। সময় খুব খারাপ। সব ভাবনা ছেড়ে এখন শুধু টাকার ভাবনা ভাববে—হৈমন্তীকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চৈতন্য তার বাড়ি থেকে সেই গভীর রাত্তিরে সত্যি বেরিয়ে গেল।

আর হৈমন্তী? তার চোখের সামনে যে ঘটনা ঘটে গেল তার অর্থ কিছুই সে বুঝতে পারলো না। কেন অমন শান্ত লোক হঠাৎ রেগে উঠলো তার ওপর? কী অপরাধ করলো সে? এমন নাটকীয় ব্যবহার চৈতন্য তো কখনও করে নি তার সংগে। এখন কী করবে হৈমন্তী? সে যদি আর ফিরে না আসে? তাহলে কোথায় যাবে হৈমন্তী? তার সমস্ত শরীর থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলো। পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠলো দেহ। কেন তাকে চলে যেতে দিলো? কেন নিজের দেহ দিয়ে রোধ করলো না পথ?

চৈতন্যর কি সাধ্য ছিলো তার বাঁধন ছাড়াতে—তাকে এমন ক'রে পায়ে দ'লে চলে যেতে?

মোচড় দিয়ে উঠলো হৈমন্তীর মন। সেও দেখে নেবে কেমন করে ভবিষ্যতে

এমনি নিঃসঙ্গ সে তাকে ফেলে যেতে পারে। হৈমন্তীর দুই চোখ ভ'রে দরদর করে হঠাৎ কখন প্রবল অশ্রুধারা নেমে এলো। এমনি আর এক রাত্রের কথা মনে পড়লো তার। সেদিনও তার চোখ থেকে অনেক জল ঝরেছিলো কিন্তু সে অশ্রু প্লাবনে আজকের মত এতো জ্বালা ছিলো না।

কোথায় গেল সেই রাত! কোথায় গেল সেই মানুষ! ঘর ভরে গেছে অনেক রূপালি ঢেউ এ। হৈমন্তী কোনোরকমে উঠে তাড়াতাড়ি সব ক'টা জানলা বন্ধ করে দিলো। আজ গাছের একটি পাতার কাছেও মুখ দেখাতে চায় না সে। বন্ধ ঘরের দেয়াল ঘিরে শুধু একটি প্রশ্ন সারা রাত ধ'রে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো, কি কারণ? কি কারণ?

মুক্তি

কোনো চিত্রপরিচালক যে এমন ক'রে দেশের লোককে ভালোবাসতে পারে, তাদের উন্নতি কামনায় এত প্রখর চিন্তাশক্তির পরিচয় দিতে পারে, "নন্দন চর" দেখবার আগে দর্শক সাধারণ সেকথা কল্পনা করতে পারে নি। শহরের সর্বত্র শুধু বিজয় সেনের জয়—জয়াকার। এ ছবিতে কোথাও কোনো অযথা আড়ম্বর নেই, কোনো অবাস্তব জিনিসের উদ্ভট হাস্যকর পরিবেশন নেই, যা সহজ সঙ্গত তাই যেন মূর্ত হয়ে উঠলো রূপালি পর্দায়। দর্শক চমকে উঠলো না কিন্তু আলো বাতাসের মত একান্ত আপনার জন ব'লে বিজয় সেনকে গ্রহণ করলো। এ ছবি যারা দেখলো তারা আর কোনোদিনও চিত্রজগতকে অন্য জগৎ ব'লে ভাববে না আর তার সংগে যারা সংশ্লিষ্ট তাদেরও অদ্ভুত অসামাজিক জীব ব'লে ধরে নেবে না। আমাদের বঞ্চিত সমাজের সংগে ছায়ালোকের দৃঢ় যোগসূত্র হাতে নিয়ে জনতার মাঝে নেমে এলো বিজয় সেন। একজন অতি প্রিয় দেশকর্মীর মত সম্মান সে পেলো।

ব্যাপার দেখে প্রথমটায় হক চকিয়ে গিয়েছিল হেরম্ব আর চৈতন্য। কিন্তু ভাঙলেও মচকাবার লোক নয় চৈতন্য। তাই মাটিতে বেশ জোরে জুতো ঠুকে বললো, আই মেক পিকচার্স ফরএ লিমিটেড ফিউ। ওসব গরিব দুঃখীর জন্যে আমার ছবি নয়। "অপবাদ" রিলিজ হ'লে দেখে নেবো বিজয় ব্লাডির দৌড় কতদূর! অতো বড়ো ব্যারিষ্টারের স্ত্রী আছে আমার "অপবাদে", সে একাই একশো।

চৈতন্য গড়াই এর কথা অবশ্য একাংশে সত্যি হলো। "অপবাদ" কয়েক দিনের মধ্যেই মুক্তি পেলো। কিন্তু কেউ উল্লেখ করলো না সে ছবির কথা। তুলতুলকে দেখতে যারা গেল তারা অর্ধেক দেখে বিরক্ত হ'য়ে উঠে চলে এলো। আর হৈমন্তীকে যে এতো কুৎসিত দেখাতে পারে তা কৈলাসের মত লোকও ভাবতে পারে নি। স্ল্যাকস্ প'রে সে যখন ছুটোছুটি

করছে তখন তাকে দেখে কোনো মাদ্রাজী সার্কাস পার্টির মেয়ে ব'লে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মোট কথা, বীভৎস দেখিয়েছে হৈমন্তীকে। তবু সমস্ত দেশের বেশির ভাগ কাগজওয়ালারা খুব বড়ো বড়ো অক্ষরে শুধু তুলতুলের উল্লেখ ক'রে তার অভিনয় এবং অন্যান্য সব কিছুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো। সে যে বাংলা ছবিকে অদূর ভবিষ্যতে উন্নতির চরম শিখরে তুলে দেবে সে-বিষয়ে তারা নিঃসন্দেহ।

দুঃখে বুক ভেঙ্গে গেল হৈমন্তীর। কোনো কাগজে তার উল্লেখ নেই, যেখানে সামান্য নামোল্লেখ আছে তার পেছনে আছে নির্লজ্জ ভাষায় আক্রমণ। সব দেখে শুনে হৈমন্তী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। তার প্রাসাদ ভেঙে পড়েছে। সে বুঝতে পারলো না তার ভাগ্য এতো নির্মম হয়ে উঠলো কেন! "অপবাদে" তার মত মেয়ের অপূর্ব চরিত্র সমর্থন করতে পারলো না দেশের লোক। আবার নতুন ক'রে তাকে আরম্ভ করতে হবে সেকথা ভেবে সে শিউরে উঠলো। আজকাল তার নিজেকে বড়ো নিঃস্ব মনে হয়। যেদিন প্রথম সে ছবিতে নামবার জন্যে মেতে উঠলো সেদিন তার পাশে ছায়ার মত ফিরতো চৈতন্য। আজ সেও বুঝি দূরে স'রে গেছে। এখন কার আশ্বাসে নতুন করে আবার অভিনয় সুরু করবে হৈমন্তী। কেমন করে কোন মুখে সে নতুন ছবিতে নামবার কথা পরিচালককে বলবে। তাকে দেখলে হয়তো এখন লোকের হাসি চেপে রাখা দায় হবে। হৈমন্তী অভিনয় করলে সে ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠবে তারা। কাজেই দিশাহারা হয়ে ঘরের মধ্যে একা গুমরে গুমরে জ্বলতে লাগলো হৈমন্তী। একদিকে নিদারুন অভাব, অন্যদিকে অন্ধকার ভবিষ্যৎ—কোথায় যাবে হৈমন্তী? কেমন ক'রে চালাবে দিন?

সে রাত্রের পর চৈতন্য যে আর আসে নি তা নয়। অনেকবার এসেছে, চা খেয়েছে, পরের ছবি সম্পর্কে হেরম্বর সংগে নানা আলোচনা ক'রে যথাসময় বিদায় নিয়েছে। হৈমন্তীর সংগে সে শুধু কাজের কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা বলে নি। তাকে শুকনো সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়েছে যে শিল্পীর জীবনে ভালো সময় খারাপ সময় আসেই। কিন্তু তাই ব'লে হাল ছেড়ে ভেঙে পড়লে চলবে না, অসীম ধৈর্যের সংগে অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু কিসের জন্যে অপেক্ষা করবে হৈমন্তী? কে তার হাত ধরে তাকে আবার নতুন ক'রে নতুন জগতের সন্ধান দেবে! চৈতন্য নিজের থেকে বোধ হয় আর তাকে শিগগির ছবিতে নামবার কথা বলবে না। বলবার উপায়ও নেই তার। কোম্পানীটা তার একার নয়, তাকে আগে ব্যবসায় লাভ দেখতে হবে। এখন দিনে দিনে নতুন ছেলে মেয়ের ভিড় বাড়ছে, তাকে খুঁজে বের করতে হবে অনেক নতুন মুখ। তারপর জনসাধারণ যখন যাকে গ্রহণ করে সে নিজেই সামনে এগিয়ে যায়। হৈমন্তী প্রথম ছবি করবার পর ভেবেছিলো তার কোনো ভাবনা নেই, চৈতন্যর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে। হয় তো সে এগিয়ে যেতে পারতো যদি প্রথম দিন তার সম্পর্কে যে উৎসাহ নিয়েছিলো আজও তার সে উৎসাহ অম্লান থাক তো। কেন সুরু না হতেই সারা হয়ে গেল সব। অভিমানে হৈমন্তীর বুক ভ'রে গেল। তার মনে হলো, সে সব সহ্য করতে পারে কিন্তু কোনো কারণেই কারোর কাছ থেকে অবহেলা সহ্য করতে পারে না। সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে আজ তাকে চৈতন্য অবহেলার চোখে দেখে। শুধু দেখে না, তাদের কথায় বার্তায় মীনা তুলতুল অনীতার সংগে তুলনা করবার সময় কেমন যেন তাচ্ছিল্য ফুটে ওঠে। অথচ আর কেউ না বুঝুক সে তো নিজে জানে ওদের চেয়ে অনেক ভালো অভিনয় সে করতে পারে। তবে কেন দেশের সংবাদপত্রগুলি তাকে বাদ দিয়ে তুলতুলের অতো বেশি প্রশংসা করলো। গরিব ব'লে সে কী মানুষ নয়? বড়ো ব্যারিষ্টারের স্ত্রী নয় ব'লে তার সব গুণগুলি কী ম্লান হয়ে যাবে? তকে এমন ক'রে পিষে মারবার কী দরকার ছিলো সকলের?

এমন ক'রে আর কিছুদিন কাটাতে হলে হৈমন্তী বোধ হয় পাগল হয়ে যাবে। আশা নেই, আলো নেই, রঙ নেই। যে অভাবের হাত এড়াবার জন্যে সে ছবিতে নেমেছিলো আজ সে অভাব যেন দ্বিগুণ স্ফীত হয়ে তাকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরলো। এ বাঁধন থেকে মুক্ত হবার জন্যে উন্মাদিনীর মত ছটফট করতে লাগলো হৈমন্তী।

রামময় মিত্র রোডের বাড়িতে যখন তাকে কেউ চিনতো না তখন হাজার অভাবের মধ্যে থাকলেও এমন ভাবনা কখনও হয়নি তার, মাথার মধ্যে এমন তীব্র যন্ত্রণাও অনুভব করে নি। অনটনের জন্যে সংসারে শান্তি না

থাকলেও আনন্দ ছিলো, আর তাই অর্থাভাব তার ভরা মনকে ক্ষত বিক্ষত করতে পারেনি। কিন্তু আজ তার সংসারে শান্তিও নেই, আনন্দও নেই, চারিদিকে আছে শুধু পৈশাচিক যন্ত্রণা, যার হাত থেকে কিছুতেই তার মুক্তি নেই। কেন এমন হলো!

অবশ্য মনের যন্ত্রণা দিয়েই তার নতুন অভিসার আরম্ভ হয়েছিলো। একদিকে চৈতন্য, অন্যদিকে কৈলাস আর মাঝখানে হৈমন্তীর ঘর ভাঙা বিপুল লোভ। তবু ভবিষ্যৎ অর্থসমাগমের সম্ভাবনায় সে এতো বেশি আনন্দে মেতে উঠেছিলো যে মনের যন্ত্রণা তার কাছে তখন শুধু বিলাস মাত্র ছিলো।

হৈমন্তী আর একবার প্রাণপণে মাথা তোলবার চেষ্টা করলো। সত্যিই তো সব শিল্পীর জীবনে দুঃসময় আসে। কিন্তু তাই ব'লে এমন ভাবে ভেঙে পড়লে চ'লে কখনও। উপবাসের মধ্যে থাকলেও তাকে চব্বিশ ঘণ্টা মনে রাখতে হবে যে সে শিল্পী। চৈতন্য হেরম্ব না থাকুক, আরও কত নতুন লোক আসবে, কত নতুন ছবি হবে, তাদের সংগে মিশে নিজেরও পথ করে নেবে হৈমন্তী। কিন্তু অসুবিধা হলো এই যে নতুনের সংখ্যা বড়ো কম আর এখন তার যা নাম তা'তে কেউই তাকে নিয়ে ছবি করতে সাহস করবে না। সকলের ঝোঁক তুলতুলের দিকে। আর আছে বিজয় সেন। কিন্তু তার কাছে কোনোদিনই হয়তো হৈমন্তী যেতে পারবে না। হেরম্ব, চৈতন্যর সামনে একই ষ্টুডিওতে অন্য পরিচালকের সংগে কেমন ক'রে কাজ করবে সে। বিজয় সেনও হয়তো তার সম্পর্কে আর উৎসাহ প্রকাশ করবে না। দেখা যাক কী হয়। এমন ভাবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে তিলে তিলে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে। যতো তাড়াতাড়ি যেমন করে হোক হৈমন্তীর একটা কিছু করা দরকার।

কিন্তু সব মানুষের যখন মনে হয় টাকার জন্যে অবিলম্বে কিছু করা দরকার ঠিক তখন কিছু করবার উপায় থাকে না, কোনো অবলম্বনও পাওয়া যায়না হাতের কাছে। এখন প্রতিদিনের সংসার খরচের টাকা কোথা থেকে যোগাড় করবে সে ভাবনায় ঘুম আসে না হৈমন্তীর। এক এক বার এক এক রকম কল্পনা করে সে। সে ব্যাবসা করবে, বীমা কোম্পানীর এজেন্ট হবে, কোনো আপিসে যে কোনো একটা চাকরি ক'রে দিন চালাবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনে হয়, তা'কি সম্ভব। এখন লোকে তার নাম জানে, সকলের ধারনা

সে ছবি থেকে অনেক টাকা করেছে, কাজেই কেউ তার কথা বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস করা দূরের কথা, এসব কথা যতো সহজে সে ভাবতে পারছে ততো সহজে কাজে কিছু করতে পারবে কী। কোথায় যাবে, কার কাছে দুঃখ জানাবে? যারা তার কাছের মানুষ সেই হেরম্ব চৈতন্যর কাছেই সে দুঃখের কথা জানাতে পারছে না, অন্যকে জানাবে কেমন করে! এসব ভাবনা এমন ক'রে তাকে পেয়ে বসতো না যদি চৈতন্য সেই আগের মানুষ থাকতো, তেমন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে পারতো। তাহ'লে তার জন্যে সব কিছু হৈমন্তী সহ্য করতে পারতো। কিন্তু কোথায় চৈতন্য! তাকে আজকাল বড়ো অচেনা মনে হয়, তার ব্যবহারও দিনে দিনে একেবারে অপরিচিতের মত মনে হচ্ছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা আর শরীরে অদ্ভুত ক্লান্তি নিয়ে পঙ্গু হয়ে হৈমন্তী কাটাতে লাগলো দিনের পর দিন।

ওদিকে নানা লোকের মুখে সব খবরই যথাসময় তার কানে আসে। হেরম্ব নিয়মিত অনীতার বাড়ি গিয়ে তাদের পরের ছবির আলোচনা করে। চৈতন্য গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে তুলতুলকে বার্ণাড শ'র অনেক নতুন তথ্য বোঝায়। মীনা আর শরৎ হালদারের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। শিগগিরই তার সংগে শিবেন বটব্যালের বিয়ে হবে। চৈতন্যর পরের ছবি নাকি অপূর্ব হবে। একা তুলতুলকে নিয়ে যদি দেশের লোক এতো মাতামাতি করে তাহলে তিনজনকে একসংগে দেখলে তো দেশসুদ্ধ লোকের মাথা ঘুরে যাবে। এবার চৈতন্য নাকি নিজেই গল্প লিখছে। ছবির নাম হবে, থ্রী সিষ্টারস্ ইন ব্লু।

কিন্তু এসব কথা শুনে প্রডিউসার নাকি ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছেন। উনি চৈতন্য আর হেরম্বর মুখের ওপর স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, ওসব আজে বাজে ছবি আর তিনি করতে দেবেন না। বিজয় সেনের মত ছবি তারা করতে পারলে ভালোই, না পারলে অন্য কোথাও গিয়ে যা ইচ্ছে করুক। অভদ্রের মত প্রডিউসার নাকি হেরম্বকে বলেছেন, অনীতাকে আগাম দেয়া পাঁচ হাজার টাকা ফেরৎ এনে দিতে।

হেরম্বর মত ঠাণ্ডা স্বভাবের লোক প্রডিউসারের মত গম্ভীর লোকের মুখ থেকে এমন কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। চৈতন্যর সংগে পরামর্শ করে ঠিক করলো, এখানে থেকে তাদের প্রতিভা নষ্ট ক'রে লাভ নেই।

বোকা বাঙালীদের নিয়ে রাজত্ব করুক বিজয়ের মত মূর্খ লোক তার চেয়ে বম্বে যাওয়াই ভালো। সেখানকার মানুষ নিশ্চয়ই তাদের কদর বুঝবে।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হেরম্বকে বম্বে পালাতে হলো বটে, শুধু লাখ টাকা করতে নয়, ভাঙা বুক জোড়া দিতেও। অর্থাৎ বিনা নোটিশে অনীতা হঠাৎ সেই এক্সটেসি ক্লাবের বিক্রম দত্তরায়কে বিয়ে ক'রে বসলো। আর এক সময় হেরম্বকে সে চিঠি লিখে স্পষ্ট জানিয়ে দিলো যে ছবিতে অভিনয় করায় তার স্বামীর একেবারেই সায় নেই, কাজেই সে ফিল্মে নেমে স্নেহময় স্বামীর বুকে ব্যথা দিতে পারবে না। সমস্ত বুঝে হেরম্ব দত্ত যেন তাকে নিজগুণে ক্ষমা করে ইত্যাদি।

অনীতার লেখা সেই চিঠি পকেটে ক'রে হেরম্ব ছলোছলো চোখে এসে ধড়াস ক'রে হৈমন্তীর খাটে শুয়ে পড়লো। বুড়ো বয়সে ভদ্র ঘরের কচি মেয়ের কাছ থেকে এমন আঘাত পেয়ে সে দিশা হারিয়ে ফেলেছে।

এদের সম্পর্কে হৈমন্তীর আতিথেয়তা জ্ঞান এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি তাই সে হেরম্ব দত্তর গোলগাল দেহের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে বললো, কী হলো হেরম্ব বাবু? আপনার শরীর খুব খারাপ মনে হচ্ছে—

ভাঙা গলায় হেরম্ব কোনোরকমে শুধু বললো, ওরে বাবা, আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

ওটি করবেন না, চৈতন্য হেসে বললো, ঠিক ক'রে থাকুন, বিয়ে হয়ে গেছে বলে ভাববার কিছু নেই। অনীতার মত প্রগ্রেসিভ মেয়ে শুধু স্বামীর সেবা ক'রে দিন কাটাবে না।

তুমি সেকথা বলছো কিন্তু স্বামী পছন্দ করে না ব'লে সে ছবিতে নামলো না—

ওসব দু'দিনের ব্যাপার, হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, দু'চার দিনের মধ্যেই স্বামী ভক্তির ঘোর কেটে যাবে, আসলে অনীতা ছবিতে নামবে না বলে চৈতন্য খুব খুশি হয়েছে। এখন সে একা তুলতুলকে নানা ভাবে দর্শকের সামনে মেলে ধরতে পারবে। হেরম্ব দিনরাত কানের কাছে অনীতার মনের মত ভূমিকার জন্যে তাকে বিরক্ত করবে না।

চোখ পিট পিট ক'রে ভাঙা গলায় হেরম্ব আবার বললো, কিন্তু ও যে পাঁচ হাজার টাকা আগাম নিয়েছে—

ওটা আপনার খরচের খাতায় লিখে নিজের পকেট থেকে প্রডিউসারকে ফেরৎ দিন।

আমি দেবো কেন? দরকার হ'লে প্রডিউসার কেস্ ক'রে অনীতার কাছ থেকে আদায় করে নেবে?

মোটে পাঁচ হাজার টাকার ব্যাপার, চৈতন্য বললো, আপনার অনেক কথা বেরিয়ে পড়বে তখন হয় তো আপনাকে আরও বেশি দিতে হ'তে পারে। বিক্রম ডাট রায় ইজ এ ক্লেভার ফেলো।

হেরম্ব আর কোনো কথা বললো না। হৈমন্তীর বিছানায় গড়াগড়ি যেতে লাগলো শুধু। ঠিক বোঝা গেল না হাপুস হুপুস শব্দ ক'রে সে ভাঙা গলায় কাঁদছে কিনা।

প্রাণহীন পুতুলের মত হৈমন্তী এদের দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে বসেছিলো শুধু।

এবারে একটু আগেই গরম পড়লো! মার্চের প্রথমেই সকাল নটা দশটায় রাস্তায় বেরোতে রীতিমত কষ্ট হয়। নতুন পাখা আজও কেনা হয়নি হৈমন্তীর। চৈতন্যর দেয়া সেই পাখা চালিয়ে ব্লেডের দিকে তাকিয়ে সে শুধু আকাশ পাতাল ভাবে সারাদিন। কিন্তু শেষ অবধি সব ভাবনা ছাড়িয়ে টাকার ভাবনা তাকে দিশাহারা করে তোলে।

"অপবাদ" ছবির জন্যে তার আরও হাজার দু'এক টাকা পাওনা আছে। এ সময় সেটা পেলে অনেক উপকার হতো তার। অন্তত, কিছুদিন নিশ্চিন্ত হ'য়ে সে চালিয়ে দিতে পারতো। এখন তার হাতে আর কিছুই নেই, অন্য কোথা থেকে পাবারও কোনো সম্ভাবনা নেই। আগে মাঝে মাঝে অনেক নতুন পার্টি আসতো তার কাছে, আগাম টাকা নেবার জন্যে সাধাসাধি করতো, "অপবাদের" পর আর কেউ আস না, চেষ্টা করেও হৈমন্তী কারোর সন্ধান পায় নি। তাই চারপাশে তাকিয়ে থেকে থেকে আজকাল তার রামময় মিত্র রোডের বাড়ির কথা মনে পড়ে আর বুক ঠেলে কান্না আসে।

সেদিন তার পাশে কৈলাস ছিলো, তার সুখ দুঃখের ভাগ সে হাসি মুখে গ্রহণ করতো। আজ সেও নেই। হৈমন্তী নিজে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এখন তার মন থেকে কৈলাস এতোদূরে চলে গেছে যে ইচ্ছে করলেও তার নাগাল পাবার উপায় নেই। তেমন করে আবার যদি হৈমন্তী কৈলাসকে গ্রহণ করতে পারতো তাহ'লে হয়তো তার সব জ্বালা জুড়িয়ে যেতো। কিন্তু তা আর হয় না। মাঝখানে অনেক মানুষের ভিড়, তার মধ্যে কৈলাসকে তেমন করে চেনা কঠিন।

কৈলাস নিজেও হৈমন্তীকে যেন এড়িয়ে চলে আজকাল। সে তার কোনো কাজে বাধা দিতে চায় না। এমন কি, একথা বোঝা তার পক্ষে এখন কঠিন হয় না যে পাঁচজনের সামনে হৈমন্তী তাকে বের করতে লজ্জা পায়। কৈলাস মুখ ফুটে কোনোদিন কিছু বলে না কিন্তু থেকে থেকে তার সারা বুক যেন জ্বলে যায়। তার হৈমন্তী তাকে এতো ছোটো করতে পারলো কেমন করে। এমন যে হবে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। অভিমানে তার চোখ ঠেলে জল বেরিয়ে আসতে চাইলেও হৈমন্তীকে কিছু বলবার ভাষা সে খুঁজে পায় না। কী কথা বলবার আছে তার? কে শুনবে তার কথা? কার ওপর সে অভিমান করবে?

সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সে হৈমন্তীর মঙ্গল চেয়েছিলো, সে যেন দশজনের একজন হয়ে ওঠে—এই ছিলো কৈলাসের দিনরাতের কামনা। কিন্তু হৈমন্তীর এমন আশ্চর্য পরিবর্তন হলো কেমন করে? আজ কৈলাসের তাকে চিনতে কষ্ট হয়। তার মনের এই প্রার্থনার কথা আর কেউ না জানুক, হৈমন্তীর তো না বোঝবার কথা নয়। তাই যদি সে বুঝে থাকে তাহলে তাকে এমন করে ছেঁটে দিতে পারলো কেমন করে। ভাবতে ভাবতে কৈলাসের শিরাগুলি দপদপ করে ওঠে, মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে, অনেক রাত অবধি ঘুম আসে না। আর তখন পাশের ঘর থেকে হৈমন্তী আর চৈতন্যর চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। কৈলাসের ইচ্ছে করে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই বাড়ি ভেঙে চুরমার করে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে কোথাও চলে যায়। এই সংসার, এই সমাজ ছেড়ে প্রায়ই পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে তার। তবু হৈমন্তীকে একটি কথাও বলতে পারে না সে।

কী কথা বলবে কৈলাস? কোনো কথা বলবার মুখ নেই তার। কী দিয়েছে সে হৈমন্তীকে যার জন্যে সে তার কথা শুনবে। সুন্দরী বউ ঘরে এনে স্বার্থপরের মত সে শুধু তাকে ভোগ করেছে, কোনো রকম স্বাচ্ছন্দ্য তাকে দিতে পারে নি। তাই কৈলাস মনে প্রাণে হৈমন্তীকে সুখী করতে চেয়েছিলো। তার সুখ দেখে নিজেও সুখী হতে চেয়েছিলো। মনে মনে অভাবের হাত এড়াতে চেয়েছিলো। দারিদ্র্যের সংগে সংগ্রাম করতে করতে শেষের দিকে সে বড়ো বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। তাই যখন সম্পদের স্বপ্ন জ্বলে উঠলো হৈমন্তীর চোখে তখন কৈলাস নিজেও দিশাহারা হয়ে পড়েছিলো। সে ভেবেছিলো সংসারে আর কোনো অভাব থাকবে না, তাকে সংগ্রাম করতে হবে না দিন রাত, প্রাচুর্যের মাঝে পরম সুখে বাস করবে তারা দু'জন। তারপর হঠাৎ একদিন কৈলাস বুঝতে পারলো যে সে যা চেয়েছিলো তা পাবে না, সে যা ভেবেছিলো তা হবে না। সে তাকিয়ে দেখলো হৈমন্তী তাকে পিছনে ফেলে কী বিপুল নেশায় সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে অনেক দূরে। কৈলাস কিছুতেই আর তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তখন হয়তো হৈমন্তীকে কিছু বলবার জন্যে তার বুক ঠেলে উঠেছিলো অভিমান। কিন্তু অনেকবার বলবার চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারে নি সে। তার কথা শোনবার আগেই হৈমন্তী যে উত্তর দিয়ে ফেলতো। সে তাকে প্রায়ই বুঝিয়ে দিতো যে টাকার স্বপ্ন ছাড়া আর কোনো চিন্তা তার নেই, আর কোনোদিকে সে তাকাতে পারবে না, আর কারুর কথা সে ভাবতে পারবে না, কজেই অক্ষম কৈলাস যেন তার কোনো কাজে কখনও বাধা না দেয়, কাঙালের মত ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে তার সামনে না দাঁড়ায়।

হৈমন্তীর কথা শুনেছিলো কৈলাস। তার ব্যবহারে এতোটুকু কৃপণতার পরিচয় ছিলো না, একদিনের জন্যেও হৈমন্তীর সামনে ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে সে দাঁড়ায় নি। তার বুক জ্বলে গেলেও মুখ ফোটে নি। হৈমন্তীকেও সে মনে মনে দোষ দেয়নি কোনোদিন। শুধু নিঃশব্দে সে প্রার্থনা করেছিলো, হৈমন্তী সুখী হোক, সে প্রাচুর্যের মধ্যে থাকুক। এ ছাড়া আর কিছু চায় না কৈলাস।

কিন্তু তারপর একদিন যখন সে দেখলো অর্থ কিংবা সুখ, হৈমন্তীর কোনোটাই নেই, তখন সে বিমূঢ় হয়ে গেল। তাকে কিছু বলবার ভাষাও ছিলো না তার। বললেও হৈমন্তী প্রতিবাদ করতো, কৈলাস জানে সে নিশ্চয়ই বলতো, অতীতে যা ছিলো তার চেয়ে এখন অনেক বেশি আছে। কৈলাসের ঘোর কেটে গেছে কিন্তু হৈমন্তীর মোহ ভাঙে নি। কৈলাস বুঝেছে এমন করে টাকার স্বপ্ন দেখলে তাদের কোনোদিনও টাকা হবে না। কিন্তু কী করলে তাদের অবস্থা ফিরবে সেকথা জানে না সে। সে তো শুনেছিলো, ছবিতে নামলে লোকে নাকি রাজা রানা হয়, দারিদ্র্য ঘুচে যায়, প্রাচুর্যের মাঝে দিন কাটে। তাহলে তাদের অভাব আরও বাড়লো কেন, কেন বিফল হলো এতো স্বপ্ন—এতো পরিশ্রম! হৈমন্তীর মত মেয়ের প্রতিভার দাম কেন লোকে দিলো না। কৈলাস শুধু ভাবে আর ভাবে। উত্তর পায়না কোনো কথার। দিন কেটে যায়।

এখন বাইরের কাজ নেই তাই অনেকদিন পর ঘরের কাজে মন দিয়ে হৈমন্তী শান্তি পাবার চেষ্টা করলো। নিজের সংসার তার কাছে বড়ো অচেনা লাগলো আজ। সে যেন অন্য আর একজনের বাড়িতে বন্দী হয়ে আছে। একা জ তাকে মানায় না, এ কাজ তার সাজেনা। হৈমন্তীর যেন প্রাণ নেই, যন্ত্রের মত সে নিজের সংসারের চারপাশে ঘুরে ফিরতে লাগলো।

এখানে এতো ধুলো জমলো কেন? আচ্ছা সুশীলা তুমি কী, ঝুল ঝাড়তে সময় পাওনি একদিনও?

মা'কে সংসারের কাজ করতে দেখে কোথা থেকে বাবলু খোকন এক সংগে ছুটে এলো, তোমাকে বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে মা, আজ পাউডার মাখো নি কেন?

হেরম্ব মামার গাড়ি কখন আসবে মা? চিতু কাকা চকলেট নিয়ে আসবে বলেছে?

হৈমন্তী এসে বাবলু আর খোকনকে জড়িয়ে ধরে বললো, কেউ আসবে না রে পাগলা, চল আমরা কোথাও পালিয়ে যাই?

খোকন জিজ্ঞেস করলো, বাবা পালাবে না ?

বাবলু বললো, না বাবা এখানে থাক, আমাদের কিচ্ছু দেয় না, চলো মা আমরা চিতু কাকার সংগে পালিয়ে যাই ?

হৈমন্তী জিব কেটে বললো, ছি ছি, ওকথা বলে না, তোমাদের বাবা কত ভালোবাসেন !

ছাই বাসে, তুমি না থাকলে একদিনও আইসক্রীম কিনে দেয় না, বলে মা এলে খেও—

কথা ঘুরিয়ে হৈমন্তী বললো, খাবি আইসক্রীম ?

হ্যাঁ মা।

আচ্ছা দুপুরে আইসক্রীমওলা এলে ডাকিস।

তুমি তো বেরিয়ে যাবে, আমাদের পয়সা দিয়ে দাও মা।

না রে আমি কোথাও যাবো না।

দু' আনাওলা নয়, ছ' আনা দামের বালতি কিনে দেবে ?

বাবলুর গাল টিপে হৈমন্তী বললো, আচ্ছা রে তাই দেবো, ব'লেই তার মুখ কালো হয়ে গেল। আইসক্রীমওলা এলে আজ এক কাণ্ড হবে। তার একেবারেই খেয়াল ছিলো না যে তার কাছে মোটে একটি টাকা আছে, বাড়িতে আর এক পয়সাও নেই। সেই টাকা সে খরচ করতে পারবে না কিছুতেই। কারণ কৈলাসকে সংগে নিয়ে আজ সন্ধ্যায় তাকে ম্যাগনোলিয়ায় যেতে হবে। সম্প্রতি শিবেন আর নীনার বিয়ে হয়েছে। তারা বাড়িতে এসে বিশেষভাবে কৈলাস আর হৈমন্তীকে নেমন্তন্ন করে গেছে। যদি সেখানে ট্যাক্সি করে যেতে পারতো তাহ'লে ভাল হতো। কিন্তু উপায় নেই, ট্রামে যেতে হবে তাদের। মাত্র একটি টাকা সম্বল। দু'জনের যেতে আসতে আট আনা খরচ হবে। তারপর কাল কী হবে হৈমন্তী জানে না। যা হোক সেকথা কাল ভাবা যাবে। হৈমন্তীর সব চেয়ে বড়ো গুণ যে হাতে যা আছে তা দিয়ে সে শেষ মুহূর্ত অবধি চালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। যখন পুঁজি শেষ হয়ে যায়, আর কিছুতেই চলে না তখন মাথা খাটিয়ে একটা উপায় বের করবার চেষ্টা করে। আজ হৈমন্তীর জীবনে এসেছে পুঁজি শেষের দিন। দেখা যাক সে কী করে।

কিন্তু মাত্র একটি দশ টাকার নোটের চিন্তা যে তার কাছে এতো প্রধান হয়ে উঠবে তা সে আগে কখনও ভাবে নি। আজ দশ টাকা থাকলে সব দিক রক্ষা হতো তার। বাবলু খোকনকে আইসক্রীম কিনে দিয়ে ট্যাক্সি চড়ে তারা ম্যাগনোলিয়ায় নেমন্তন্ন খেতে যেতে পারতো। ফিরে আসবার জন্যে ভাবনা নেই, কারোর না কারোর গাড়ি পাওয়া যেতো। যা হয় হবে, তার জন্যে এখন থেকে ভেবে লাভ নেই। কিন্তু সে মনে মনে প্রার্থনা করলো, আজ আইসক্রীমওলা যেন কিছুতেই এ পথ দিয়ে না যায়। একথা ভাববার সংগে সংগে তার দুই চোখ জলে ভরে উঠলো।

প্রার্থনা বিফল হলো হৈমন্তীর। দুপুর দু'টো—আড়াইটার সময় চিৎকার ভেসে এলো, আইসক্রীম—ম্যাগনোলিয়া! হৈমন্তীর কান দু'টো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো। বাবলু খোকন কোথায় কে জানে। যদি তারা এখন ঘুমিয়ে থাকে আর আইস-ক্রীমওলার ডাক শুনতে না পায় তা'হলে হৈমন্তী বেঁচে যায়।

কিন্তু ছুটতে ছুটতে এসে হৈমন্তীকে জড়িয়ে ধরে বললো, মা শিগগির পয়সা দাও, ছ আনা ছ' আনা বারো আনা, আইসক্রীমের বালতি কিনবো, দাও মা, ও গাড়ি নিয়ে চলে যাবে এখুনি—

বাবলু খোকনের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে ধরা গলায় হৈমন্তী বললো, ও পচা আইসক্রীম, কাল আমি তোদের জন্যে ভালো নিয়ে আসবো—

না, না, পচা নয় মা, ম্যাগনোলিয়া—তুমি সকালে বলেছিলে কিনে দেবে, দিতেই হবে—

কাল দেবো লক্ষ্মী সোনা?

বাবলু খোকন কেঁদে উঠলো, বাবার মত মিথ্যা কথা বললে হবে না, বালতি না দাও দু' আনা দামের ছোটো কিনে দাও, আমি আইসক্রীম খাবোই, তুমি আর আমাদের ভালোবাসো না কেন মা?

আজ আইসক্রীম খেতে নেই রে, আমার গলায় ব্যথা হয়েছে—

তুমি তো খাবে না, আমরা খাবো,

বাঃ রে ছেলে, আমার বুঝি খেতে ইচ্ছে করে না? আমার গলার ব্যথা সেরে গেলে কাল তিনজনে এক সংগে খাবো কেমন?

খোকন মা'র কথা শুনে বাবলুকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, কাঁদিস না বাবলু, বেচারী

মা। গলায় ব্যথা হয়েছে। কাল তিনটে বালতি কিনে আমরা তিনজনে খাবো, না মা?

কোনো রকমে চোখের জল চেপে রুদ্ধস্বরে হৈমন্তী বললো, হ্যাঁ রে। বাবুল খোকন বেরিয়ে গেলে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলো হৈমন্তী। কিছুতেই কান্না থামতে চায় না।

তবু বিকেল থেকেই সাজতে আরম্ভ করলো সে। কৈলাসকে সংগে নিয়ে পার্ক ষ্ট্রীটে ম্যাগনোলিয়ায় যেতে হবেই। অনেক ক'রে ব'লে গেছে মীনা আর শিবেন। কিন্তু আজ হৈমন্তীর কিছুতেই যেন মন নেই। যেতে হবে, না গেলে খারাপ দেখায় তাই সে যাচ্ছে। আগেকার মত প্রাণ থেকে আজ আসছে না কোনো সাড়া। এমনি নেমন্তন্নে সে অনেকবার গেছে। কিন্তু মাত্র এক টাকা সম্বল করে এমন মনের অবস্থা নিয়ে কোনোদিনও তাকে ওদের দলে যোগ দিতে যেতে হয় নি। লজ্জা আর বিকট দৈন্যে হৈমন্তীর দেহমন অবশ হয়ে যাচ্ছে। আজ যারা আসবে তাদের কারোর কাছে মোটে একটা টাকা থাকবে না। তাহলে কেন হৈমন্তী তাদের মধ্যে যেতে চায়? এতো তফাৎ যখন তখন কেন সে তাদের সংগে এক হ'তে গিয়ে নিজের দৈন্য আরও স্পষ্ট করে তুলতে চায়? শুধু টাকার লোভ করলেই তো রাতারাতি টাকা হয় না। টাকা করতে হলে ধৈর্য ধরে প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হয়, অল্প অল্প করে আস্তে আস্তে অবস্থা ফেরাতে হয়। গরিব আর বড়ো লোক—এ দুই দলের মাঝে রয়েছে অনেক কালের পাকা প্রাচীর তা ভাঙবার চেষ্টা না ক'রে হঠাৎ ময়ূর পুচ্ছ প'রে প্রাচীর টপকে বড়ো লোকের মধ্যে বসলে যে কোনো মুহূর্তে ময়ূরপুচ্ছ খসে পড়তে পারে। তখন লজ্জা রাখবার জায়গা থাকে না। কেন নিজের অবস্থা ভুলে নিকৃষ্ট লোভে দিশাহারা হয়ে দাঁড় কাকের মত এতোদিন সে ঘুরে বেড়ালো? কেন অপেক্ষা করে সমস্ত শক্তি দিয়ে ন্যায্য পাওনা আদায় করে নিতে শিখলো না? তার মত অবস্থার লোক সব ভুলে সিংহাসনে কেন বসতে চাইলো। শুধু চাইলেই কী সব পাওয়া যায়! হৈমন্তী তো জানে লোভীরা চায়, কাঙালরা চায়—কিন্তু পায় কারা? শক্তি, আশা আর ক্ষমতা নিয়ে বুক জোড়া দুঃখের মাঝে তিল তিল ক'রে ক্ষয়ে গেলেও যথাসময় বিপুল প্রাণের প্রকাশে যারা দাবী করতে জানে। হৈমন্তী কী

তাদেরই একজন? না, নিজের ওপর ঘৃণা হয় তার। সে পথের ভিখারিণীর চেয়েও অধম। তাই তার ভিক্ষাপাত্র আজ লাথি মেরে পথের ধুলোয় উল্টে ফেলে দিয়ে গেছে ওরা। যাবার সময় ভুলেও বোঝবার চেষ্টা করে নি এক কণা চালও অবশিষ্ট নেই হৈমন্তীর। ভিখারিণীকে ভয় করে কে? কে ভাবে তার কথা? তাকে লোকে কৃপা করে। হৈমন্তীকেও ওরা কৃপা করে। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। সেকথা বুঝেও হৈমন্তী সীমা ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছিলো। তাই তারা তাকে ছেড়ে গেছে। কাকে দোষ দেবে সে? ভিখারিণী কানের কাছে বারবার চেঁচিয়ে ভিক্ষা চাইলে বিরক্তি লাগে না তার নিজের? তবে? চোখের জল চেপে হৈমন্তী সাজ শেষ করলো। প্রসাধনের ত্রুটী হলো না তার। চোখে মুখে ঠোঁটে রঙ মেখে চলির ব্লাউজ আর জর্জেটের থান পরলো সে। কানে পরলো মুক্তোর টাব, গলায় সরু নেকলেস। হাতে শুধু একটি রিষ্টওয়াচ। এখন শুধু একটি কথা ভেবে তার মন খচখচ করছে। অর্থাৎ ট্রামে সে চড়বে কেমন করে। লোকে তাকিয়ে থাকবে, হাসবে, বিরক্ত করবে। ওইসব সাধারণ লোকের দৃষ্টি আজ সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। বেরোবার সময় যতোই কাছে আসতে লাগলো ততোই ভাবনা বেড়ে যেতে লাগলো তার।

কিন্তু শেষ অবধি তাকে ট্রামে যেতে হলো না। হীরেন সান্যালের গাড়ি নিয়ে চৈতন্য গড়াই ওদের দু'জনকে নিয়ে যথাসময় পার্ক স্ট্রীটে ম্যাগনোলিয়ায় এসে নামলো। আর সকলে এসে গেছে তখন। এমন কি, খুব শক্ত করে হাত ধ'রে অনীতা আর বিক্রম দত্তরায়ও এক কোণায় বসে আছে। শুধু হেরম্ব দত্ত নেই। অনীতার দিকে তাকিয়ে হৈমন্তীর সেই কথা মনে পড়লো। অনীতার জন্যেই তো তাকে বম্বে পালাতে হয়েছে। হৈমন্তীর পরিচিত সকলে এসেছে, অপরিচিতের সংখ্যাও অনেক। অন্য সময় হলে সে তাদের সংগে আলাপ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতো। আজ কিন্তু নতুন কারোর সংগে কথা বলবার প্রবৃত্তি নেই তার। আর কারোর সংগে আলাপ করতে চায় না সে। তার পরিচিতজনদের আজ ম্যাগনোলিয়ার উজ্জ্বল আলোয় বড়ো অপরিচিত লাগছে যেন। হৈমন্তী তো এদের একজন নয়, এদের কেউ নয়।

হৈমন্তী আর কৈলাস পাশাপাশি বসেছে। সেই টেবিলে রয়েছে অম্বর তুলতুল চৈতন্য অনীতা বিক্রম আর মীনা শিবেন। খাওয়া আরম্ভ হলো। ওদিকে গান চলেছে। গমগম করছে ম্যাগনোলিয়া। সবাই খুব খুশি, এমন কী মুখ দেখে মনে হয় কৈলাসের খুব ভালো লাগছে আজ সন্ধ্যার এই আয়োজন। শুধু হৈমন্তী একা যেন কিছুতেই মনে প্রাণে যোগ দিতে পারছে না এই উৎসবে। ধরা পড়বার ভয়ে বারবার সে ভীত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। এখুনি হয় তো সকলে জেনে ফেলবে যে তার কাছে মোটে একটি টাকা আছে। এদের সংগে যদি সে না মিশতো, এদের কাউকে না চিনতো তাহ'লে তার মনে কখনও উঁকি মারতো না এই এক টাকার ভয়।

লম্বা মেনু। মনের আনন্দে সবাই লোভনীয় খাবার খেয়ে চলেছে। হৈমন্তী খাচ্ছে খুব আস্তে আস্তে। মাঝে মাঝে মাথা তুলে তাকাচ্ছে এর ওর দিকে। ওদের কথা শুনে কখনও শুকনো হাসি হাসছে। এতো আনন্দের মাঝে তার নিজেকে মনে হচ্ছে বেমানান। মুখে বিস্বাদ হয়ে যাচ্ছে ভালো ভালো খাবার। এখান থেকে, এদের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি পালাতে পারলে সে যেন বেঁচে যায়।

যথাসময়ে টেবিলে খুব বড়ো তিন রঙা আইসক্রীম এলো। চামচের ঠুনঠুন মিষ্টি শব্দ শোনা গেল। কিন্তু আশ্চর্য, অনেক কষ্টে চোখের জল চেপে হাত দিয়ে দূরে হৈমন্তী সরিয়ে রাখলো সেই আইসক্রীমের প্লেট। আজ কিছুতেই ও এটা খেতে পারবে না।

কি হলো মিসেস চৌধুরী? ডোন্‌ট ইউ লাইক আইসক্রীম? শিবেন বটব্যাল জিজ্ঞেস করলো।

ম্লান মুখে আস্তে হৈমন্তী শুধু বললো, আমার গলায় ব্যথা।

সকলের সংগে গল্প করে খাওয়া শেষ করতে প্রায় রাত দশটা বেজে গেল। এবার বিদায় নেবার পালা। মীনা শিবেনকে আন্তরিক শুভ কামনা জানিয়ে একে একে অতিথিরা বিদায় নিচ্ছে। এবার হৈমন্তী আর কৈলাসকেও যেতে

হবে। তারাও ওদের দু'জনকে যথারীতি শুভ কামনা জানিয়ে পথে নামলো। চৈতন্য এসেই হীরেন সান্যালের গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিলো। একটু আগে সে তুলতুলের গাড়িতে চলে গেছে। কৈলাস পেট ভ'রে খেয়েছে। পথে নেমেই সে দাঁড়িয়ে পড়লো। যদি কারোর গাড়ি ওদিকে যায় তাহ'লে তারাও নিশ্চিন্ত হয়ে মোটরে বাড়ি পৌছতে পারে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে কৈলাসকে এদিক ওদিক তাকাতে দেখে অবাক হয়ে হৈমন্তী জিজ্ঞেস করলো, থামলে কেন?

থেমে থেমে কৈলাস উত্তর দিলো, যদি কারোর গাড়ি পাওয়া যায়—

কঠিন স্বরে হৈমন্তী বললো, অনেক কাঙালপনা হয়েছে আর নয়, চল তাড়াতাড়ি, ম্যাগনোলিয়া থেকে বেরোতে পেরে হৈমন্তী যেন বেঁচে গেছে। এখন তাড়াতাড়ি সকলের চোখের আড়ালে যেতে পারলে হয়। সেও চায় না কেউ তাদের হেঁটে যেতে দেখে দয়া দেখিয়ে গাড়িতে পৌছে দিতে চায়।

কৈলাস আবার জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু আমরা যাবো কিসে?

আরও কঠিন স্বরে হৈমন্তী উত্তর দিলো, হেঁটে।

ও বাবা, ভীত চোখে কৈলাস বললো, যা খেয়েছি এখন অতোদূর হেঁটে যাওয়া কি সম্ভব?

সব ভুলে বনেদী পার্ক স্ট্রীটের ওপর অবুঝ স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে হৈমন্তী চিৎকার করে উঠলো, তাহলে রাক্ষসের মত খেলে কেন? এসব কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার? কোন রোলস রয়েস তোমার আছে যে ম্যাগনোলিয়া থেকে ডিনার খেয়ে গাড়ি করে বাড়ি ফিরতে সাধ হয়?

কৈলাসের মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। ঠিক কথা বলেছে হৈমন্তী। কিন্তু সে আজকাল কথায় কথায় এতো কঠিন হয়ে ওঠে কেন তার ওপর। সে তো অতো ভেবে মোটরে বাড়ি ফেরবার কথা বলেনি! আসবার সময় যেমন এসেছিলো, ঠিক তেমনি করেই শুধু ফিরে যেতে চেয়েছিলো কৈলাস।

দু' জনেই চুপ করে পথ চলছিলো। অনেকক্ষণ আর কোনো কথা হলো না স্বামী স্ত্রীর মধ্যে। পার্ক স্ট্রীটের কোলাহল তখনও মিলিয়ে যায় নি। কোয়ালিটিতে আলো জ্বলছে, বন্ধ ওয়ার্ডবের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে। পেভমেন্টের ওপর বিদেশী মাসিক পত্রিকার হিন্দুস্থানী মালিক তখনও

চলে যায়নি। পথিকের পায়ের শব্দ ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে আর থেকে থেকে বাজছে মোটরের হর্ণ।

একেবারে মুখ বুজে চৌরঙ্গীতে এলো ওরা দু'জন। পার্ক ষ্ট্রীট সোজা চলে গেছে ফোর্ট উইলিয়ামের দিকে। চোখ তুলে হৈমন্তী সামনে অনেক দূর তাকিয়ে দেখলো। দু'পাশে গাছের সারি, মাঝখানে নির্জন পথ। অন্য পারে জ্বলছে অসংখ্য আলোর বিন্দু। হৈমন্তী তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলো। আলো দেখতে সে চায় না। ময়দানের অন্ধকারে আত্মগোপন করে থাকতে চায়।

হৈমন্তীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভয়ে ভয়ে কৈলাস জিজ্ঞেস করলো, বাসে যাবে বুঝি?

প্রশ্ন শুনে হৈমন্তীর গলা থেকে ঝাঁঝালো স্বর বেরিয়ে এলো, বললাম না হেঁটে যাবো? পায়ে হেঁটে—বুঝেছো?

হৈমন্তীর চেহারা দেখে তাড়াতাড়ি কৈলাস মাথা নেড়ে জানালো যে বুঝেছে, কিন্তু মনে মনে ভাবলো, হৈমন্তীর কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এতো রাত্তিরে হেঁটে যাবে কেমন করে, এখান থেকে টালিগঞ্জ যে অনেক দূর।

হৈমন্তী সত্যি বাঁ দিকে ফিরে হাঁটতে আরম্ভ করলো। ট্রামে চড়া তার পক্ষে সহজ নয়, বাসে ফেরবার কথা সে ভাবতে পারে না। আর সে জানে অতোদূর হেঁটে যাওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু হৈমন্তীর মাথায় এখন আগুন জ্বলছে। এখন তো হাঁটা যাক্, পরে যা হয় হবে। কোনো কথা ভাবতে পারে না সে। ঘোমটা টেনে মাথা নিচু করে তাড়াতাড়ি শুধু পথ চলতে লাগলো। কেউ যেন এ অবস্থায় তার মুখ দেখে তাকে না চিনে ফেলে। এমনি করে টালিগঞ্জ অবধি হেঁটে যদি সে তার শেষ সম্বল এক টাকা বাঁচাতে পারে তাহলে কাল সকাল বেলা উঠে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে নিশ্চিন্ত থাকবে।

স্বামী আর স্ত্রী চোরের মত আত্মগোপন করে সত্যি রাসবিহারী অ্যাভিনিউ এর মোড় অবধি হেঁটে এলো। কিন্তু হৈমন্তীর মনে হচ্ছে প্রথম গ্রীষ্মের ছড়ানো রাত যেন তাদের দেখছে, তাদের এ অবস্থায় দেখছে আরও অনেকে। কোথায় লুকোবে হৈমন্তী এখন! পা আর চলতে চায় না, বড্ডো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। আর হাঁটা সম্ভব নয়: শেষ ট্রাম চলে গেছে, আর বাস নেই। হুসহুস করে

মাঝে মাঝে ট্যাক্সির শব্দ শোনা যাচ্ছে আর তাদের দেখে রিক্সাওয়ালারা ঠুনঠুন করে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। চারপাশে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে 'অমৃতায়ন' রেস্তোরাঁর কাছে হৈমন্তী হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর হঠাৎ শক্ত করে কৈলাসের হাত ধরে হনহন করে রাস্তা পার হয়ে একটা রিক্সায় উঠে পড়ে বললো, জলদি চলো টালিগঞ্জ।

ব্যাস্ আর কেউ দেখতে পাবে না তাকে। যদি বা কেউ দেখে সে কখনও কল্পনা করতে পারবে না প্রিমিয়ারের নামকরা অভিনেত্রী রিক্সায় বাড়ি ফিরছে। রিক্সাওয়ালাকে সেই টাকাটাই হৈমন্তী দিয়ে দেবে।

কৈলাসের অজ্ঞাতে হৈমন্তীর বব্ করা চুলে হঠাৎ তার হাত ঠেকে গেল একবার।

পরদিন খুব সকালে বিছানার ওপর হৈমন্তী উঠে বসলো। কাল সারা রাত তার মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছে। সে একেবারেই ঘুমোতে পারে নি। আজ তার হাতে একটি পয়সাও নেই। সকালে ছেলেরা কি খাবে সে জানে না। তার শেষ সম্বল সে রিক্সাওয়ালাকে দিয়ে দিয়েছে। যেমন করে হোক আজ চৈতন্যকে সে তার পাওনা টাকার কথা বলবে। কিন্তু বলতে পারলেও সংগে সংগে নিশ্চয়ই কোনো ফল হবে না। তাই তাকে অন্য কোনো ব্যবস্থা এই মুহূর্তে করতে হবে।

কৈলাসের ঘরের দিকে তাকিয়ে হৈমন্তী চুপ করে বসে রইলো। সেদিকে তাকিয়ে তার সমস্ত দেহ মন হঠাৎ জ্বলতে আরম্ভ করলো যেন। অমন অক্ষম স্বামী বলেই তো তাকে আজ এই অবস্থায় এসে দাঁড়াতে হয়েছে। এখন নিজে কেমন নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোচ্ছে। কোনো ভাবনা নেই ওর। সমস্ত দায় যেন হৈমন্তীর। ওর আর কী? খেয়ে দেয়ে ঘরে ব'সে চুপ ক'রে পড়ে পড়ে ঘুমোনো শুধু। অমন পুরুষের কথা জন্মে কল্পনা করতে পারে না সে।

খাট থেকে নেমে টলতে টলতে হৈমন্তী আলমারী খুললো। অন্তত শ' পাঁচেক টাকার ব্যবস্থা এখুনি করতে হবে। গোটা দুই হার, কয়েক গাছি চুড়ি, দু' ভরির কানবালা বের করে একটা স্কার্ফে বেঁধে দরজা ঠেলে কৈলাসের ঘরে এসে

তাকে বেশ জোরে ঠেলা মারতে লাগলো হৈমন্তী। তার মুখ কঠিন। চোখের

ধড়মড় করে উঠে বসে চোখ কচলাতে কচলাতে কৈলাস বললো, কী হলো, কী ব্যাপার?

কোনো ভূমিকা না ক'রে হৈমন্তী বললো, আমার এ গয়নাগুলো বিক্রি ক'রে তোমাকে এখুনি কিছু টাকা নিয়ে আসতে হবে। বাড়িতে আর একটি পয়সাও নেই।

কথা শুনে কৈলাস বিস্ফারিত চোখে হৈমন্তীর মুখের দিকে প্রথমে তাকিয়ে রইলো। তারপর মুখ নামিয়ে দু' তিনবার কাশলো, একবার মাথা চুলকোলো। অবশেষে খাট থেকে নেমে হৈমন্তীর মুখের ওপর সটান বলে বসলো, আমি পারবো না।

হৈমন্তী ভাবতে পারেনি যে তার আদেশ অমান্য করবার মত সাহস কৈলাসের হবে। তাই কঠিন স্বরে সে জিজ্ঞেস করলো, তার মানে?

খুব সহজ গলায় কৈলাস বললো, মানে তোমার গয়না আমি কিছুতেই বিক্রি করবার জন্যে নিয়ে যেতে পারবো না।

বিকৃত কণ্ঠে সহসা চিৎকার করে উঠলো হৈমন্তী, তাহ'লে সংসার খরচের টাকা বের করে দাও—

সেটা তো আমার দেবার কথা নয় হৈমন্তী।

তবে কার দেবার কথা? আমার? অক্ষম অপদার্থ কোথাকার! তোমার জন্যে কি করতে বাকি রেখেছি আমি? নিশ্চিন্ত হয়ে নাক ডাকিয়ে পুরু গদির বিছানায় ঘুমোচ্ছো আর ভাবনায় ভাবনায় আমি এক মুহূর্তের জন্যে চোখের পাতা বুজতে পারি না সে-খবর রাখো?

খুব আস্তে কৈলাস উত্তর দিলো, রাখি।

তাহলে কোন লজ্জায় নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারো তুমি?

তা ছাড়া আমি কী করতে পারি বল? আমার হাত থেকে সংসারের সমস্ত ভার তুমিই তো একদিন জোর করে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলে।

কি দিয়েছিলে তুমি আমাকে? লজ্জা দারিদ্র্য আর অপমান। ঘেন্না ধরে গেছে তোমার ওপর—

জানি। তাই কোনো বাধা না দিয়ে তোমার ওপর সমস্ত ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে আমি দ্বিধা করিনি। তুমি বলেছিলে সংসারের চাকা ঘুরিয়ে দেবে, তোমার লজ্জা হয় বলে আমাকে জোর করে চাকরি ছাড়ালে, নাহ'লে হয় তো এতোদিনে আমি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়ে যেতাম।

কী অপূর্ব যুক্তি তোমার, তীক্ষ্ণস্বরে হৈমন্তী বললো, আমি বলেছিলাম তাই অবোধ বালকের মত একজন মেয়েমানুষের কথায় সব ভাসিয়ে দিয়ে তুমি নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে আরম্ভ করলে? আমার পয়সায় খেয়ে পরে থাকতে লজ্জা করে না তোমার?

হৈমন্তীর কথা শুনে কৈলাসের সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগলো। তার এমন অদ্ভুত অবস্থা এর আগে আর কখনও হয়নি। আজ এতো দুঃখ ব্যবধানের মধ্যেও সে কল্পনা করতে পারেনি তার হৈমন্তীর কাছ থেকে এমন কঠিন কথা শুনতে হবে।

ম্লান মুখে হৈমন্তীর দিকে তাকিয়ে কৈলাস বললো, না, লজ্জা করেনি, তোমার কাছ থেকে কিছু নিতে আমার সঙ্কোচ হয় না কারণ আজ আমাকে তোমার পর মনে হলেও তোমাকে কোনোদিনও আমি অন্য মানুষ ব'লে ভাবতে পারি না।

তা পারবে কেন? অক্ষমের অপূর্ব যুক্তি বটে! আমাকে সুখে রাখবার জন্যে কবে কি করেছিলে তুমি?

কৈলাস দীর্ণ গলায় বললো, তোমার মঙ্গল কামনা করে নিজের অস্তিত্ব ভুলে ছিলাম;

অস্তিত্ব? উন্মাদিনীর মত হেসে উঠে হৈমন্তী বললো, কোনোদিন অস্তিত্ব ছিলো নাকি তোমার?

ছিলো কিন্তু সেকথা তোমাকে কোনোদিনও বুঝতে দিইনি পাছে তোমার সুখের ব্যাঘাত হয়।

হৈমন্তীর তীক্ষ্ণস্বর কেঁপে উঠলো, কবে সুখী হতে দেখলে তুমি আমায়? দেখতে পাওনা চোখের কোণায় কালি পড়েছে—ভাবনায় ভাবনায় আমি কুঁজো হয়ে যাচ্ছি? এসব দেখেশুনে আমার সুখের কথা কোন মুখে উচ্চারণ কর তুমি?

তুমি সুখী হয়েছো কি না সেকথা আমি বলছি না, আমি শুধু বলছি যে তোমার সুখের জন্তে আমি নিজের সব কিছু ভুলেছিলাম, জ্ঞানে আমি কখনও তোমার এতোটুকু অসুবিধার কারণ হইনি—

আবার চিৎকার করে উঠলো হৈমন্তী, তোমার জন্তেই তো আমার যতো অসুবিধা, তুমি না থাকলে—

তাকে বাধা দিয়ে কৈলাস বললো, আমি তো থেকেও ছিলাম না হৈমন্তী। আমি যে একজন মানুষ সেকথাও জোর করে ভুলে ছিলাম। তুমি যা বলেছো সব সময় হাসিমুখে তাই করেছি, একটু থেমে কৈলাস বললো, তুমি দূরে সরে যাচ্ছো, পর হয়ে যাচ্ছো সেকথা বুঝেও কোনো অনুযোগ কখনও করি নি। কারণ তোমাকে আমি কিছুই দিতে পারিনি, তাই নিজে তোমাকে হারিয়েও আমি মনেপ্রাণে চেয়েছিলাম বিপুল যশ সম্পদ তোমার হোক—সমস্ত দেশ তোমার মূল্য বুঝুক!

বুঝতো, ভাঙা কর্কশ গলায় হৈমন্তী বললো, অপদার্থ অক্ষম না হয়ে তুমি যদি কর্তব্যপরায়ণ স্বামী হ'তে?

অবাক হয়ে কৈলাস বললো, রাতারাতি আমি অম্বর বক্সি হবো কেমন ক'রে হৈমন্তী? এতো চেষ্টা করেও তুমি কি তুলতুল বক্সির মতো হতে পারলে?

কৈলাসের কথায় হৈমন্তীর শরীর কাঁপতে লাগলো। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়তে লাগলো। সমস্ত দেহ অকস্মাৎ কঠিন হয়ে উঠলো।

তার পরিবর্তন বুঝতে না পেরে কৈলাস বলে চললো, নিজে সব ছেড়ে তোমাকে আমি সব পাইয়ে দিতে চেয়েছিলাম তাই আজ যদি তুমি চোরের মত এসে আমাকে তোমার গয়না বিক্রি করতে বলো—তুমি হয়তো বুঝবে না তা করা আমার পক্ষে কতোখানি কষ্টকর। তোমার লাভের জন্তে আমি সব করতে পারি কিন্তু তোমার লোকসানের জন্তে কিছু করা আমার পক্ষে অসম্ভব, হৈমন্তীকে আর কথা বলবার অবসর না দিয়ে কৈলাস সে-ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

সুশীলা ঝি'কে কি একটা ছুতো দেখিয়ে কয়েকটা টাকা ধার নিলো হৈমন্তী। তারপর জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে দিলো দু'চার দিন। এর মধ্যে থেমে থেমে

সে চৈতন্যকেও পাওনা টাকার কথা বলেছিলো, ষ্টুডিওতেও গিয়েছিলো। কিন্তু হ্যা হ্যা ক'রে হেসে চৈতন্য বলেছে যে টাকাটা নাকি সে নিজে অনেকদিন আগে নিয়ে নিয়েছে আর ভুলে নিজের মনে ক'রে খরচ ক'রে ফেলেছে। সে জানে যে হৈমন্তীর কাছে তার অনেক ধার, শিগগিরই সে তাকে সব শোধ ক'রে দেবে। কথা শুনে ভীষণ লজ্জা পেয়ে হৈমন্তী আর কিছু বলতে পারে নি।

সেদিন সকালে কৈলাসের ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার পর হৈমন্তী স্বামীকে এঁড়িয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, তার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। সে ভাবেনি কৈলাস তাকে এসব কথা বলতে পারে। এতো বুদ্ধি তার হলো কবে, এতো কথা সে শিখলো কোথায়! তার কথা শুনে হৈমন্তী লজ্জায় কাঠ হয়ে গেছে যেন। কৈলাসের মত নিরীহ লোকের কাছেও সে ধরা পড়ে গেছে। এখন তাকে সারা জীবন শুধু লুকিয়ে বেড়াতে হবে। সে যেন মস্ত বড়ো অপরাধ করেছে, যে কোন মুহূর্তে দেশসুদ্ধ লোকের কাছে ধরা পড়ে যেতে পারে। তাই সারা দিন ভয় লাগে হৈমন্তীর। এখন অনেকদিন কোথাও নির্জনে একেবারে একা সে শুধু বিশ্রাম করতে চায়। কারোর মুখ দেখতে চায় না সে—ছেলেদেরও নয়।

কয়েকদিন সুশীলা ঝি'র কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে চালিয়ে দিলেও আর চালাতে পারবে না হৈমন্তী। কেমন ক'রেই বা পারবে। এমন ক'রে কি পারা যায়। গয়নার পুঁটলি তার আলাদা করাই আছে। কাউকে দিয়ে আজ সেটা বিক্রি করতে না পাঠালেই নয়। কিন্তু সে ভেবে পেলো না কাকে পাঠাবে। সে নিজে যেতে পারবে না, সুশীলা ঝিকে বিশ্বাস করা যায় না, এতো বড়ো লজ্জার কথা বলাও যায় না। আর কারোর সামনে এ দারিদ্র্য দেখানো যায় না। এ ব্যাপারে কৈলাস ছিলো তার সব চেয়ে প্রধান সহচর। কিন্তু সেও যখন তাকে সাহায্য করলো না তখন হৈমন্তী তার নিজের ধারে কাছে গয়না বিক্রি করে অভাব ঘোচাবার লোক আর একজনকেও খুঁজে পেলো না।

কিন্তু আজ তাকে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। তা না হ'লে বাজার হবে না তাদের। এখনও কিছুই ভেবে উঠতে পারেনি হৈমন্তী। সে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে আকাশ পাতাল ভাবছিলো। ঝি দোকানে গেছে ধারে আলু পেঁয়াজ চাল আর ডিম নিয়ে আসতে। কৈলাসও খুব সকালে উঠে কোথায় বেরিয়ে

গেছে কে জানে। সব দেখে শুনে হয়তো আবার আগের মত টাকা ধার করতে গেছে। সে কিছু টাকা ধার ক'রে নিয়ে এলে হৈমন্তী যেন বেঁচে যায়। সেই সকালের পর সে কৈলাসের সংগে আর একটি কথাও বলেনি, কৈলাসও কিছু জিজ্ঞেস করেনি তাকে—সংসার খরচের টাকার জন্যেও বিরক্ত করেনি। সে যে তুলতুল বস্তির মত হ'তে চায় সেকথা কৈলাস বুঝলো কেমন করে। তার মত ভালোমানুষের কাছে সে যখন ধরা পড়েছে তখন তো সকলেই তার ময়ূর পুচ্ছ প'রে ময়ূরের দলে মেশবার কথা জেনে ফেলবে। হৈমন্তী পালাবে কোথায়!

অনেকদিন পর চেনা গলার স্বর শুনে হঠাৎ হৈমন্তী উঠে বসলো। দরজা খুলে দেখলো বোধনা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে। খুব সেজে এসেছে বোধনা: কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা তার সিঁথিতে সিঁদুরের পুরু উজ্জল রেখা।

বোধনার হাত ধরে ঘরে এনে তাকে সোফায় নিজের পাশে বসিয়ে স্বরে প্রচুর বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে হৈমন্তী জিজ্ঞেস করলো, এ কি ব্যাপার বোধনা, আমাদের খবর দিলি না যে বড়ো? এইসব করছিলি তাই বুঝি এতোদিন দেখা নেই?

হৈমন্তীর কোলে মুখ লুকিয়ে বোধনা বললো, ও যে আমাকে বিয়ে করতে চাইলো, তারপর মাথা তুলে গর্বিত চোখে হৈমন্তীর দিকে তাকিয়ে আবার বললো, জানো হৈমন্তীদি, ও বি—এ পাশ।

তাই না কি? খুব বাহাদুরী আছে তো তোর। কবে এতো কাণ্ড করলি, আগে আমাকে কিছুই বলিস নি তো?

বাঃরে হি হি, বলবার সময় পেলাম কোথায়? এই সেদিন তো আলাপ হলো। রোজ বেড়াতে যেতাম ওর সংগে। খুব ভালো ছেলে, তোমার সংগে আলাপ করিয়ে দেবো দেখো। বিয়ের আগে একদিনও আমার হাত অবধি ধরে নি—

তাই নাকি? হৈমন্তী হেসে বললো, যাক তাহলে এবারে তুই একেবারে নিশ্চিন্ত। ফিল্মষ্টার হবার ইচ্ছে আর নেই তো?

খুব আছে, ওরও এসব দিকে বড়ো ঝোঁক—

বলিস কি ? ওর কি নাম বলতো ?
পরেশ পাল।
অ্যাঁ পাল ! তোর বাবা আপত্তি করেন নি ?
উনি কিছু জানতেন না। রেজিষ্ট্রারের বাড়ি থেকে বিয়ে ক'রে দু'জনে ওঁকে প্রণাম করতে গেলাম—
ওরে বাবা, বোধনার গাল টিপে হৈমন্তী বললো, তোমার দেখছি পেটে পেটে হাত পা, বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে !
কি করি বল, হি হি, এমন ভালো লোক আমি জীবনে কখনও দেখি নি, অনেক পয়সা এদের, ক'লকাতায় নিজেদের দোতলা বাড়ি। শিগগিরই ও নাকি নিজে ফিলিম করবে। ওদের একটা ভদ্র দল আছে, ক'লকতায় অনেক থিয়েটার করে ওরা, সব ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া জানে।
বোধনার কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ হৈমন্তীর চোখ উজ্জল হ'য়ে উঠলো। বোধনার হাত শক্ত ক'রে ধ'রে ও বললো, ও ছবি করবে বুঝি ? কবে রে বোধনা ? কি ছবি ? আমার কথা মনে থাকে যেন—
তোমার কথা অনেক আগে আমি ওকে বলে রেখেছি। কিন্তু ও বলে তোমার দাম অনেক, অতো টাকা তো ওরা দিতে পারবে না—
যা দেবে আমি তা'তেই করবো বোধনা, হৈমন্তী যেন মিনতি করলো বোধনাকে, তোর স্বামীর ছবি, আমার কথা কিছুতেই ভুলিস না যেন—
না গো না, তুমি আমাকে মানুষ ক'রে দিলে আর তোমার কথা আমি ভুলে যাবো ? কী যে বল হৈমন্তীদি হি হি হি, একটু চুপ ক'রে থেকে কী ভেবে বোধনা বললো, তবে এদের ছবি কিন্তু একেবারে অন্য রকম, সেই প্রোবলেম না কী বলে তাই নিয়ে—উদ্বাস্তু, হিন্দুস্থান—পাকিস্থান, দাবির মিছিল এইসব আর কী !
যা হোক, হৈমন্তী তখনও বোধনার হাত ছাড়ে নি, তাড়াতাড়ি ছবি করতে বল তোর বরকে, আমাকে যা টাকা দেবে অমি তা'তেই রাজী।
গভীর সমবেদনার স্বরে বোধনা জিজ্ঞেস করলো, তোমার এখন খুব টাকার দরকার না ?
হ্যাঁরে খুব, এই ছবিটা খারাপ হয়ে আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

তোমায় ভালো হবে হৈমন্তীদি, তুমি দেখে নিও, তোমার মত লোক হয় না—

হঠাৎ হৈমন্তীর খেয়াল হলো বোধনাকে কিছু খাওয়ানো দরকার! ও বিয়ের পর প্রথম এ বাড়িতে এলো, কিছুতেই ওকে শুধু মুখে ফিরে যেতে দেয়া যায় না। কিন্তু হৈমন্তী তাকে কি খেতে দেবে? ওদিকে ঝি এখনও ফিরে আসে নি, হৈমন্তী জানে না সে ধারে জিনিসপত্র আনবার ব্যবস্থা করতে পারলো কি না।

বোধনা, এক মুহূর্তের জন্যে থেমে হৈমন্তী বললো, তুই আমার একটা উপকার করতে পারবি?

নিশ্চয়ই পারবো। কিন্তু তুমি অমন ক'রে কথা বলছো কেন? কি হয়েছে তোমার?

আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারবি না, কোনো কথা বলবি না, আমি যা বলবো আমার জন্যে তোকে তাই করতে হবে?

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে হৈমন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে বোধনা বললো, বলো কি করতে হবে?

তখন হৈমন্তী উঠে সেই স্কার্ফে জড়ানো গয়না বোধনার হাতে দিয়ে বললো, কাউকে বলিস না, এগুলো তোর বরকে দিয়ে হোক কিংবা যেমন ক'রে হোক বিক্রি ক'রে আমাকে আজকেই টাকা এনে দিতে হবে—যতো শিগগির হয়—

অবাক হ'য়ে বোধনা বললো, বলো কী হৈমন্তীদি?

বললাম তো, আমার মাথার ঠিক নেই, আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করিস না, তুই যা বোধনা, আমার এ উপকারটুকু কর, তোর ভালো হবে, তুই রানী হবি—

সেই স্কার্ফে বাঁধা হৈমন্তীর গয়না নিয়ে একটু পরে বোধনা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সে আবার ফিরে এলো। হৈমন্তী তখনও সেই সোফায় ঠিক তেমনি করে বসে আছে।

একশো টাকার দু'টো নোট হৈমন্তীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বোধনা বললো, এই নাও।

করুণ মুখে হৈমন্তী বললো, মাত্র দু'শো টাকা হ'লো রে?

এইবার সেই গয়না বাঁধা স্কার্ফ ফিরিয়ে দিয়ে বোধনা আবার বললো, এটাও
ন্যাও হৈমন্তীদি—

সে কী? তুই ওগুলো বিক্রি করিস নি? তাহ'লে?

আমি তোমায় টাকাটা দিলাম, ওর বেশি এখন আর নেই, তোমার অবস্থা ভালো
হ'লে আমায় ফিরিয়ে দিও।

না না বোধনা, বিব্রত হ'য়ে হৈমন্তী বললো, এ কিছুতেই হ'তে পারে না,
ছি ছি, তুই আমার চেয়ে কত ছোটো—আর তোর বরই বা কি ভাববে?

ইস্ ভাবলেই হলো. ওর ছবিতে পার্ট করবে ব'লে ধরো ও সামান্য টাকাটা
তোমায় আগাম পাইয়ে দিলাম।

বোধনাকে জোর ক'রে নিজের পাশে বসিয়ে তার গাল টিপে হৈমন্তী বললো,
এত বড়ো মন তোর, তুই রানী হবি বোধনা!

আমাকে লজ্জা দিও না হৈমন্তী দি, তুমি আমার জন্যে কম করেছো না কি?
সকলে যখন আমাকে বাজে ধাপ্পা দিয়ে হাসি ঠাট্টা করেছে তখন একমাত্র তুমি
আমাকে ছোটো বোনের মত মনে ক'রে বুকে টেনে নিয়েছো, তাই আজ
তোমার ব্যথা আমি না বুঝলে কে বুঝবে বল!

বোধনার কথা শুনে হৈমন্তী একটি কথাও বলতে পারলো না। সেই একশো
টাকার দু'খানি নোট প্রাণপণ শক্তিতে হাতের মুঠোয় চেপে ধ'রে চুপ ক'রে
ব'সে রইলো অনেকক্ষণ।

হেরম্ব দত্ত চৈতন্যকে বিশেষ ক'রে বম্বে যাবার জন্যে চিঠি লিখেছে। সেখানে
নাকি ছবি করবার অনেক সুবিধা। চৈতন্যর মত একজন পরিচালক অবিলম্বে
দরকার। অনেক বড়ো বড়ো লোক বাংলাদেশের ছায়াচিত্র কর্মী পাবার
জন্যে টাকার ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে। কাজেই চৈতন্য যেন চিঠি পেয়েই
প্রিমিয়ারের সংগে সম্পর্ক চুকিয়ে বম্বের ট্রেন ধরে! পরে অসুবিধা হ'তে
পারে। বিজয় সেনের নাম সেখানেও বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে যাচ্ছে। চৈতন্য
যদি এই সুযোগ গ্রহণ না করে তাহ'লে মুস্কিল হবে। বাংলাদেশের মত বম্বের
প্রযোজকরাও চালাক হ'য়ে যেতে পারে।

ট্রেন নয়, হেরম্বর চিঠি পেয়ে অধৈর্য হ'য়ে চৈতন্য বম্বের প্লেন ধরলো। কোটি-

টাকা এক সপ্তাহের মধ্যে হবে—এমনি সব নানা কথা বলে সে তুলতুল বন্ধিকেও সংগে ক'রে নিয়ে গেল। হেরম্ব কিছু না লিখলেও চৈতন্য জানে ছায়াচিত্রের ব্যবসায় তুলতুলের মত একজন মেয়ে সংগে থাকলে কতোখানি সুবিধা হয়। প্রিমিয়ারের সংগে সম্পর্ক চুকিয়ে, অন্য সব বন্দোবস্ত পাকা ক'রে চৈতন্য হৈমন্তীর কাছে বিদায় নিতে গেল।

আজকাল হৈমন্তীর কথা ভাবলে তার কেমন যেন ভয় লাগে। তাই সে তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। জীবনে অনেক মেয়ের সংস্পর্শে এসেছে চৈতন্য গড়াই; হয়তো আরও আসবে। কিন্তু এমনি ক'রে সে আর কাউকে আশ্বাস দেয় নি। প্রথমদিন হৈমন্তীকে ভালো ক'রে দেখে চৈতন্য মনের মধ্যে কী যেন খুঁজে পেয়েছিলো আর অকারণে ভরে উঠেছিলো তার বুক। সেইদিনই তাকে দেখে হৈমন্তীর মনে যে শিহরণের ঢেউ ব'য়ে গিয়েছিলো সে কথাও সে বুঝতে পেরেছিলো। এর আগে অনেক মেয়েকে নিয়ে অনেকবার মেতে উঠেছে সে, কিন্তু কিছুদিন পর তার মোহ ভেঙে গেছে, তখন তাদের বোঝা বলে মনে হয়েছে। বাধ্য হ'য়ে রূঢ় ব্যবহার ক'রে তাদের চৈতন্য দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কিংবা এমন হয়েছে বহুবার সে অনেক রূপসী মেয়ের পেছনে কাঙালের মত ঘুরেছে, ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়েছে কতোবার, ছেলেমানুষের মত কেঁদেছে, আত্মহত্যা করবার সাধ জেগেছে। মনেপ্রাণে নির্ভর করবার মত কোনো মানুষকে খুঁজে পায়নি চৈতন্য। হৈমন্তীকে যখন সে পেলো তখন অনেক দেরি হ'য়ে গেছে। তার সংগে আগে দেখা হ'লে কী হ'তো কে জানে! তা'হলে হয় তো এমন ছন্নছাড়ার মত তাকে যেখানে সেখানে হো হো হাহা ক'রে ঘুরে বেড়াতে হ'তো না। সংসার সাজিয়ে সে তার বিব্রত মন শান্ত করতে পারতো। আজ তা যখন হবার নয় তখন সে ভাবনা ভেবে ফল নেই। হৈমন্তীর সংগে তার সম্পর্ক যেন কোনোদিনও বিকৃত না হ'য়ে ওঠে। সে চিরকাল এই পরিবারের বন্ধু হ'য়ে থাকবে, সব সময় নিঃস্বার্থভাবে শুধু এদের উপকার ক'রে যাবে। হৈমন্তীর সংগে তার ব্যবহার চিরদিন হবে সহজ স্বতঃস্ফূত স্বাভাবিক।

কিন্তু হৈমন্তীর কাছ থেকে সে যা আশা করেছিলো তা পেলো না। তার মনের ভাব বুঝতে পেরে ভীষণ ভয় পেলো চৈতন্য গড়াই। কিন্তু তাকে দোষ দিতে পারলো না। গভীর সমবেদনার সংগে তার অসহায় মনের অবস্থা

বোঝবার চেষ্টা করলো, তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো। তবু হৈমন্তী বুঝতে পারলো না তার মনের কথা। ইচ্ছে করলে সে তার ব্যক্তিত্ব লোকের কাছে অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে পারতো।

চৈতন্য জানে তার সামান্য ইসারায় হৈমন্তী সমস্ত বিসর্জন দিয়ে ঘর ভেঙে পথে বেরিয়ে আসতে পারে। অনেক ঘর ভেঙেছে চৈতন্য, অনেককে অনেক বার ইসারায় ডেকেছে। একথা তার তখন অবশ্য বুঝতে বাকি ছিলো না সেইসব মেয়েরা যে কোনো লোকের হাত ধ'রে একদিন বেরিয়ে আসতোই, শুধু চৈতন্যর সংগে নয়, অনেকের সংগে তারা আনন্দ পাবার জন্যে প্রস্তুত ছিলো। কিন্তু হৈমন্তী একমাত্র মানুষ চৈতন্য ছাড়া আর কাউকে জানে না, কেবল তার জন্যে সব ছেড়ে সে পথে পথে ঘুরতে পারে। এইটুকুই চৈতন্যর কাছে যথেষ্ট, এর বেশি আর কিছু চায় না সে। হৈমন্তীর কাছ থেকে কোনোদিন সে কিছু চাইবে না, তাকে শুধু দিয়ে যাবে। একমাত্র মানুষ হৈমন্তী, যার কাছে চিরকাল চৈতন্য রাজা হয়ে থাকবে।

চৈতন্য গড়াই কাজের মানুষ। শুধু মনের ব্যাপার নিয়ে সারাদিন বিব্রত হয়ে থাকলে তার চলে না। সে বয়স পার হয়ে এসেছে চৈতন্য। তাকে নাম করতে হবে, চিত্রশিল্পের উন্নতি করবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। তাই তাকে অনেকের সংগে মিশতে হয়, অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়। সব সময় হৈমন্তীর কথা মনে ক'রে ঘরে ব'সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে তার চলে না।

হৈমন্তীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যখন সে তাকে ছায়াচিত্রে যোগ দেবার কথা বলেছিলো তখন সত্যিই যে বিশ্বাস করেছিলো সে নাম করবে। কিন্তু ছায়াশিল্পের চেয়ে হৈমন্তী তাকেই বেশি ভালবাসলো। সব ভুলে ছায়ার মত তার পাশে পাশে ফিরতে লাগলো। মাঝে মাঝে চৈতন্যর বিরক্তি এসে যেতো। হৈমন্তী তাকেও যেন অলস অকর্মণ্য করে তুলবে। তারপর দেখা গেল দর্শকের মন জয় করতে হৈমন্তী পারলো না। এখন কি করতে পারে চৈতন্য! দেশ যাকে না চায় সে একা তাকে মনে মনে চাইতে পারে কিন্তু দর্শক সাধারণের সামনে তুলে ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা করে আবার হাস্যাস্পদ হবে কেমন ক'রে। চৈতন্যর যদি টাকা থাকতো তাহ'লে হৈমন্তীকে দিয়ে তার অভাব দূর করবার যথাসাধ্য চেষ্টা সে করতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন আর্থিক সঙ্কটে সে জীবনে পড়েনি।

দেখা যাক বম্বে গিয়ে কী হয়, যদি সম্ভাবনা থাকে তা'হলে সে নিশ্চয়ই হৈমন্তীর কথা ভেবে দেখবে। এখন তুলতুল বক্সির কাছ থেকে পুরো কাজ আদায় ক'রে নিতে না পারলে সকলকেই শেষ হ'য়ে যেতে হবে। এখন ছায়াচিত্র জগতে সবই আকস্মিক, সবই অনিশ্চিত। নানা তরংগের প্রবল তোড়ে কে কখন কোথায় ছিটকে পড়ে তার কোনো ঠিক নেই। তুলতুলকে নিয়ে বম্বে গিয়ে নতুন ক'রে ভাগ্যান্বেষণ করতে হবে চৈতন্যকে। হৈমন্তীর চেয়েও হয়তো তার আর্থিক অবস্থা খারাপ। সব কথা তাকে বুঝিয়ে বলবার জন্যে সে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো।

কিন্তু সে সুযোগ হৈমন্তী দিলো না। চৈতন্যকে দেখতে পেয়ে একেবারে প্রথমেই সটান সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি না কী তুলতুল বক্সিকে সংগে নিয়ে বম্বে যাচ্ছো ?

হৈমন্তীর স্বরে কেমন যেন একটা জেরা করবার সুর মিশেছিলো। তার কাছ থেকে এমন কর্কশ প্রশ্ন সে আশা করে নি। তাই সে যেমন ক'রে কথা তুলবে ভেবেছিলো তেমন ক'রে তুলতে পারলো না। মনে মনে বেশ অসন্তুষ্ট হ'য়ে শুকনো গলায় বললো, হ্যাঁ, কাল এগারোটা দশ মিনিটে কাজের জন্যে প্লেনে যাচ্ছি। কেন বল তো ?

চৈতন্যর কথা বলবার ভঙ্গী দেখে হৈমন্তী লজ্জা পেলো। অমন কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করা তার উচিত হয় নি। তাই অপ্রস্তুত হয়ে সে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলো। তারপর একটু ইতস্তত ক'রে বললো, তুমি চ'লে গেলে আমি কি করবো ? আমার কি হবে ?

সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে চৈতন্য বললো, কাজের জন্যে যাচ্ছি, কাজ শেষ হ'য়ে গেলে আমরা আবার ফিরে আসবো। কিন্তু সেকথা নয়, আমার থাকা না থাকায় তোমার কি এসে যায় ?

চৈতন্যকে বড়ো অচেনা মনে হলো হৈমন্তীর। আজ ও এমন ক'রে কথা বলছে কেন। ও কি তাকে একেবারে ভুলে গেল। যদি এমনি ক'রে ভুলে যাবেই তাহ'লে অমন পরমাত্মীয়র মত অতো কাছেই বা কেন এসেছিলো একদিন।

দীন চোখে চৈতন্যর মুখের দিকে তাকিয়ে হৈমন্তী জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি সব ভুলে গেলে চিতু ?

কি ভুলবো আর কি মনে রাখবো তা তুমিই জানো। কিন্তু একটা কথা ভুলো না, শিল্পীর জীবনে সব চেয়ে বড়ো হ'লো কাজ। অনেকের বেলায় দেখা গেছে তাদের কাছে যে ব্যক্তিবিশেষ বড়ো হ'য়ে উঠেছে আর তারাই ঠকেছে, জুড়িয়ে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় হা হা ক'রে মনের দুঃখে ঘুরে বেড়িয়েছে শুধু—

এসব কথা আজ তুমি আমাকে শোনাচ্ছো কেন?

কারণ তুমি তাদেরই একজন। এসব কথা তোমাকে আমার অনেক আগেই বলা উচিত ছিলো।

হ্যাঁ ছিলো বৈ কি, উষ্ণস্বরে হৈমন্তী বললো, তুমি না বললে আমি ছবিতে নেমে এমন ক'রে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতাম না, কেন তুমি আমাকে ছবিতে নামবার জন্যে জোর ক'রেছিলে?

তোমাকে লোকে চিনবে ব'লে, তোমার অর্থাভাব ঘুচে যাবে ব'লে, আমি তোমার ভালো চেয়েছিলাম হৈমন্তী, একটু থেমে হৈমন্তীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে চৈতন্য বললো, শুধু তোমার একার নয়, আমি তোমাদের সমস্ত পরিবারের ভালো চেয়েছিলাম।

সবাই আমার ভালো চেয়েছিলো কিন্তু আমি কি পেলাম?

কেউ কাউকে কিছু পাইয়ে দিতে পারে না হৈমন্তী, আদায় ক'রে নেবার ক্ষমতা রাখতে হয়। আমার বিশ্বাস সময় শিগগিরই ভালো হবে, তখন তোমাকেও লোকে চাইবে আবার।

অনেক হয়েছে, নাম যশ অর্থ, আমি আর কিছু চাই না, ধরা গলায় হৈমন্তী বললো, চিতু তুমি আমাকেও সংগে ক'রে বম্বে নিয়ে চলো। আমি তাহ'লে বেঁচে যাই, এখানে এভাবে থাকলে আমি ম'রে যাবো, পাগল হ'য়ে যাবো।

ছিঃ হৈমন্তী, এতো অধৈর্য হ'তে নেই।

আমি বম্বে যাবো।

সেখানে গিয়ে এখন তোমার কিছু করবার নেই, যদি দিন ভালো হয়, আমি তোমাকে ঠিক খবর দেবো।

চৈতন্যর কথা শুনে হঠাৎ হৈমন্তী জ্বলে উঠলো, তাহ'লে তুলতুলকে নিয়ে যাচ্ছো কেন?

কারণ লোকে ওকে চায়, একটু উত্তেজিত স্বরে চৈতন্য বললো, আমাকে আগে কাজের কথা ভাবতে হয়।

সব বুঝি আমি। আমার বেলায়ও আগে অমন কাজের কথা ভাবতে তুমি।

হ্যাঁ ভাবতাম, কিন্তু কোন বুদ্ধিতে তুমি ভাবো সারা জীবন আমাকে তোমার হাত ধ'রে চলতে হবে?

তাহ'লে আমাকে ছবিতে নামালে কেন?

তোমাকে ছবিতে নামিয়েছি ব'লে শুধু তোমার ছাড়া আমি অন্য কারোর মুখের দিকে তাকাবো না এসব কথা তুমি কোন সাহসে ভাবো? তোমাকে আমি যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছি, এর চেয়ে বেশি সুযোগ এ লাইনে কেউ কাউকে দেয় না।

জানি। কিন্তু অতো দিয়েছো বলেই আমি আরও পাবার আশায় ব'সে আছি। চিতু তুমি আমাকে ফেলে যেওনা, হৈমন্তী সব ভুলে চৈতন্যর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এ কী, সজোরে ধাক্কা মেরে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চৈতন্য বললো, সব কিছুর একটা সীমা থাকা উচিত!

সীমা? চিৎকার ক'রে হৈমন্তী বললো, সীমা তুমি ছাড়াও নি?

না, চৈতন্য গড়াইএর দৃঢ় স্বর বাজলো, আমি তোমাকে যা দিতে চেয়েছিলাম তা গ্রহণ করতে পারলে আমি তোমাকে রানীর মত শ্রদ্ধা করতাম।

কিসের শ্রদ্ধা? ওসব কথা বলে তুমি আমাকে আর ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা ক'রো না। আমি জানতে চাই আর কতোদিন তুমি আমাকে তোমার মানসিক বিলাসের পুতুল ক'রে রাখতে চাও?

হৈমন্তী! চৈতন্যর স্বরে নিদারুন জ্বালা ফুটে উঠলো, নিজের স্বার্থের জন্যে জ্ঞান হারিয়ে তুমি নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে এনেছো আর আমাকেও শেষ ক'রে দিতে চলেছো। তুমি জানো না, নিজের কাছে তুমি আমাকে কতো ছোটো ক'রে তুলেছো! এ বাড়িতে এলে আমার বুকে গ্লানি জমে ওঠে, তোমার স্বামীর দিকে অমি মাথা তুলে তাকাতে পারি না। এই জন্যে কি সেই রাত্তিরে আমি আমার মান সম্ভ্রম তোমার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলাম? একটু থেমে চৈতন্য আবার

বললো, ইচ্ছে করলে তুমি আমাকে এ পরিবারের রাজার আসনে বসাতে পারতে—

চিতু থামো। আমি সব জানি। আর বলো না। আমার মাথার ঠিক নেই। তুমি যাও—

চৈতন্য তবু থামলো না, ছি ছি, আমি কী তোমার কাছ থেকে এমন ব্যবহার আশা করেছিলাম? আত্মবিস্মৃত না হ'য়ে কাজে মনপ্রাণ সঁপে দিলে আজ তোমার এ অবস্থা কিছুতেই হ'তো না। তোমার মনের দৈন্যের জন্যে তুমি চারপাশে অভাবের বেড়াজাল ছড়িয়ে আমাকেও তা'তে আঁটকে ফেলতে চাচ্ছো। কিন্তু হৈমন্তী আমি অনেক দেখেছি, কেঁদে কিংবা ভয় দেখিয়ে তুমি আমার কাছ থেকে কিছুই পাবে না। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো আমি তোমাকে কি দিতে চেয়েছিলাম আর তুমি আমাকে কি দিলে—

আমি কিছু চাই না। অমন স্বরে তুমি আমার সংগে কথা বলো না। তুমি আমার জন্যে অনেক করেছো। আর কিছু করতে হবে না। তোমায় প্রণাম। তুমি যাও—

রাত বারোটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। এখনও হৈমন্তী বাড়ি ফিরে আসে নি। দেরি ক'রে ফেরা তার এই প্রথম নয়। অনেকবার সে আরও পরে নিঃশব্দে বাড়ি ঢুকেছে। কৈলাস জানতেও পারে নি কখন সে এসে ঘুমিয়েছে।

আজ কিন্তু কিছুতেই কৈলাসের ঘুম আসছে না। কী এক অশুভ আশঙ্কা তার বুকের মধ্যে আলোড়ন তুলছে বারবার। কোনো কারণ নেই তবু অক্ষত অবস্থায় হৈমন্তী বাড়ি ফিরে এলে সে নিশ্চিন্ত হয়।

সংসারের ওপর দিয়ে যেন একটা ভয়ঙ্কর মন্বন্তরের হল্কা ব'য়ে গেল। দারুন ক্ষুধা নিয়ে কৈলাস আর হৈমন্তী দু'জন দু'দিকে যন্ত্রণায় ছটফট করেছে শুধু। কেউ কারোর সন্ধান পায় নি। আজ কৈলাস স্পষ্ট বুঝতে পারে কেউই এক ফোঁটা জলও পায় নি। দু'জনের আকণ্ঠ তৃষ্ণার কথা এতোদিন পর হয়তো দু'জনেই বুঝতে পেরেছে। আর দূরে স'রে থাকা যাবে না, সব অভিমান দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে পরস্পর কাছাকাছি না দাঁড়ালে সংসার ধ্বসে যাবে। এতোদিন হৈমন্তীর কাছে কৈলাসের

কোনো প্রয়োজন ছিলো না কিন্তু আজ ? কৈলাসের বুক চিরে দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে আসে আর মিলিয়ে যায় যতো অভিমান। কিছুতেই সে হৈমন্তীকে ভেঙে পড়তে দেবে না, আজীবন তার পাশে ছায়ার মত ফিরে তাকে বাঁচিয়ে তুলবে। এখন তার মত আপনার কে আছে আর হৈমন্তীর !

একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল। তারপর একটানা তীক্ষ্ণ কলিং বেল বেজে চললো। হৈমন্তী দেরিতে ফিরলে সাধারণত তালা খুলে পেছনের দরজা দিয়ে আসে। এতো রাত্তিরে কে কী খবর নিয়ে এলো তাহ'লে! রুদ্ধ নিশ্বাসে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে কৈলাস দেখলো তার সামনে হৈমন্তী দাঁড়িয়ে আছে। কৈলাসকে দেখতে পেয়ে কালো রঙের একটা বিরাট মোটর গাড়ি আস্তে আস্তে চলে গেলো। ওই মোটরে ফিরে এসেছে হৈমন্তী।

হৈমন্তীকে দেখে চমকে তিন পা পিছিয়ে এলো কৈলাস। তার বসন শ্লথ, চোখ লাল, আলুথালু চুল, পা টলছে আর মুখে বিলিতি মদের উৎকট গন্ধ।

সে দীর্ণ চিৎকার ক'রে উঠলো, হৈমন্তী !

ইয়েস্ ডার্লিং, হৈমন্তী টলতে টলতে এগিয়ে এলো, টেক মি টু বেড প্লিজ, আই অ্যাম টায়ার্ড—

বজ্রাহত কৈলাস করুণ বিস্ময়ে স্ত্রীর দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে। সেই সোনার প্রতিমার এ কী নির্মম মূর্তি তাকে দেখতে হ'লো আজ !

হৈমন্তী, তুমি মদ খেলে কেন ?

সাট আপ! হোয়াট ডু ইউ মিন বাই মদ ? আগরওয়াল গেভ মি গুড ড্রিঙ্কস্ অ্যাণ্ড ইনিনিউমারেবল্ কিসেস্। উই ওয়্যার এণ্টারিং ইন টু একসটেসি. লুক্—ব্যাগ খুলে একশো টাকার পাঁচটা নোট কৈলাসের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হৈমন্তী বললো, আর টাকার ভাবনা নেই, যেদিন খুশি, আগরওয়াল ইজ অলওয়েজ উইলিং—

হৈমন্তী! একটি একটি ক'রে কৈলাসের পাঁজর ভেঙে যাচ্ছে যেন। তার চোখের সামনে হৈমন্তী মেঝের ওপর টলে পড়লো। তখন কৈলাস সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে তুলে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলো।

ওগো আমার মাথায় দয়া ক'রে কেউ একটু জল দেবে বড়ো কষ্ট উঃ—

আর মদ খেও না হৈমন্তী।

না খাবো না, আই প্রমিস্, এখানে তুমি ব'সে থাকো, আমাকে ছেড়ে কোথাও যেও না, আজ আমি ম'রে যাবো যে—আমি ম'রে যাবো—উঃ মাথায় কী যন্ত্রণা !

কৈলাস আস্তে আস্তে উঠে একটা তোয়ালে ভিজিয়ে এনে গভীর স্নেহে হৈমন্তীর মাথায় আর মুখ বুলিয়ে দিয়ে পাখার স্পীড বাড়িয়ে দিলো। সুইচ টিপে ঘর অন্ধকার করলো। তারপর হৈমন্তীর মাথা নিজের কোলে নিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলো।

গ্রীষ্মের রাত। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে বাইরে। কৈলাসের কানে এসে লাগছে শুধু তারই একটানা হাহাশ্বাস। চাপা কান্নার বিপুল তরংগ তার বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মাত্র একটি প্রশ্ন যেন বারবার তার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করছে, কেন এমন হ'লো !

পাশ ফিরে হৈমন্তী বললো, ওগো তুমি কোথায় ?

এই তো।

আর সকলে ?

সবাই চলে গেছে হৈমন্তী।

তুমি যেও না, আমার ভয় লাগছে, কৈলাসকে প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধ'রে হৈমন্তী কেঁদে উঠলো।

না না, আমি কোথাও যাবো না।

জানি গো। তুমি গেলে এমন ক'রে আমাকে দেখবে কে ? কিন্তু এ বাড়িতে আমি আর থাকবো না, এখানে থাকলে আমি পাগল হ'য়ে যাবো। বল তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে ? বল বল—

তুমি যেখানে যেতে চাও সেখানে নিয়ে যাবো।

তোমার পায়ে পড়ি আমাকে রামময় মিত্র রোডের সেই বাড়িতে নিয়ে চলো, আমি আর কিছু চাই না, অনেক হয়েছে। প্লিজ টেক মি টু রামময় মিত্র রোড, হৈমন্তীর বাকি কথা বোঝা গেল না। সে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়লো।

কিন্তু কৈলাসের চোখে আজ আর ঘুম নেই। হৈমন্তীর মাথা কোলে নিয়ে সে অনেকদিন আগেকার কথা ভাবছিলো—সেই রামময় মিত্র রোডের বাড়িতে গভীর রাত্তিরে ভয় পেয়ে জেগে উঠে হৈমন্তী যখন ছোটো মেয়ের মত তার বুকে মুখ লুকোতো আর আজকের মত এমনি স্বরে ডেকে তারও ঘুম ভাঙিয়ে দিতো। আর বকুল গন্ধে ভ'রে যেতো ঘর।

অস্ফুট স্বরে হৈমন্তী আর একবার বললো, রামময় মিত্র রোড—

কৈলাস তার কপালে ভিজে তোয়ালে বুলিয়ে দিতে দিতে ভাবতে লাগলো কাল সকালে ঘুম ভাঙলে নেশা কেটে যাবে হৈমন্তীর। ভোরের আলোয় চোখ মেলে সে শুধু দেখবে কৈলাস ঠিক তেমনি ক'রে তখনও তার মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে। আর কেউ কোথাও নেই।

রাত শেষ হ'য়ে এলো।